শ্রী সুবোধকুমার চক্রবর্তী

রম্যাণি বীক্ষ্য

ভুটান পর্ব

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ কাহিনী



এ· মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক
এ· মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ — ১৩৬৭

'প্রতিক্ষণ' পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে
ফটো অফসেট পদ্ধতিতে গ্রথিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে
অফসেট পদ্ধতিতে মুদ্রিত।

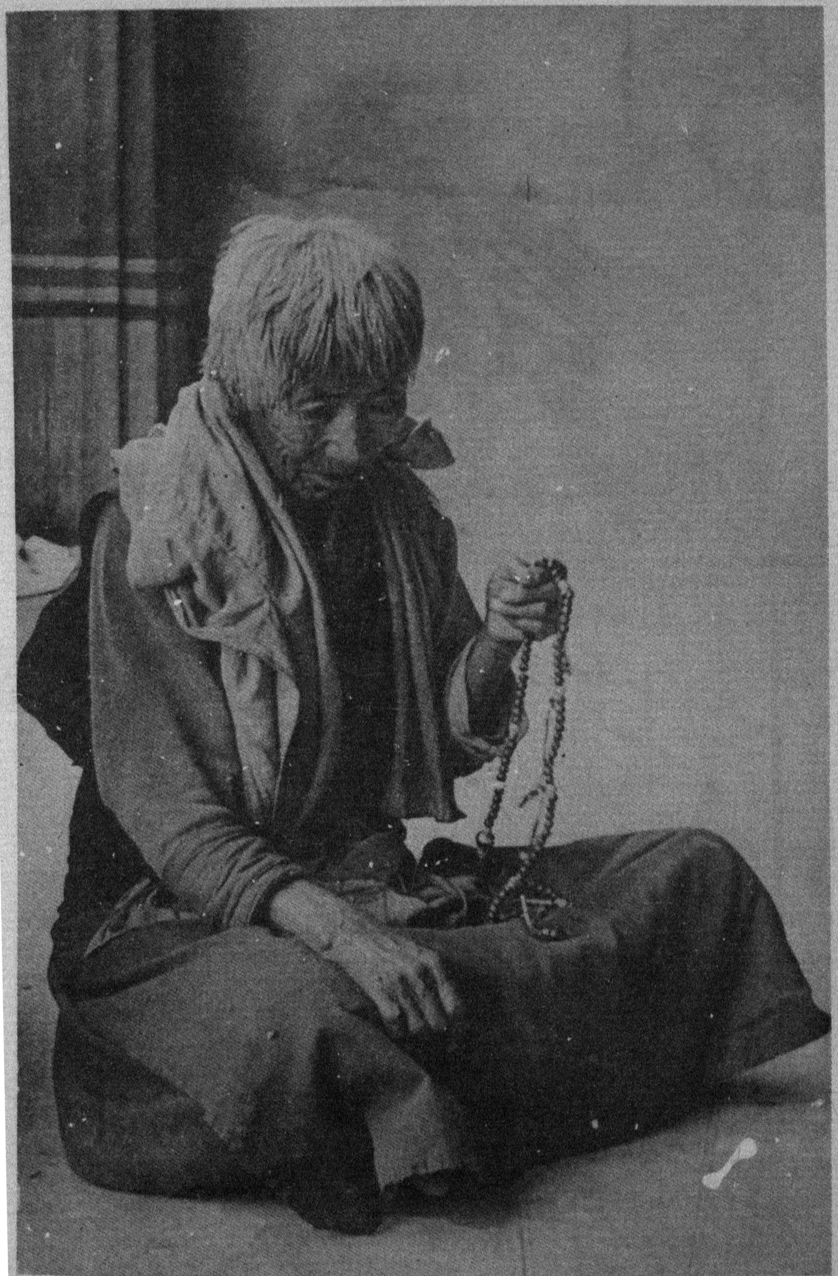
কভার মুদ্রণ
তিমির প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড

স্কেচ ও মানচিত্র লেখকের আঁকা

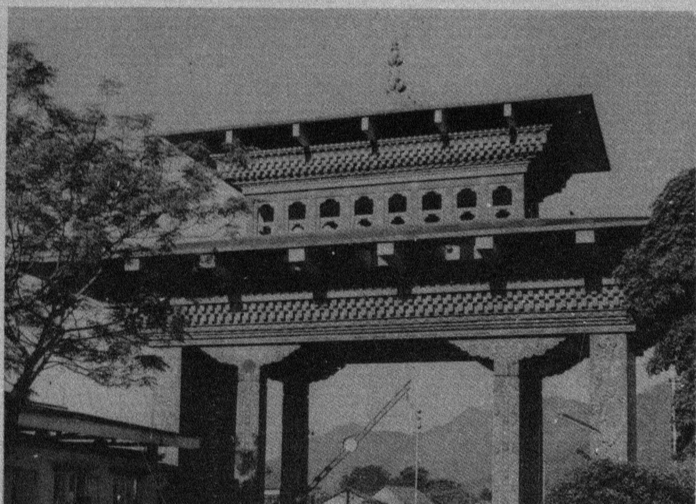
অবধূতং রক্ষোঽবধূতা অরাতয়োঽদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্তু। দিবঃ স্কম্ভনিরসি প্রতি ত্বাঽদিত্যাস্ত্বগ্বেত্তু।

—কৃষ্ণ যজুর্বেদ, ১/১/৬

হে মন, তুমি যুক্ত হলে সতের সাথে
কম্পিত হবে শত্রুর দুর্বুদ্ধি,
চলে যাবে রিপুরূপ শত্রুরা।
তুমিই বাধা অনন্তের সাথে মিলনের,
তাই তোমাকে অনুগ্রহ করুক সৎকর্ম ও জ্ঞান।
হে আমার অসৎ বৃত্তি সমূহ,
আমার স্বর্গের প্রতিবন্ধক তোমরা,
তোমাকে অনুগ্রহ করুক অনন্তের অংশ শুদ্ধসত্ত্ব।



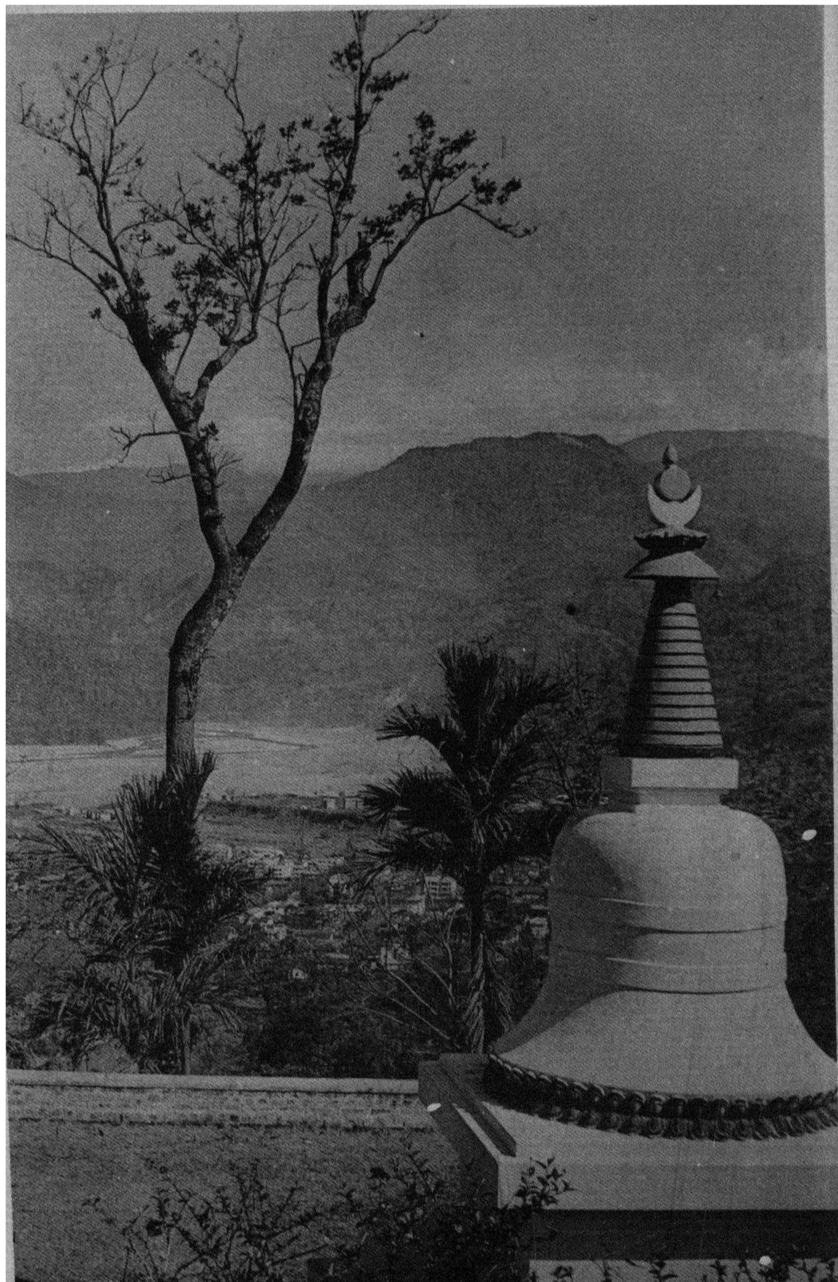
গোম্পার দরজায় ভুটানী বৃদ্ধা



ফুনছোলিঙের গেট



পাবো চু ও থিম্ফুর চুর সঙ্গম



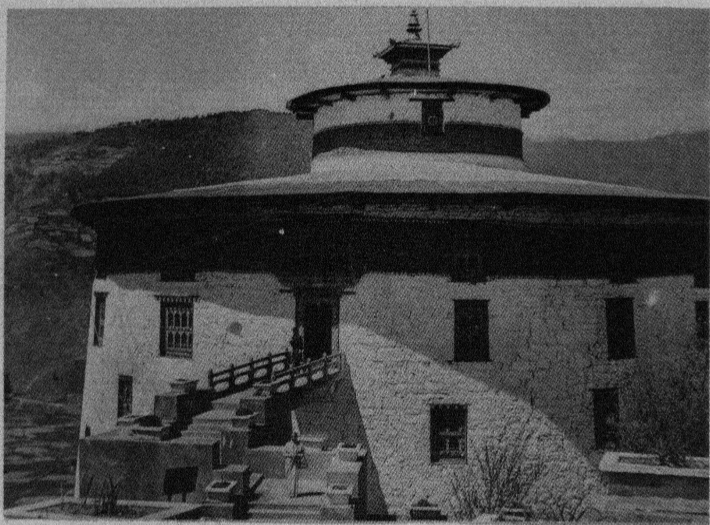
ফুনছোলিঙের গোম্পায় একটি ছোর্তেন



উপরে, ফুনছোলিঙের গোম্পা । নীচে, থিম্ফুর রাজপথ



উপরে থিম্ফুর উপত্যকায়, পিছনে গোম্পা । নীচে. পারোয় তীরখেলা

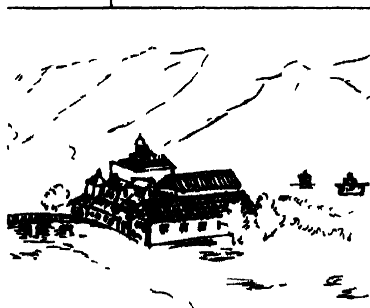


উপরে, পারোর জাদুঘর । নীচে, থিম্ফুর বাজার

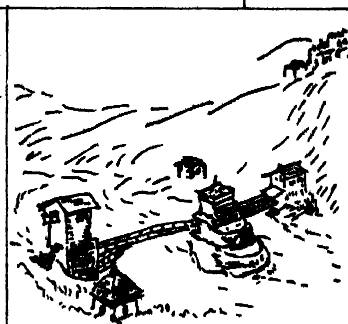




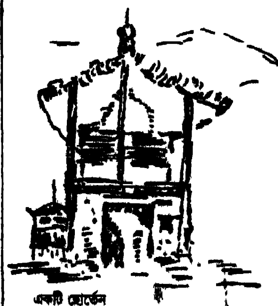
থিম্ফু জং



পুনাখা জং



ওয়াংদি ফোড্রং



একটি ছোর্তেন

তিব্বত
কাঞ্চনজঙ্ঘা
সিকিম
চুম্বি
নেপাল
তিস্তা
গ্যাংটক
রাঙ্গপো
দার্জিলিং
কালিম্পঙ
শিলিগুড়ি
বিহার
তিস্তা
সামচি
হাসিমারা
পশ্চিমবঙ্গ
তোর্সা
আমো
চু
পারো
হয়
থিম্ফু
ওয়াং চু
ফুনছোলিঙ
বাগডোক
পানাখা
ওয়াংডিফোদ্রং
টংসা
ভু টা ন
পেলেফু
আসাম
বঙ্গাইগাঁও
মানস
তাকিগঙ
তাওয়াং
অরুণাচল প্রদেশ
বাঙ্গিয়া
১

রম্যাণি বীক্ষ্য

ভুটান পর্ব

১

বর্ষা এবারে একটু দেরিতে নামল। বর্ষা মানেই গৃহে বন্দী থাকার নির্দেশ। পুরাকালে চাতুর্মাস্য উদ্‌যাপন করতে হত বর্ষা কালে। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বাদশী থেকে কার্তিকের শুক্লা দ্বাদশী পর্যন্ত চার মাস ধরে বার্ষিক ব্রত বা যজ্ঞ এই চাতুর্মাস্য। এর অর্থ খুবই স্পষ্ট—এই সময়ে ঘরের বাহিরে বেরোনো চলবে না। সীতার অন্বেষণে বেরিয়ে রামও এই চাতুর্মাস্য উদ্‌যাপন করেছিলেন কিষ্কিন্ধ্যায়। সে সময়ে পথে বেরোনো সম্ভব ছিল না নানা কারণে। মাটির পথ কর্দমাক্ত হত, আশ্রয় ছিল না পথে। গাছ তলায় বাস সম্ভব ছিল না। তাই এই দীর্ঘ সময় গৃহে আবদ্ধ থাকতে হত। কিন্তু সময় তো কাটাতে হবে! তার জন্যেই ব্রত, কিংবা যজ্ঞ। তাতেই এই দীর্ঘ সময় কেটে যাবে। আশ্বিনেও বৃষ্টি হয়। তাই কার্তিক মাসে এই ব্রতের অবসান হবে। সীতা উদ্ধারের মতো জরুরী কাজও স্থগিত রাখতে হয়েছিল রামকে। সীতার সংবাদ আহরণের চেষ্টাও সম্ভব হয় নি।

কিন্তু এখন আমরা এই ব্রতের কথা ভাবি না, জানিও না অনেকে। বর্ষায় এখন ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকার দরকার নেই। তবে সখের ভ্রমণে বেরোতে চাই না। একটানা বৃষ্টিতে বেড়ানোয় অনেক আনন্দ কমে যায়। তাই বর্ষা আমাদের ভ্রমণের ঋতু নয়, ভ্রমণের কথা মনে করিয়ে দেবার ঋতু। চাষীরা যেমন আকাশের দিকে চেয়ে বীজ বপনের দিন স্থির করে, তেমনি আমরাও এখন বর্ষার আসা-যাওয়ার কথা মনে রেখেই ভ্রমণের কথা ভাবি। ভ্রমণের সূচী তৈরি করি কোন বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছিল। কোন রকমে বাড়ি ফিরে বাড়ির বারান্দায় এসে বসেছি। স্বাতি তার চায়ের ট্রলি ঠেলে নিয়ে এসে আমার পাশে বসল। বলল: কী ভাবছ?

বললুম: ভাবনার কি শেষ আছে!

শেষ নেই, তবে একটা আরম্ভ আছে। সেই আরম্ভের কথাই জানতে চাইছি।

জিজ্ঞাসা করলুম: আজ আষাঢ়ের কোন তিথি?

স্বাতি বলল: পাঁজি তো নেই, ক্যালেণ্ডার দেখে হিসেব করতে হবে। কিন্তু তিথির কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

বললুম: পুরাকালের মানুষ হলে আমাদের আকাশের দিকে চেয়ে তিথির হিসেব রাখতে হত। আজ আষাঢ় মাসের নতুন বর্ষা। দিন কয়েক আগে চাঁদকে বাড়তে দেখেছি। তার মানে শুক্ল পক্ষ চলছে। তিথি যদি দ্বাদশী হয়, তবে আজ থেকেই চাতুর্মাস্যের আরম্ভ।

স্বাতি তার দু চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে আমার মুখের দিকে তাকাল। তা দেখতে পেয়ে হেসে বললুম: অমন আশ্চর্য হচ্ছ কেন! চাষীরা আর ক্ষেতে বীজ বুনবে না, সে বীজ জলে পচে যাবে।

স্বাতি বলল : তুমি এ কথা ভাবছ কেন ?

বললুম : যারা ভ্রমণে বেরোবে, তাদের ইটিনেরারি তৈরির নোটিস জারি হল। হাতে চার মাস সময়। এরই মধ্যে কোথায় বা কোন্ কোন্ জায়গায় যাব স্থির করে রেলের টিকিট কেটে রিজার্ভেসন করে রাখতে হবে। পুজোর সময়ে যা ভিড় হয়, তার জন্যে তাড়াহুড়ো করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বিস্ময়ের ঘোর স্বাতির কাটে নি, বলল : তুমি তো আর বেরোতে চাও না !

বললুম : নিজের জন্যে বলছি না। বলছি সবার জন্যে।

স্বাতি এবারে সহজ হয়ে বলল : নিজের জন্যে ভাববারও সময় এসেছে।

কেন ?

অনেকদিন তো একটানা বসে আছ, ঘরে মন টিকবে কেন ! পথ তোমাকে টানবে।

সহসা স্বাতির একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। সে বারে আমরা আগরতলা থেকে ফিরছিলুম বোয়িং* প্লেনে। প্লেন মাটি ছেড়ে গাছপালা ছাড়িয়ে মেঘের সমুদ্র পেরিয়ে অনন্ত শূন্যে পৌঁছে যেন স্থির হয়ে গেল। এই স্থির পৃথিবীটা দেখতে না পেলে চলার কথা বুঝি আমরা ভুলে যাই। স্বাতি এক সময়ে বলেছিল : কবি তোমার মনের কথাটিও লিখে রেখে গেছেন।

সে কথা শোনবার জন্য তার মুখের দিকে চাইতেই সে বলেছিল :

'পথেব প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয।'

আর আমি বলেছিলুম :

'আমার এত কালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক।
তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য :
সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি করেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্ন পর্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চির জীবনের অম্লান স্বরূপ।'

স্বাতি জিজ্ঞাসা করেছিল হঠাৎ এ কথা তোমার মনে এল কেন ?

বলেছিলুম : 'কল্পনা করছি—
অনাগত যুগ থেকে
তীর্থ যাত্রী আমি
ভেসে এসেছি মন্ত্রবলে।'

স্বাতি বলেছিল : সত্যিই তাই। থামলে তোমার চলবে না, তোমাকে চলতেই হবে।

এ কথার উত্তরে, আমি হেসে বলেছিলুম : এতো আমাদের পুরনো কথা।

আস্তে ভগ আসীনস্যোর্ধস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরতি চরত ভগশ্চরৈবেতি ॥
বসে থাকলে ভাগ্য বসে রয়,
ছুটে চল আনন্দের রথে।

সুখ শয্যায় ভাগ্য বাঁধা নয়,
ভাগ্য আছে চলার পথে পথে ॥

আমাকে নীরবে থাকতে দেখে স্বাতি বলল : তোমার ভরা ঝুলি যে শূন্য হয়ে গেছে। পুরনো সঞ্চয় থেকে অনেক কষ্টে খুঁজে বার করেছ নেপালের কথা। ভুটানের কথা কি তুমি লিখবে না ?

স্বাতির মুখের দিকে আমি নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলুম। কী বলব, ভেবে পেলুম না।

কিন্তু স্বাতি থামল না, বলল : তোমার পাঠকরা নতুন কথা শোনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। ভুটানের কথা লিখেই তোমার এই দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনী শেষ কর।

আমি একটু ইতস্তত করে বললুম : ভুটান তো শুনেছি একটা ছোট দেশ। ভুটানের কথা দিয়ে একটা গোটা বই কি লেখা যায় !

স্বাতি বলল : তোমার গৌড় পর্বে তো সিকিমের কথা বেশি নেই। অথচ কিছুদিন আগে সেখানেও একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন। সেই দেশের কথাও তোমাকে সযত্নে লিখতে হবে।

এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেবারে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে আমরা এক রাত্রি বাস করেছিলুম। শহরটাই শুধু দেখেছি, দেশের মানুষ জন দেখি নি, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাই নি। আর গ্যাংটকই তো সিকিমের সব নয়, একটা দেশের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানবার আছে। কিছু জানি না বলে সে সম্বন্ধে আমাকে নীরব থাকতে হয়েছে।

স্বাতি বলল : ভয় পাবার মতো কিছু নেই, তুমি রাজী হলেই আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলব।

তারপর ?

তারপর আর অনেক দিন তোমাকে আমি বেরোতে বলব না।

কেন ?

ভুটান পর্বেই শেষ করতে বলব তোমার রম্যাণি বীক্ষ্য। অনেক লিখেছ। পাঠকরাও বোধহয় তোমার মতোই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

তবে আবার আমাকে বেরোতে বলছ কেন ?

স্বাতি বলল : অষ্টাদশ পর্বেই থামা চলত। তা যখন সম্ভব হয় নি, তখন চব্বিশেই ইতি কর।

চব্বিশ কেন ? তেইশে থামলে দোষ কী ?

অষ্টাদশের মতো চব্বিশও একটা শুভ সংখ্যা। গীতার যেমন অষ্টাদশ অধ্যায় বা মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব, তেমনি কৃষ্ণ তাঁর উদ্ধব গীতায় দত্তাত্রেয়র চব্বিশ জন গুরুর উল্লেখ করেছেন। জৈন ধর্মেও চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর।

হেসে বললুম : বুঝেছি।

কী বুঝেছ ?

তার পর যখন আর একটা পর্ব লিখতে বলবে, তখন শাস্ত্র ঘেঁটে পঁচিশ সংখ্যাটিও যে শুভ তা বার করে ফেলবে।

স্বাতি বলল : আপাতত সে ইচ্ছে নেই। থাকলে বেতাল পঞ্চবিংশতির কথা বলতাম।

আমি আর্তনাদ করে উঠলুম : সর্বনাশ !

স্বাতি হেসে বলল : ভয় নেই তোমার। আমাকে তো দুদিকই সামলাতে হয় ! শুধু

তোমাদের দিকটা দেখলেই চলে না। সত্যিই কিছু বাদ পড়ে যাচ্ছে কিনা তাও দেখতে হয়। নেপালের কথা না লিখলে আমি ভুটানের কথা লিখতে বলতাম না। আর সত্যি বলতে কি, এ দুটো দেশের মানুষ আমাদের পর ভাবে না। ভাবলে আমাদের কাছেও পাসপোর্ট আর ভিসা দেখতে চাইত। তাই এ দুটি দেশের মানুষকে আমারও আপন জন বলে মনে হয়। আর সিকিম তো এখন আমাদের দেশেরই অন্তর্গত।

চা খেতে খেতেই আমাদের কথা হচ্ছিল। আমি কোন উত্তর দিলুম না দেখে স্বাতি বলল : তুমি আপত্তি কোরো না, ব্যবস্থা করতে দাও আমাকে।

আপত্তি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই বললুম : তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

স্বাতি বলল : ইচ্ছে আমার নয়, ইচ্ছে তোমার পাঠকদেরই। তোমার গৌড় পর্বে সিকিমের কথা যা লিখেছ, তাতে কারও মন ভরে নি।

সেবারের সিকিম ভ্রমণের কথা আমার মনে পড়ে গেল। এ অঞ্চলে আমি বেড়াতে আসি নি। কালিম্পঙ শহরে আমাদের ফার্মের একটা নূতন শাখা উদ্বোধনের পর আমরা একখানা ল্যাণ্ড রোভারে দার্জিলিঙে আসছিলুম। ঘুমের কাছাকাছি পৌঁছে চারিদিক ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। পথের সামনে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। ভয় হচ্ছিল আমাদের। কিন্তু পাহাড়ী ড্রাইভার নির্ভীক চিত্তে গাড়ি চালাচ্ছিল। আর আমাদের বড় সাহেব মিস্টার ইনিস যখন তাকে ধীরে চলবার নির্দেশ দিলেন, তখন সে বলল, এ তার কাছে কলকাতার চৌরঙ্গীর মতো রাস্তা। পরের মুহূর্তেই ঘটেছিল দুর্ঘটনা। পাহাড়ের একটা বাঁকে সাড়া শব্দ না দিয়ে উল্টো দিক থেকে একখানা গাড়ি ঘাড়ে এসে পড়ছিল। আমরা পাহাড়ের দিকে ছিলুম বলে আত্মরক্ষার জন্যে পাহাড়ের সঙ্গেই ধাক্কা খেতে হল। তারপর কী হয়েছিল তা আর বুঝতে পারি নি।

সকাল বেলায় দার্জিলিঙের হাসপাতালে চোখ খুলেছিলুম। আমার মাথায় চোট লেগেছিল, আর ব্যথা করছিল বুকের উপর দিকটায়। মিস্টার ইনিসের কব্জিতে আঘাত লেগেছিল, আর আমার সহকর্মী মিস্টার জয়সুখ লাল পায়ের যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন।

বিকেল বেলায় ডাক্তার আমাকে আর একবার পরীক্ষা করে বলেছিলেন, কেমন বোধ হচ্ছে এখন ?

আমি সংক্ষেপে বলেছিলুম, ভাল।

ডাক্তার বলেছিলেন, মিথ্যে আমরা ভয় পেয়েছিলুম।

কিসের ভয় !

কাল সন্ধ্যেবেলায় যখন হাসপাতালে এসেছিলেন তখনও আপনি অজ্ঞান ছিলেন, আর মাথায় ছিল একটা ক্ষত। তারপরে যখন দুএকটা এলোমেলো কথা কইলেন, তখনই আমরা ভয় পেয়ে গেলুম। মাথার আঘাত মাঝে মাঝে সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায় কিনা !

সন্ধ্যেবেলায় তিনি কাছে এসে উজ্জ্বল মুখে বললেন, কাল বোধহয় তিনি এসে পৌঁছবেন।

আমি মুখ তুলে বলেছিলুম, কে ?

স্বাতি দেবী।

স্বাতি !

আমি চমকে উঠেছিলুম, বিস্ময়ের অন্ত আমার ছিল না।

ডাক্তার বলেছিলেন, দিল্লী থেকে টেলিফোন করেছিলেন। কেমন আছেন জানতে

চাইলেন, তারপর বললেন যে প্রথম প্লেনেই তিনি রওনা হচ্ছেন।

এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন আমার মনে জট পাকিয়ে উঠেছিল। স্বাতি আমার কথা জানল কী করে, কে খবর দিল তাকে, সে কি একা আসছে, না তার বাবা-মাও সঙ্গে আসছেন ! কিন্তু তার বাবা আসবেন কী করে ! তিনি তো সুস্থ নন। আর তাঁকে ফেলে স্বাতির মা-ই বা আসবেন কেমন করে ! তবে কি স্বাতি একা আসছে !

আমার মুখের দিকে চেয়ে ডাক্তার ভয় পেয়ে বলেছিলেন, আপনার কি কোন যন্ত্রণা হচ্ছে ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি কোনমতে প্রশ্ন করেছিলুম, স্বাতি আমার খবর কী করে পেল ?

ডাক্তার বলেছিলেন, আমরাই খবর দিয়েছি। আপনার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে মিস্টার ইনিস আমাদের 'তার' করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কিন্তু তার ঠিকানা কোথায় পেলেন ?

ডাক্তার সহাস্যে বলেছিলেন, আপনার পকেটে দুখানা চিঠি ছিল, একখানা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া, আর একখানা চিঠি তাঁকে লেখা। আপনি বোধহয় পোস্ট করবার জন্যেই তা পকেটে রেখেছিলেন।

এই চিঠি দুখানার কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। গৌহাটি ছাড়বার ঠিক আগে আমি স্বাতির একখানা চিঠি পেয়েছিলুম, আর তখনই তার উত্তরটাও লিখেছিলুম। সেই চিঠি আমি ডাকে দিতে ভুলে গিয়েছিলুম। তাই অভিভূতের মতো ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বলেছিলেন, এ ভালই হল, আমাদের আর ভাবনা রইল না।

বলে তিনি কাজে চলে গিয়েছিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে এই ডাক্তারের সঙ্গেই মিস্টার ইনিস এসেছিলেন আমাকে দেখতে। কুশল জিজ্ঞাসার পরে বলেছিলেন, শি ইজ কামিং টুমরো।

আমি বলেছিলুম, তাই তো শুনলুম।

শি ইজ ইওর—

লজ্জিত ভাবে আমি বলেছিলুম, শি ইজ মাই—

কথাটা আমি শেষ করতে পারি নি, ভেবে পাই নি কী বলব। তার আগেই সাহেব বলেছিলেন, বুঝেছি।

মুখে তাঁর সরল প্রসন্ন হাসি। ডাক্তারও হাসছিলেন। তাতে আমি অপরিসীম লজ্জা পেয়েছিলুম।

স্বাতি যে আমার মুখের দিকে চেয়েছিল তা খেয়াল ছিল না। সে খেয়াল হল তার প্রশ্ন শুনে। সহসা জিজ্ঞাসা করল : হঠাৎ আবার কোন্ ভাবনায় ডুবে গেলে ?

সত্যি কথা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা হল না, বললুম : দার্জিলিঙের কথা মনে পড়েছে। সেই হাসপাতালের কথা। দরজার দিকে চেয়ে আমি বসেছিলুম। মনে হচ্ছিল যে সন্ধ্যার অন্ধকার বুঝি ঝপ্ করে নেমে পড়েছে। আগের দিনের মতো ধীরে ধীরে একটু একটু করে নামে নি।

তারপর ?

সহসা আমার সমস্ত স্নায়ু শক্ত হয়ে উঠল। দরজার আড়ালে বুঝি একটা রঙীন শাড়ির আঁচল দেখতে পেয়েছিলুম। তারপরেই মন আমাব পুলকে দুলে উঠেছিল। ডাক্তারের সঙ্গে আমি তোমাকে আসতে দেখেছিলুম।

স্বাতি হেসে বলল : বোধহয় খুব অসহায় বোধ করছিলে !

বললুম : না, তা নয় । যা মনে হয়েছিল, তা তোমাকে বলি নি, বলতে পারি নি । তোমার সঙ্গে আর কেউ ছিল না, একা এসেছিলে তুমি । কত দূর থেকে, কত কষ্ট পেয়ে পথে, কত উদ্বেগে উদ্বেল মন নিয়ে । তুমি এসেছ, আর কারও কাছে নয়, আর কোন কাজে নয়, আমার কাছে আমাকে দেখবার জন্যেই দিল্লী থেকে দার্জিলিঙে ছুটে এসেছ । না এসে থাকতে পার নি, থাকতে পারতে না । তাই খাট থেকে আমি লাফিয়ে নামতে চেয়েছিলুম, অভ্যর্থনা করতে চেয়েছিলুম উচ্ছল কণ্ঠে । কিন্তু আমার কী হয়েছিল জানি না, আমি তা করতে পারি নি । তুমি যখন আমার পাশে এসে দাঁড়ালে, আমি কোন কথাই কইতে পারলুম না । শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম অপলক দৃষ্টিতে ।

আর আমি কী করেছিলাম ?

বলে স্বাতি সকৌতুকে আমার মুখের দিকে তাকাল ।

বললুম : তুমিও কোন কথা কইতে পার নি । দু চোখ তোমার ছলছল করে উঠেছিল । ডাক্তার একবার আমার মুখের দিকে, আর একবার তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী বুঝেছিলেন তিনিই জানেন, কোন কথা না বলেই তিনি ফিরে গিয়েছিলেন ।

তারপর ?

তারপরেই তুমি বিছানার ধারে বসে আমার ডান হাতখানা টেনে নিয়েছিলে নিজের দু হাতের মধ্যে । আমার ঠাণ্ডা হাতের ওপরে যে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে, আমি তা অনুভব করেছিলুম । কিন্তু তোমাকে আর আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না ।

স্বাতি স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে বলল : এ কথা আজ তোমার মনে পড়ছে কেন ?

মনে পড়ছে সেবারের সিকিম ভ্রমণের কথায় । হাসপাতাল থেকে তুমি আমাকে একটা হোটেলে এনে তুলেছিলে । সেবায় যত্নে সুস্থ করে তুলেছিলে আমাকে । তারপরেই টেনে নিয়ে গিয়েছিলে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে । সিকিম তখনও ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয় নি । একজন রাজা ছিলেন সিকিমের ।

স্বাতি বলল : মনে আছে, সেদিন সিকিমের রাজাও বিদেশ থেকে ফিরেছিলেন, তাই সমস্ত পথ ফুলে ও মালায় সাজানো হয়েছিল । কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে তাঁর রাজ্য চলে যাবে তা ভাবতেও পারি নি ।

বললুম : সেদিন তুমি আমাকে কী বলেছিলে মনে আছে ?

না ।

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল ।

বললুম : গ্যাংটকের রাজপথে দাঁড়িয়ে তুমি বলেছিলে, সিকিম নিয়ে বেশি মাতামাতি যেন না করি ।

কেন ?

সেদিন আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তুমি বলেছিলে, দার্জিলিঙ আর সিকিম নিয়ে তো বাঙলা নয়, এখনও আমরা পাহাড়েই পড়ে আছি । আর আমি বলেছিলুম, তাই বলে এমন একটা সুন্দর দেশকে আমরা উপেক্ষা করব !

স্বাতি সবিস্ময়ে বলল : তোমার মনে আছে সেই কথা ! সেদিন আমিই তোমাকে সিকিমের কথা আলাদা লেখার পরামর্শ দিয়েছিলাম !

বললুম : তোমার কথা আমি মেনে নিয়েছিলুম। যতটুকু দেখেছিলুম, ততটুকুই লিখেছি। পড়াশুনো করে কিছু লেখবার চেষ্টা করি নি।

এইবারে লেখো। ভুটান পর্বের ভূমিকায় সিকিমের কথাই থাক। হিমালয়ের একটি রাজ্যের কথা সবিস্তারে লিখেছ নেপাল পর্বে, আর দুটি রাজ্যের কথা ভুটান পর্বে লেখো। ভুটান পর্বই হোক তোমার শেষ পর্ব।

বাইরে তখন অবিশ্রান্ত ভাবে বৃষ্টি পড়ছিল, অন্ধকার নামছিল অল্প অল্প করে। স্বাতির কথায় মনে একটা আশ্বাস পেলাম বড় রকমের। নিষ্ঠার সঙ্গে একদিন যে কাজ আরম্ভ করেছিলাম, সে কাজ বোধহয় এবারে শেষ হতে চলেছে। আমার কাছে এ কাজ একটা ব্রত উদ্‌যাপনের মতো মনে হত। এর পরিণামে যে আনন্দ লাভ হবে, তার আস্বাদ আমার জানা নেই। মনে হচ্ছে, এই আনন্দের লোভেই শেষ পর্ব আমাকে লিখতে হবে।

স্বাতি বলল : রাজী তো ?

বললুম : তোমার কথা উপেক্ষা করতে পারি, এমন শক্তি আমার নেই।

শক্তি নয়, বল ইচ্ছা।

হেসে বললুম : মানুষের ইচ্ছাই তো শক্তি।

তবে কালই আমি যাত্রার আয়োজন করছি।

বলে তার চায়ের ট্রলি ঠেলে স্বাতি চলে গেল।

২

সময়ের সঙ্গে এ দেশে পরিবর্তন আসছে অত্যন্ত দ্রুত। গতকাল যা ছিল, আজ তা নেই। আবার আগামীকাল কী হবে তা অনুমান করা যাচ্ছে না। একদিন যা আমরা দেখে এসেছি, আজ তার অনেক কিছুই নাকি মেলে না। এই পরিবর্তন শুধু এ দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এই রকম পরিবর্তন হচ্ছে। সর্বত্র একটা দুরন্ত গতি। এই গতির বেগে পৃথিবীটা ছোট হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। এতদিন যা আমরা দূর বলে ভেবেছি, তা এসে গেছে হাতের মুঠোয়। মহাকাশ জয় করে মানুষ গ্রহান্তরে যাবার কথা ভাবছে। যা এত দিন অসম্ভব বলে ভেবেছি, তা এখন নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে আমরা পারছি না, পিছিয়ে পড়ছি। তবে বসে থাকতে পারছি না। ছুটবার চেষ্টা করছি, আর হোঁচট খেয়ে পড়েও যাচ্ছি। তবু ছুটছি প্রাণপণে। এই ছোটার কোন বিরাম নেই।

কিন্তু এর বদলে কী পাচ্ছি আমরা, তা কি ভেবে দেখছি ? কেউ কি পেয়েছে কিছু ? না কারও ছোটার শেষ হয়েছে ? হয় নি। হবে না বলেই মনে হয়। হওয়া সম্ভব নয়। আকাশের চাঁদ আকাশেই থাকবে, গ্রহ-নক্ষত্র থাকবে তাদের নিজের জায়গায়। মানুষ সেখানে পৌঁছতে পারলেও বসবাস করতে পারবে না, বাঁচবে না পৃথিবীর বাইরে গিয়ে। পৃথিবীতেই তাকে বাস করতে হবে। পৃথিবীতেই হবে তার জন্ম ও মৃত্যু। পায়ে-পায়ে তাকে হাঁটা শিখতে হবে। আর এই ভাবে ধীরে ধীরে হেঁটেই তার পরিচয় হবে পৃথিবীর সঙ্গে। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবে।

আজ গতির প্রতিযোগিতা হচ্ছে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় কি ঘনিষ্ঠ হচ্ছে ? ছুটে চলার সময় তো চারিদিকে চেয়ে দেখবার অবকাশ নেই। নিজের পাশে কে ছুটছে, তার দিকে চাইতে গেলেই যে পিছিয়ে পড়তে হবে ! আমরা কি তাই নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছি না ? গতির বেগে পৃথিবীটাকে ছোট করে এনেও কি আমরা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছতে পারছি ? আপন হতে পারছি কোন নতুন মানুষের ?

অথচ এক সময়ে যখন আমরা উড়ো জাহাজে চড়তে শিখি নি, দ্রুতগামী কোন যানবাহন ছিল না আমাদের, তখন আমরা পায়ে হেঁটে ঘরের বাইরে বেরোতুম নানা কাজে। তীর্থে যেতুম। যে পথে যেতুম, সে পথের ধারের সমস্ত মানুষ আমাদের আপনার হত, আমরা তাদেরই একজন হয়ে যেতুম।

মানুষ কি তীর্থে যেত দেবতাকে দেখবার জন্যে ? দেবতার কি দেখা পাওয়া যায়, না দেবতাকে দেখেছে বলে কেউ কোন দিন দাবী করেছে ? সেদিন সেই দুস্তর দুর্গম পথ অতিক্রম করে কী পেয়েছে মানুষ ? কিছুই কি পায় নি ? তবে কেন গেছে এক জনের পর আর এক জন ? কী পেয়েছে বলে বারণ করে নি তার অনুগামীকে ?

নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছে। তার শূন্য ঝুলি ভরে গেছে পাওয়ার আনন্দে। তাইতেই তো প্রচার করেছে তীর্থের মাহাত্ম্য। কিন্তু সে তো ধন দৌলত নয়, নয় পার্থিব

জগতের কোন সম্পদ। সে ধন অপার্থিব এক অনাবিল আনন্দ। সেই আনন্দের স্পর্শ পেয়ে জীবন ধন্য মনে হয়েছে তীর্থযাত্রীর। মনে হয়েছে দেবতার দর্শন পাওয়া গেছে।

কিন্তু পথের শেষেই কি ছিল মানুষের তীর্থ ? সেই তীর্থে পৌঁছেই কি আনন্দের সন্ধান পাওয়া যেত ? না, পথের দুধারে যে আনন্দ ছড়ানো ছিল, তাই কুড়িয়ে মানুষ অগ্রসর হত ? পথে কি কিছুই সঞ্চয় হত না ? মনে হয় না যে সেকালের তীর্থ ছিল পথের শেষ প্রান্তে। মানুষ নিশ্চযই তার পথের দুধারের দেবালয় দেখতে দেখতেই অগ্রসর হত।

সেদিন মানুষ নিজের দেশকে চিনত, চিনত দেশের মানুষকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় হত, সেই পরিচয় হত আত্মীয়তায় পরিণত। সেদিন দেশ বলতে শুধু নিজের গৃহ এবং আপনার জন বলতে নিজের স্ত্রী-পুত্র কন্যাকেই বোঝাত না। সেদিন সুদূর বিস্তৃত ছিল এই দেশ এবং বসুধা জুড়ে ছিল কুটুম্ব। সবাই আপন, সবাই আমার দেশের লোক। সর্বত্র আমার ঘর ছিল, ছিল আপন জন।

এ যুগের গতি এই ধারণাকে বদলে দিয়েছে। মানুষকে কেড়ে নিয়েছে মানুষের কাছ থেকে। দেশে বিদেশে তার যত ঘর ছিল, সব কেড়ে নিয়েছে। নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে মানুষ। এই নিঃসঙ্গতায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি।

স্বাতি কখন ফিরে এসে আমার কাছে বসেছিল তা খেয়াল করি নি। সহসা তার প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠলুম। স্বাতি জিজ্ঞেস করল : ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি ?

তারপরেই আমার চমকানি দেখে হেসে বলল : কী ভাবছিলে বল !

লজ্জা পেয়ে বললুম : আজগুবি কথা।

তবু শুনি।

তুমি আমাকে আবার ঘর ছেড়ে বেরোবার কথা বলছিলে না ! পুরনো দিনের কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল—দেশে দেশে আমাদের ঘর ছিল, এখন আর কোথাও আমাদের ঘর নেই।

স্বাতি বলল : একটু বুঝিয়ে বল।

বললুম : একটা সময় ছিল যখন এ দেশের মানুষ নিঃসম্বল অবস্থায় তীর্থ-যাত্রা করত পায়ে হেঁটে। পথে তার আশ্রয়ের অভাব হত না, অভাব হত না আহার ও বিশ্রামের। গৃহস্থ তাকে পরম সমাদরে গৃহে স্থান দিত, অতিথিকে দেবতা ভাবত সেকালের মানুষ। তাই না ?

স্বাতি বলল : সে তো পুরাকালের কথা।

বললুম : গত শতাব্দীর শেষের দিকেও এই রকম ছিল, এমনকি এই শতাব্দীর প্রথম দিকেও। মানুষ যত দিন পায়ে হেঁটে তীর্থ ভ্রমণ করত, তত দিন এ দেশে এই নিয়মই ছিল। তারপর এল যানবাহনের দিন। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শিথিল হতে লাগল ধীরে ধীরে।

কেন বলতো ?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাতেই বললুম : এই যানবাহনের সঙ্গে অর্থের একটা সম্পর্ক আছে। অর্থই মানুষের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে। মানুষ যখন পায়ে হেঁটে চলে, তখন তার মধ্যে অর্থের কোন বিজ্ঞাপন নেই বলে সবাই তাকে আপন ভাবে, সবাই আসে এগিয়ে। কিন্তু কোন দ্রুতগতির যান থেকে নামলে ভয়ে পিছিয়ে যায় তারা। অর্থে গতি আছে, নেই আন্তরিকতা। আমাদের গতি যত দ্রুত হচ্ছে, ততই

আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি।

স্বাতি বলল : আজ হঠাৎ এ কথা ভাবছ কেন ?

বললুম : ভাবনা নিজে থেকেই আসে, তাকে জয় করা কঠিন কাজ। আজ তোমার ভ্রমণের কথায় আমার এই ভাবনা চেপে ধরেছে। মনে হচ্ছে যে ভ্রমণ এক দিন দেশের সংহতির সহায় ছিল, আজ আর তা নেই। দেশের মানুষকে আমরা চেনবার সুযোগ হারিয়েছি বলেই বিচ্ছিন্নতা বোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

স্বাতি বলল : এ সব কথা ভাবতে আমার ভাল লাগছে না, তুমি অন্য কিছু বল।

বললুম : তুমি ভুটানে যাবে বললে, ভুটান তো হিমালয়ের রাজ্য নেপাল আর সিকিমের মতো। কিন্তু আমাদের কাছে তার আকর্ষণ আজও বাড়ে নি। অথচ যারা পায়ে হেঁটে কেদারনাথ বা বদরীনাথ গেছেন, তাঁরা বারে বারে যেতে চান। হিমালয় তাঁদের আকর্ষণ করে চুম্বকের মতো। হিমালয়ের মানুষও অপেক্ষা করে থাকে সমতলের মানুষ দেখবার জন্যে। তাই না ?

স্বাতি বলল : সে শুধু হিমালয়ের আকর্ষণ নয়, তীর্থের টানও আছে।

নেপালেও তো তীর্থ আছে—পশুপতিনাথ ও মুক্তিনাথ। কিন্তু তার কি কোন টান নেই ?

নেই নয়, হয়তো তেমন বেশি নয়। কিংবা—

বল।

কেদার-বদ্রীর পথ তো আমরা দেখে এসেছি। তার রূপের তুলনা নেই। পশুপতিনাথের পথও কি এই রকম সুন্দর ?

নেপাল ভ্রমণের কথা আমার মনে পড়ে গেল। পায়ে হেঁটে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে আমরা নেপাল উপত্যকায় পৌঁছই নি। দামন নামে একটা জায়গা থেকে নাকি হিমালয়ের তুষারাচ্ছন্ন শৃঙ্গগুলি সুন্দর দেখা যায়। কিন্তু বাসের ভেতর থেকে সে দৃশ্য আমরা দেখতে পাই নি, দেখতে পাই নি মনে রাখার মতো কোন মনোরম দৃশ্য। অন্ধকারে বিষ্ণুমতী নদীর পুল পেরিয়ে কাঠমাণ্ডু শহরে পৌঁছে গিয়েছিলুম। তার পরদিন সকালে আর একটা বাসে চেপে পশুপতিনাথ দর্শনে গিয়েছিলুম। শহরের এক প্রান্তে বাগমতী নদীর তীরে পশুপতিনাথের মন্দির সমতল ভূমির উপরে। স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে বললুম : কলকাতায় কালীঘাট বা দক্ষিণেশ্বরের পথ কি তোমার সুন্দর বলে মনে হয়েছে ?

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : কলকাতার রাজপথের সঙ্গে তুমি পশুপতিনাথের পথের তুলনা করছ !

বললুম : সেও তো কাঠমাণ্ডুর রাজপথ।

কাঠমাণ্ডুর পথ কি সুন্দব নয় ?

কোন শৈলাবাসের পথের মতো সুন্দর।

তারপরেই প্রশ্ন করলুম : কেদারনাথে পৌঁছবার জন্যে কোথা থেকে আমাদের হাঁটতে হয়েছিল ?

স্বাতি বলল : গুপ্তকাশী ছাড়িয়ে ফাটা নামের একটা জায়গা থেকে। তবে এখন বোধহয় গৌরীকুণ্ডেই পৌঁছনো যাবে বাসে। শোনপ্রয়াগ পর্যন্ত বাসের পথ তো আমরা দেখেই এসেছিলাম ! তাই না ?

বললুম : মনে পড়েছে। ফাটায় বাস থেকে নেমে সকাল সাড়ে দশটাতেই দুপুরের আহার সেরে আমরা পথ চলতে শুরু করেছিলুম। সন্ধ্যে হবার আগেই পৌঁছে

গিয়েছিলুম গৌরীকুণ্ডে। তার পর দিন ভোর বেলায় উঠে কেদারনাথ যাত্রা। এক বেলার পথ, আর পথের দুধারে হিমালয় তার অতুল ঐশ্চর্য নিয়ে উপস্থিত। মন্দাকিনীর ধারা, আর পাহাড়ের গায়ে জমা বরফ। সব শেষে দেওদেখনি থেকে তুষার মণ্ডিত চুড়োর নীচে কেদারনাথের মন্দির! সে দৃশ্য কি কোন দিন ভুলতে পারব! না না, নেপালে আমি এ রকম সুন্দর দৃশ্য দেখি নি।

স্বাতি বলল : বাসে বসেই বদ্রীনাথে পৌঁছে গিয়েছিলাম বলে আমরা বোধহয় অনেক কিছু হারিয়েছি।

এইজন্যেই বলছিলুম যে এই গতির যুগে আমরা অনেক কিছুই হারাচ্ছি, কিন্তু তার বদলে কী পাচ্ছি তা এখনও জানি না।

কিছু নিশ্চয়ই পাচ্ছি।

হ্যাঁ, দূরকে কাছে পাচ্ছি, দুর্গমকে জয় করছি, আর সময় বাঁচাচ্ছি। কিন্তু সময় বাঁচিয়ে সেই সময় কী ভাবে ব্যয় করছি তা বলতে পারব না।

স্বাতি বলল : জীবনের মূল্যবোধ বদলে যাচ্ছে।

যাচ্ছে নয়, গেছে বলতে পার। আমরা এখনও পুরনো যুগটাকেই আঁকড়ে ধরে আছি বলেই মনে হচ্ছে যে জীবনের মূল্যবোধ বদলাচ্ছে। আসলে তা অনেকদিন আগেই বদলে গেছে। সময়ের সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারলে একেই বলবে জেনারেশন গ্যাপ। গ্যাপ বলে কিছু নেই, কালের প্রবাহটাই এই রকম। সময়ের সঙ্গে সবই বদলায়। তা মানিয়ে চলতে না পারলেই মনে হয় একটা গ্যাপ।

স্বাতি বলল : কিন্তু আমরা আজ এ সব আলোচনা করছি কেন?

বললুম : তুমি আমার ভাবনার কথা জানতে চেয়েছিলে। আর আমি ভাবছিলুম যে সময়ের সঙ্গে ভ্রমণের ধারাও কি পাল্টায় নি? যারা ভ্রমণ করে, তাদের পথ, রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গি? এখনও কি কেউ পুরাণ-ইতিহাসের কথা, শিল্প-সংস্কৃতির কথা, ধর্ম ও দেবালয়ের কথা, মানুষের সুখ দুঃখের কথা জানতে চায়? এ সব কথা জানবার কি সময় আছে কারও, না আগ্রহ আছে? এ সব কথা কি আজকের মানুষের কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হবে না?

স্বাতি গম্ভীর হয়ে গেল। কোন উত্তর দিল না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম : কোন কথা বলছ না যে!

স্বাতি কিছু বেদনার্ত স্বরে বলল : তুমি তো এমন হতাশাবাদী ছিলে না!

হেসে বললুম : আজও নই। মানুষ তো আশা নিয়েই বাঁচে! আশা ফুরিয়ে গেলেই তো তার মৃত্যু!

তবে?

ভাবছি, এ যুগের মানুষও তো ঘরে বসে থাকতে চায় না, ছুটতে চায় তারাও। তাদের ভ্রমণ কী রকম হয়েছে বা কী রকম হবে অদূর ভবিষ্যতে?

স্বাতি সহাস্যে বলল : কত তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায় সেখানে, আর কত আরামে থাকা যায়!

আর?

আর জীবনে উপভোগের সামগ্রী আছে কত রকম!

তাই কষ্ট করে কেদারনাথে যাব কেন?

তার চেয়ে সিঙ্গাপুর ভাল, কিংবা মায়ামি?

আমি হেসে বললুম : হঠাৎ সিঙ্গাপুরের কথা মনে পড়ল কেন?

স্বাতি বলল : উমাশঙ্করের সঙ্গে পপি সিঙ্গাপুরে বেড়াতে গেছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : সিঙ্গাপুরে !

স্বাতি অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য নিয়ে বলল : সিঙ্গাপুরে ইলেকট্রনিক্সের কত যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় জানো না ? ভিডিও, ভিসিআর ব্লু ফিল্ম আর টুকিটাকি কত জিনিস ? কত সিলেক্সন ? ডিউটি দিয়েও সস্তা হয়।

যাদের সঙ্গে আমরা দীঘায় গিয়েছিলুম, যাদের বিয়ে দেখেছিলুম পাশাপাশি বসে, তুমি কি তোমার সেই বন্ধুদের কথা বলছ ?

তাদের ভুলতে পারনি তো ? পারবে না ভুলতে। পপি আমার বন্ধু, একই বয়সী আমরা। আমাদের দুজনের মধ্যে রুচির কোন প্রভেদ থাকা উচিত ছিল না। অথচ আছে। থাকবেও। মানুষের রুচির এই প্রভেদ চিরকাল থাকবে বলেই আশা করি। তাই তোমার দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। পপিদের সঙ্গে আমরাও থাকব মিলে মিশে।

আমি আশ্চর্য হলুম স্বাতির কথা শুনে। আর আমি বিস্মিত হয়েছি বুঝে সে সকৌতুকে বলল : এই ভাবেই পৃথিবীর সব দেশ এগোচ্ছে। এরোপ্লেনের সঙ্গে গরুর গাড়িও চলছে, ট্রাক্টরের সঙ্গে লাঙ্গল। যে দেশের মানুষ দুবেলা খেতে পায় না, সেই দেশেরই মানুষ সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে ভিডিও-ভিসিআর কিনতে। ভিডিও ফিল্মের লাইব্রেরি দেখেছ পাড়ায় ?

না।

বইএর লাইব্রেরি নেই, আছে ভিডিও লাইব্রেরি। যে কোন হিন্দী ফিল্ম তো পাবেই, ব্লু ফিল্মও পাবে। আগে এই সব ফিল্ম দেখবার নির্দিষ্ট জায়গা ছিল, এখন নিজের বাড়িতেই দরজা বন্ধ করে দেখছে। এও তো রুচির কথা। এই রুচিও আমাদের বরদাস্ত করতে হবে।

প্রতিবাদ করার মতো কোন কথা আমি খুঁজে পেলুম না। বললুম : কী লিখব ভেবে পাচ্ছি না। কাদের জন্য লিখব তা বুঝতে না পেরে কাজে উৎসাহ পাচ্ছি না।

স্বাতি বলল : তুমি নিজেই তো তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলে !

কী রকম ?

কাদের জন্যে কী লিখবে ভেবে পাচ্ছ না তো ! তুমি যা জানতে চাও তা নিজের জন্যেই লেখো। একটা অপরিচিত দেশ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অনেকের অনেক কৌতূহল আছে।

এক বিদেশীর কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনি ভুটানকে বলেছেন বিশ্বের শেষ শ্যাংগ্রিলা। পৃথিবীর আনাচে কানাচে যত নিষিদ্ধ দেশ ছিল, তার মধ্যে ভুটানই বোধহয় সবার শেষে তার দ্বার খুলে দিয়েছে পর্যটকদের কাছে। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্তে এই ছোট দেশটি সম্বন্ধে এখনও আমাদের কোন ধারণা নেই। তাই স্বাতির কথা আমাকে মেনে নিতে হল।

বললুম : বলেছ ভাল—আমি যা জানতে চাই তা নিজের জন্যেই লিখব অর্থাৎ আজও যারা আমার মতো ভাবছে, তারাই পড়বে আমার বই। কিন্তু আমার কী মনে হচ্ছে জানো ?

কী ?

এইটুকু দেশে জানবার মতো কথা কী থাকতে পারে ? নেপালের জনকপুরে রামায়ণের নায়িকা সীতার জন্ম হয়েছিল, গৌতম বুদ্ধ জন্মেছিলেন নেপালের লুম্বিনী

বনে। পশুপতিনাথ শিব আছেন নেপালে, আছেন মুক্তিনাথ নারায়ণ। মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ এসে একটা জাতি গঠন করেছিলেন গোরখা নামে। কয়েকটি রাজবংশ তাদের শিল্পপ্রীতির পরিচয় রেখে গেছেন কাঠমাণ্ডু উপত্যকায়। মহিমান্বিত হিমালয়ের কয়েকটি তুষার শৃঙ্গ বিশ্বের বিস্ময় জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এখনও অব্যাহত আছে এই সব শৃঙ্গ বিজয়ের প্রয়াস। আরও কত কথা আছে জানবার, কত আকর্ষণ আছে সুন্দর প্রকৃতির। কিন্তু—

ভুটানে কিছু নেই ভাবছ?

জানি না কী আছে।

সেই কথাই তো তোমাকে জানতে বলছি। এত দিনের নিষিদ্ধ দেশে নিশ্চয়ই অনেক কথা আছে জানবার, দেখবারও অনেক কিছু আছে। আর তা বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা নয়, সমগ্র হিমালয়কে, হিমালয়ের সবকটি দেশকে একসঙ্গে দেখা।

ভয়ে ভয়ে আমি বললুম: তবে কি আবার আমাদের নেপাল সিকিম ও ভুটানে যেতে হবে?

স্বাতি হেসে বলল: সে কথা তুমি জানো। দরকার মনে করলে যাবে। আমার জন্যে নয়। তার মানে, যদি কিছু দেখে এলে তুলনা-মূলক লেখার সুবিধে হয়, তবে আবার তোমাকে যেতেই হবে। ভ্রমণ কাহিনী তো ঘরে বসে লেখা উচিত নয়!

বুঝতে পারলুম যে মাকড়শার মতো আমি নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছি। এ জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার উপায় আমার নেই। জাল আমাকে বুনে যেতেই হবে। তাই আমি তর্ক না করে স্বাতির কাছে আত্মসমর্পণ করলুম। তার কাছে পরাজয়ে আর আমার লজ্জা নেই, আমার জন্যেই সে আমাকে জয় করতে চায়।

স্বাতি আমাকে নীরব দেখে বলল: আমি জানি, তুমি রাজী হয়ে যাবে।

বললুম: রাজী না হয়ে যে উপায় নেই, তাও তো তুমি জানো!

স্বাতি হাসল। সেই আগের মতো সরল নির্মল হাসি। এই হাসি দিয়েই সে আমাকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত রাখে, হৃদয় ভরিয়ে দেয় আত্মসমর্পণের আনন্দে। আমার মুখে প্রসন্নতা দেখে বলল: আজ থেকেই যাত্রার আয়োজন করতে হবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: মানে!

মানে একখানি মানচিত্র চাই সবার আগে। না থাকলে সংগ্রহ করতে হবে। তারপর পুঁথিপত্র কী আছে আর কী নেই, তা দেখতে হবে।

বললুম: আর কী পাওয়া যাবে, তাও।

স্বাতি বলল: তুমি মনে করবার চেষ্টা কর, আমি খানাতল্লাসী করে আসি।

হেসে বললুম: উত্তরপাড়ায় থাকলে তোমাকে কষ্ট করতে হত না।

কেন?

আমাদের বুড়ো লাইব্রেরিয়ান মুকুন্দবাবুই এ কাজ করতেন।

তবে এক দিন চল না তাঁর কাছে।

দরকার হলে যাব। তার চেয়ে আজ একখানা গান শোনাও। অনেক দিন তোমার গান শুনি নি।

গান নয়, বাজনা বল। বাঙলাতেই আমরা সঙ্গীতকে গানবাজনা বলি—কণ্ঠ সঙ্গীত আর যন্ত্র সঙ্গীত। আসলে দুইই সঙ্গীত—গান। আনন্দ আর গান হাত ধরা ধরি করে চলে। পথ চলাতেও আনন্দ আছে।

তবে কি ভ্রমণকেও গান বলবে?

বলে স্বাতি হাসল।

কিন্তু আমি বললুম : নৃত্য যদি সঙ্গীতের অঙ্গ হয় তো ভ্রমণের ছন্দ কেন গান হবে না ?

স্বাতি বলল : যুক্তির কথা।

তারপর একখানা মানচিত্র এনে আমার হাতে দিয়ে নিজে সেতার বাজাতে গেল। সে জানে যে এই মানচিত্রটি খুলে বসলেই তার ছুটি হয়ে যাবে রান্নাঘরে যাবার।

৩

কয়েক কোটি বছর আগে নাকি হিমালয় পর্বত নামে কোন পাহাড় ভূভারতে ছিল না ; তখন সেখানে ছিল সমুদ্র । এই নিয়ে নাকি মতভেদও আছে । কিন্তু কোন্ মতটি এ যুগের পণ্ডিতরা মেনে নিয়েছেন, তা আমার জানা নেই । কলেজে অধ্যাপকদের ঘরে জিওলজির প্রফেসর সনাতনবাবুকে ঢুকতে দেখে সহসা আমার এই কথা মনে পড়ে গেল । ভাবলুম, তাঁকে প্রশ্ন করে বোধহয় এ বিষয়ে কিছু জানা যাবে । তাই তাঁকে সবিনয়ে বললুম : সনাতনবাবু কি আজ খুব ব্যস্ত আছেন ?

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন : কেন বলুন তো ?

বললুম : আপনার কাছে একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে ।

ভদ্রলোক কোন প্রশ্ন না করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন দেখে বললুম : অনেকেই বলেন যে এখন যেখানে হিমালয় পাহাড়, এক সময়ে সেখানে এক অগভীর সমুদ্র ছিল । কথাটি কি সত্যি ?

ভদ্রলোক কিছু বিস্মিত হয়ে বললেন : আপনাব তো ভূতত্ত্বে কোন আগ্রহ দেখি নি ! হঠাৎ এ রকমের একটা কথা জানতে চাইছেন ?

বলে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইলেন ।

বললুম : হিমালয়ে বেড়াতে যাবার কথা ভাবছি কিনা, তাই নানা রকমের প্রশ্ন মনে আসছে ।

সনাতনবাবু বললেন : বইপুঁথি নিজের জায়গায় রেখে আসছি আপনার কাছে ।

বলে এগিয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে পাশের একখানা চেয়ারে বসলেন । আমি আমার নিজের চেয়ারখানা একটুখানি ঘুরিয়ে নিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম । ভদ্রলোক বললেন : হিমালয় এক সময়ে সমুদ্র ছিল কিনা, এই আপনার প্রশ্ন ! তাই ছিল । এ আমার কথা নয়, এ পণ্ডিতদের কথা । আজ যে সমুদ্রের চিহ্নও নেই, সেই বিলুপ্ত সমুদ্রের নাম টেথিস । ভূবিজ্ঞানীরা এই নাম দিয়েছেন, বলেছেন যে এই সমুদ্রের অস্তিত্ব ছিল পঞ্চাশ কোটি বছরেরও আগে ।

পঞ্চাশ কোটি বৎসরের কথায় আশ্চর্য হয়ে বললুম : বলেন কি !

ভদ্রলোক বললেন : ভাববেন না যে এই সব কথা তৈরি করে বলা হয়েছে । এর পেছনে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আছে ।

বললুম : সহজ করে বললে কি আমি বুঝতে পারব না ?

আমি যথাসাধ্য সহজ করে বলতে পারি, বোঝা না বোঝা আপনার হাতে । বসুন আপনি । আমিও বোঝবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করব ।

সনাতনবাবু বললেন : টেথিস সমুদ্রে পলির স্তর জমা হচ্ছিল এবং তার পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছিল ও চাপ পড়ছিল দুপাশ থেকে । তারও পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডের সঙ্গে সমস্থিতির প্রবণতার দরুন উত্তুঙ্গ হয়েছিল । মানে সমুদ্রের খাতে জমা পলি পাশের উঁচু

ভূখণ্ডের সঙ্গে একটা সমন্বয় চাইছিল।

বললুম : এ কত দিন আগের ব্যাপার ?

একে ইওসিন যুগের ব্যাপার বলতে পারেন।

সত্য-ত্রেতা যুগের কথা জানি, কিন্তু ইওসিন যুগ শুনি নি। এ কথা বলতেই সনাতনবাবু বললেন : তা প্রায় ছ কোটি বছর আগের ঘটনা বলতে পারেন। সেই সময়েই সমুদ্রের গর্ভ থেকে হিমালয়ের উত্থানের সূত্রপাত হয়। কিন্তু এক দিনে বা কয়েক বছরে এ রকম হয়েছে ভাববেন না। এই উত্থানের ব্যাপারটা চলেছিল মায়োসিন ও প্লায়োসিন যুগেও, মানে দু কোটি থেকে সোয়াকোটি বছর আগে পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যেই মূল হিমালয় ও মধ্য হিমালয়ের উত্থান সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করা হয়।

বিস্ময় প্রকাশ করবার জন্য বললুম : দারুণ ব্যাপার !

কিন্তু সনাতনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন : সবটা না শুনেই বলছেন, দারুণ ব্যাপার ! ভাবছেন, হিমালয়ের উত্থান এমন তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছে !

কয়েক কোটি বছরেও শেষ হয় নি ?

এ দিকের শিবালিক পর্বতমালা তো অনেক অর্বাচীন। যে সব নদ নদী এসে টেথিস সমুদ্রে পড়ত, তাদেরই পলিমাটি জমে এই পর্বতমালা সৃষ্টি হয়েছে। তার সূচনা হয়েছিল এক কোটি বছর আগে এবং এর বর্তমান আকার ধারণ করেছে দশ লাখ বছর আগে। এই বারে বলুন তো কত দিন ধরে হিমালয় আজকের হিমালয় হয়েছে ?

বললুম : তা প্রায় ছ কোটি বছর সময় লেগেছে।

ভদ্রলোক বললেন : বগরেক্ট্। এ সব যে অনুমানের কথা নয় তা এবারে বুঝিয়ে বলছি।

বলুন।

হিমালয়কে এখন আমরা তিনটি অঞ্চলে ভাগ করি। সব চেয়ে উত্তরে তিব্বতীয় অঞ্চল। সেখানে আমরা সেডিমেণ্টারি রক অর্থাৎ পাললিক শিলা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়ে আছে দেখি। এই শিলা সঞ্চিত হয়েছিল প্যালিওজোইক যুগ থেকে আরম্ভ করে মেসোজোইক যুগ পর্যন্ত। এর দক্ষিণে হিমালয় অঞ্চল মূল ও মধ্য হিমালয় জুড়ে বিস্তৃত। এখানে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে এই অঞ্চলে উপরের সেডিমেণ্টারি রকের নীচে চাপা আছে মেটামরফিক অর্থাৎ অতি প্রাচীন পরিবর্তিত শিলা। এর দক্ষিণে শিবালিক পাহাড়ে পাওয়া গেছে টার্শিয়ারি যুগের সেডিমেণ্টারি শিলার স্তর। এগুলি যে নিতান্তই অর্বাচীন, এতে ভূবিজ্ঞানীদের কোন সংশয় নেই।

তারপর ?

হ্যাঁ, তারপরে নয়, তার মাঝখানে আছে। হিমালয় ও শিবালিক পাহাড়ের শিলাস্তরগুলির মাঝে একটা ফল্ট্ মানে একটানা চ্যুতি আছে। মূল ও মধ্য হিমালয় যে শিলার সমষ্টিতে গঠিত, তার প্রকৃতি ও গঠনই এখন একটি সমুদ্রের অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে। সমুদ্র নেই, কিন্তু তার অস্তিত্বের সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয়ও নেই। আর একটি কথা মনে রাখবেন।

বললুম : বলুন।

অনেক ভূবিজ্ঞানীর ধারণা যে এখন আমরা এই অঞ্চলে যে সব নদী দেখতে পাই, তাদের উৎপত্তি হয়েছিল হিমালয়ের জন্মের আগে।

বলেন কি !

ঠিকই বলছি। নদীগুলো হিমালয়ের চেয়েও বেশি বয়সের।

কিন্তু পলিমাটিতে তার খাত এখনও ভরে যায় নি?

কিছু কিছু নিশ্চয়ই গেছে। যেমন সরস্বতী, দৃষদ্বতী—

এ সব তো বৈদিক যুগের নদী। বেদের ঋষিরা এই সব নদীর স্তব-স্তুতি করতেন!

ভদ্রলোক এবারে তাঁর চেয়ারখানা আমার দিকে ঘুরিয়ে বসে বললেন: হিমালয় সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে, জানেন!

আরও অনেক কথা!

লম্বা ও চওড়ায় হিমালয় কত বড় জানেন তো?

বললুম: না।

ভদ্রলোক বললেন: হিমালয় পূর্ব পশ্চিমে পনেরশো মাইল বিস্তৃত এবং প্রস্থে মাইল পঞ্চাশেক। মূল হিমালয়কে ইংরেজীতে বলে গ্রেট হিমালয়।

এবারে আমি প্রমাদ গুনলুম। ভদ্রলোক যদি এবারে হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ণনা শুরু করেন তো পাগল হয়ে যেতে হবে। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলে বেঁচে গেলুম। পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমার এক নবীন সহকর্মী বললেন: গোপালবাবুকে আপনার ক্লাশে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন?

সনাতনবাবু রেগে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: আপনাকেও নিয়ে যাব।

বলে নিজের জায়গায় চলে গেলেন। পরিত্রাণ পেয়েও আমি একটা গ্লানি অনুভব করলুম মনে। মনে হল যে আমিই ভদ্রলোককে অপদস্থ করার কারণ হলুম। আমার হয়তো প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। এই রকমই বোধহয় হয়। অপরের জ্ঞান আমরা শ্রদ্ধার চোখে দেখি না, একমাত্র নিজেকেই জ্ঞানী বলে ভাবি।

ভেবেছিলুম যে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের কথাও জানবার চেষ্টা করব। কিন্তু এই ঘটনার পর সে উৎসাহ আর পেলুম না। কলেজের ছুটির পর যথারীতি বাড়ি ফিরে এলুম।

স্বাতি সংবাদ দিল যে সে ট্রেনে রিজার্ভেসনের ব্যবস্থা করে এসেছে। তার এক সহকর্মীর সঙ্গে রিজার্ভেসন অফিসের কারও পরিচয় আছে। স্বাতি টিকিটের টাকা নিয়ে গিয়েছিল। আগামীকাল টিকিট পাবে। ফেরার ব্যবস্থাও হবে। কলকাতার বাইরেই কাটবে পুজোর ছুটিটা। তবে যাত্রা পুজোর পরে। স্বাতি বলল: তারিখ নিয়েই ঝামেলা হয় তো! তাই বলেছি, যেদিন জায়গা পাওয়া যাবে, সেদিনই আমরা যাত্রা করব। আর দিন দশেক পরে ফেরা। ঠিক বলেছি?

বলে আমার দিকে তাকাতেই বললুম: খুব ঠিক। ভুটানে এক সপ্তাহ থাকলেই যথেষ্ট। একটা ধারণা তো হবে, বাকিটা পড়াশুনো করে পূরণ করা যাবে।

গতকালের মতো আজও অনেক কথা হল চা খেতে খেতে। হিমালয় পাহাড় সমুদ্র থেকে উঠেছে শুনে স্বাতি বলল: তোমার পুরাণ কী বলে?

বললুম: পুরাণে আমরা কোটি বছরের হিসেব পাই নে। সহস্র অযুত নিযুত ও কোটি শব্দের ব্যবহার আছে, লক্ষ নেই। দীর্ঘ কাল বোঝাতে সহস্র অযুত নিযুত ও কোটি শব্দের ব্যবহার হত। যেমন মুনি ঋষিরা দশ হাজার বছর তপস্যা করতেন। ব্রহ্মার একদিন চার শো বত্রিশ কোটি বছর।

স্বাতি হেসে বলল: সর্বনেশে কথা।

কিন্তু ভয়াবহ নয়।

কেন?

পুরাণে এই রকমের অঙ্ক দেখে ভয় পেলে চলবে না। আমরা যেমন একালের যোগী বা মহাপুরুষদের নামের আগে একশো আটটি শ্রী জুড়ে দিই, তেমনি—সেকালের কোন বিখ্যাত রাজা পঞ্চাশ হাজার বছর রাজত্ব করছেন শুনলে বুঝতে হবে যে তিনি পঞ্চাশ বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দীর্ঘকাল বোঝাবার জন্যেই সহস্র শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

স্বাতি বলল : বুঝেছি, কালের সঠিক হিসেব করতে হলে এই রকমের অত্যুক্তি মনে রাখতে হবে। কত কালের পুরনো ঘটনা পুরাণে আছে বলে তোমার ধারণা?

আমি একটা হিসেব করেছিলুম। তাতে দেখেছি যে পুরাণে প্রায় আট হাজার বছরের ঘটনা পাওয়া যায়। যে মনুর নামে আমাদের মানব বা মানুষ নাম, সেই আদি পুরুষ ছিলেন সেই সময়ে। পুরাণে তিনি স্বায়ম্ভুব মনু নামে পরিচিত। তাঁর পরে আরও সাতজন মনুকে পাওয়া যায়। এক এক জন মনুর কাল ধরা হত তিনশো পঞ্চান্ন বছর, আগে ও পেছনে আরও দু বছর করে ধরে চোদ্দজন মনুকে নিয়ে পাঁচ হাজার বছরের এক কল্প কল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু সপ্তম মনু বৈবস্বতের সময় থেকেই গণনার এই হিসেব বাতিল হয়ে যায়।

কেন?

কেউ বোধহয় বলেছিলেন যে সাড়ে তিনশো বছরের এক একটা মন্বন্তর অর্থাৎ এক একজন মনুর কাল দিয়ে ঘটনাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না।

এ রকমের কথা কে বলতে পারেন?

কোন ঐতিহাসিক।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল : দেশে তখন ঐতিহাসিক ছিল?

বললুম : যে পৃথু রাজার নামে এই দেশের নাম হয়েছিল পৃথিবী, তিনিই তাঁর রাজসভায় প্রথম ঐতিহাসিক নিয়োগ করেন। তাদের বলত সূত ও মাগধ। সব রাজার সভায় একজন করে মাগধ থাকত। আর সূতেরা ঘুরে ঘুরে মাগধদের কাছে থেকে সংবাদ সংগ্রহ করত। ঋষিরা যখন যজ্ঞ করতেন, তখন এই সূতরা পুরাণ কথা শোনাতেন। পুরাণ কথা মানে পুরাতন কথা, ইতিহাসের কথা, রূপকথা নয়।

এ কত দিন আগের ঘটনা বলছ?

পৃথু রাজা ছিলেন তামস মন্বন্তরে। অর্থাৎ প্রথম মনুর প্রায় হাজার বছর পরে। তাঁর মৃত্যুর দুপুরুষ পরে এক বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবনে সব কিছু ডুবে যায়। প্রায় এক হাজার বছর পৃথিবী জলমগ্ন ছিল বলে আমার ধারণা। সিন্ধু নদের উপত্যকায় যে সভ্যতার চরম বিকাশ হয়েছিল, তা এই বন্যাতেই ধ্বংস হয়ে যায়। পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিয়ে যারা আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল, বৈদিক যুগের আর্য ঋষিরা তাদেরই দাস বা দস্যু বলে অভিহিত করেছেন।

স্বাতি সবিস্ময়ে বলল : এ তোমার নিজের কথা?

হেসে বললুম : তুমি যদি থিসিস লিখে ডক্টরেট পেতে চাও তো আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। কুণ্ডু মুনির কাহিনী দিয়ে প্রমাণ করে দেব যে প্রায় এক হাজার বছরের একটা অন্ধকার যুগ ছিল এই বন্যার পর। তারপর পৃথুর বংশে প্রচেতা নামের একজন বা দশজন সমুদ্রের তীর থেকে অরণ্য অঞ্চলে এসে এক অরণ্যবাসী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র দক্ষের কন্যারাই দেবতা দৈত্য দানব নাগ গন্ধর্ব অপ্সরানামে নানা জাতির জন্ম দিয়েছেন।

এঁদেরও কি তুমি কালের হিসেবে ধরতে পার?

বললুম : নিশ্চয়ই পারি। এঁরা সবাই ছিলেন বৈবস্বত মন্বন্তরে, অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ থেকে ছ হাজার বছরের মধ্যে। বেদ তো আরও পরবর্তীকালের রচনা, বেদের ঋষিরা এই সব জাতকে দেখেন নি। শোনা কথার উপমা আছে তাঁদের রচনার নানা স্থানে ছড়িয়ে।

স্বাতি বলল : তোমার কথায় মনে হচ্ছে যে পুরাণে বৈদিক যুগের অনেক আগের ঘটনা বিবৃত থাকলেও বেদ পুরাণের আগে রচিত হয়েছে।

এ শুধু আমার ধারণা নয়, অনেক পণ্ডিতেরও এই মত। পুরাণকাবরা অবশ্য দাবী করেন যে সকলের আগে পুরাণ, তারপর বেদ। আসলে বৈদিক যুগের অনেক পরবর্তীকালে পুরাণ রচনা আরম্ভ হয়। তবে পুরাণের ঘটনাবলী ঠিক কী ভাবে রক্ষিত হত তা অনুমান করা যায়। সেগুলি মুখে মুখেই চলে আসছিল এবং সূত জাতির মানুষেরাই এই পুরাণ কাহিনী রক্ষা করত। তাই বেদে যে সব কাহিনীর উল্লেখ মাত্র আছে, তারই সূত্র ধরে পুরাণকাররা দীর্ঘ কাহিনী রচনা করেছেন। পুরাণে এই সব কাহিনীর বিভিন্নতাও এই কারণে। যিনি যেমন শুনেছেন বা কল্পনা করেছেন, তিনি তেমনি করেই লিখেছেন।

স্বাতি সহসা প্রশ্ন করল : বেদে হিমালয়ের প্রসঙ্গ নেই ?

বললুম : তুমি তো জানো যে সম্পূর্ণ বেদ আমি পড়ি নি, পড়েছি বেদের আলোচনা। সিন্ধু প্রভৃতি সপ্ত নদীর কথা পেয়েছি, পেয়েছি গান্ধার প্রদেশের কথা, শর্যণাবৎ সরোবরের কথাও পেয়েছি।

শর্যণাবৎ সরোবর !

না, মানস সরোবর নয়, এ সরোবর ছিল কুরুক্ষেত্রে। কিন্তু আশ্চর্য, হিমালয় নাম পেয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না !

স্বাতি বিস্মিত হয়ে বলল : সেকি, বৈদিক যুগে হিমালয় ছিল না !

ছিল না বলতে পারলুম না, বললুম : সত্যিই এটা অনুসন্ধানেব বিষয়। পুরাণে এই হিমালয় অঞ্চলকে বলত অন্তরীক্ষ। কিন্তু সেটা তিব্বতেব দিক, না ভারতেব দিক তা বলতে পারব না।

অনুমান করতে নিশ্চয়ই পারবে !

চেষ্টা করতে পারি।

স্বাতি বলল : তাই কর।

বললুম : আমাদের এই এশিয়া মহাদেশটা বোধহয় জম্বুদ্বীপ নামে অভিহিত হত। এর মধ্যে যে বর্ষ বিভাগ হয়েছিল তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে হিমালয়ের উত্তরে পামির অঞ্চলের নাম ছিল ইলাবৃত বর্ষ এবং এরই মাঝখানে মেরু পর্বতকেই স্বর্গ বলা হত। ভৌগোলিকরা বোধহয় পামির নট্‌কেই পুরাকালের স্বর্গ বলতেন। এই স্থান এখন রাশিয়ার অন্তর্গত। হিমালয়ের দক্ষিণে ছিল হিমবর্ষ। প্রথম মনু সমগ্র জম্বু দ্বীপের রাজা ছিলেন, তাঁর নাতি অগ্নিধ্র তাঁর নয় ছেলের মধ্যে এই জম্বুদ্বীপটি ভাগ করে দেন। নাভি পেয়েছিলেন হিমবর্ষ। এই নাভির নাতি ভরতের নামেই হিমবর্ষের নাম ভারতবর্ষ হয়েছিল। অগ্নিধ্রর আর এক ছেলে ভদ্রাশ্ব বর্ষ পেয়েছিলেন। এটি চীন দেশের প্রাচীন নাম বলে মনে করা হয়।

আর অন্তরীক্ষ ?

সে সময়ে অন্তরীক্ষ বলে কোন স্থান ছিল বলে মনে হয় না।

তবে ?

অনেক পরে অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর কালে বিবস্বান নামে দেবতা জাতির একজন এই অন্তরীক্ষের রাজা হয়েছিলেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরারা তাঁর রাজ্যেই বাস করত। পরবর্তীকালে এঁকেই আকাশের সূর্য বলা হয়েছে এবং এঁরই এক ছেলে মনু বৈবস্বত মনু নামে অভিহিত। মনুর ছেলে ইক্ষ্বাকুর বংশ সূর্য বংশ এবং কন্যা ইলা চন্দ্র বংশের জননী।

তা কেন হবে ?

চন্দ্রের ছেলে বুধের প্রেমে পড়েছিলেন ইলা। বিয়ে বোধহয় নি। তাই এঁদের প্রেম নিয়ে অবিশ্বাস্য গল্প রচনা করা হয়েছে পুরাণে। মোট কথা বুধ ও ইলার ছেলে পুরূরবাই চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ। এই দুই বংশই এ দেশে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছেন সগৌরবে।

স্বাতি চলল : তুমি অন্তরীক্ষের কথা বলছিলে।

বললুম : মনে পড়েছে। বিবস্বান যখন অন্তরীক্ষের রাজা, তখন তাঁর ভাই ইন্দ্র স্বর্গের রাজা। স্বর্গ হল ইলাবৃত বর্ষ। অর্থাৎ ভারতের উত্তরে। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে যে হিমালয়ের উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ তিব্বতই ছিল অন্তরীক্ষ। আবার কৈলাস অঞ্চলের লোকপাল বা রাজা ছিলেন কুবের। রুদ্র বা শিবের ভক্ত ছিলেন তিনি অর্থাৎ কুবের শিবের অধীন ছিলেন বলেই মনে হয়। যেমন ক্ষীরোদ সাগর অর্থাৎ কাস্পিয়ান সাগরবাসী বিষ্ণু ছিলেন ঐ অঞ্চলের সম্রাট এবং ইলাবৃত বর্ষের রাজা ছিলেন বিষ্ণুর অধীন। তাঁকে ইন্দ্র বলা হত।

স্বাতি বলল : তারপর ?

বললুম : দৈত্য ও দানবরা ছিলেন প্রথম ইন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

তাঁরা কোথায় রাজা ছিলেন ?

মনে হয় ইন্দ্রের আধিপত্য তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন এবং দৈত্য দানবদের সঙ্গে দেবতাদের কোন বিরোধ হত না। ইন্দ্রের একটা ভুলের জন্যেই এঁদের গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়।

কী ভুল ?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাতে বললুম : দৈত্যকুলের হিরণ্যাক্ষ বড় হয়ে একদিন মল্ল যুদ্ধ করতে বেরিয়েছিল। তাই দেখে ইন্দ্র ভেবেছিলেন যে সে বোধহয় স্বর্গ রাজ্য জয় করতে চায়। তাই বিষ্ণুকে দিয়ে তাকে বধ করিয়েছিলেন। এর থেকেই বিবাদের আরম্ভ। হিরণ্যকশিপু এর প্রতিশোধ নিলেন ইন্দ্রকে জয় করে। তারপর এই বিরোধ চলল প্রায় একশো বছর ধরে। বিষ্ণু প্রহ্লাদকে হাত করে হিরণ্যকশিপুকে বধ করলেন। এঁদের ভাগনে বৃত্র জয় করেলন ইন্দ্রকে। তাঁকে নির্জনে একা পেয়ে হত্যা করা হল। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন যখন দান করছেন, তখন তাঁর মাথা চেয়ে নিলেন ইন্দ্র। বিরোচনের পুত্র বলিকে ছলনা করে নির্বাসনে পাঠালেন বিষ্ণু। এ সবই তো আমাদের জানা গল্প। শুধু একটি কথা জানতে বাকি আছে।

কী কথা ?

বিষ্ণু বলিকে পাতালে পাঠিয়েছিলেন। সমুদ্রের তীর বা দ্বীপকে তখন পাতাল বলত। সপ্ত পাতাল ছিল। তা স্বর্গের চেয়েও রমণীয় স্থান। তাই সমুদ্র তখন কোথায় ছিল তা আমাদের জানতে হবে। আজ যেখানে হিমালয় সেখানে যদি না হয়, তবে আজ যেখানে সমুদ্র সেখানেও বোধহয় ছিল না। অনেকে মনে করেন যে বিন্ধ্যপর্বতের নিচেই ছিল সমুদ্র। তবে কেরালার মানুষ দাবী করেন যে বলি ছিলেন

তাঁদের দেশের রাজা।

স্বাতি বলল : না, হিমালয় ছেড়ে আমরা এখন সমুদ্রে যেতে চাই মা। তুমি হিমালয়ের কথাই বল।

বললুম : বলেছি তো, বেদে হিমালয়ের কথা পাই নি। পুরাণে গন্ধমাদন পর্বত পেয়েছি, কিন্তু তার সঠিক অবস্থান জানি নে। মনে হয়েছে যে কারাকোরম পর্বতটাকেই বোধহয় গন্ধমাদন বলত। বদরিকাশ্রমের নাম পেয়েছি। বদ্রীনাথ পাহাড়ে আছে গন্ধর্বদের অলকাপুরী। অপ্সরারা সেখান থেকে কৈলাসে যাতায়াত করত। কিন্নরদের দেশের কথাও শুনেছি।

সে আবার কোথায় ?

হিমাচল প্রদেশের একটি জেলা। কল্পা তার প্রধান শহব।

স্বাতির চোখে কৌতূহল দেখে বললুম : আমরা তো সেখানে যাই নি, তবে শুনেছি সেখানকার কথা। সিমলা থেকে হিন্দুস্তান-টিবেট রোড ধরে প্রায় সীমান্ত পর্যন্ত যেতে হয়। এই পথের ওপবেই কল্পা শহর সিমলা থেকে প্রায় শ দেড়েক মাইল দূরে। শতদ্রু নদীর ধারে এই কিন্নর দেশে এখনও বিচিত্র মানুষেব বাস।

স্বাতি একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বলল : হিমালয়কে আজও আমরা আবিষ্কার করতে পারি নি। অথচ হিমালয় আমাদের আকর্ষণ করেছে যুগ যুগ ধবে।

বললুম : সে উত্তর ভারতের হিমালয়, নেপাল, সিকিম বা ভুটানের হিমালয় নয়। নেপাল ও সিকিম তাব দ্বার খুলে দিয়েছে অনেক দিন আগে, ভুটান সম্প্রতি খুলেছে। তাই ভুটানকে বলে বিশ্বের শেষ শ্যাংগ্রিলা।

৪

স্বাতি বলল · শুনলাম, ভুটানে আজকাল দলে দলে বিদেশীরা যাচ্ছে !

বললুম · আমরাও যাব ।

স্বাতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল : কাল তোমাকে যে ম্যাপখানা দিয়েছিলাম তা তোমার দেখা হয়ে গেছে ? আজ অন্য কিছু দেব ?

বুঝতে পারলুম যে এখন তাকে সংসারের কাজে যেতে হবে । তাই বললুম : ম্যাপে দেখবাব জিনিস এত আছে যে দেখে শেষ করা যায় না । হিমালয় পাহাড়টাকেই আজ ভাল করে দেখবার ইচ্ছে ।

মানচিত্র নিয়ে স্বাতি ফিরে এলে বললুম : এক সময়ে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আসবার একটা সোজা পথ ছিল । দেবতাবা মর্ত্যে আসতেন এবং দৈত্য ও দানবরাও কথায় কথায় স্বর্গে অভিযান চালাতেন । সেই পথটা এখন আব খুঁজে পাওয়া যায় না ।

স্বাতি মানচিত্রটা আমার হাতে দিয়ে বলল · কী হল সেই পথের ?

বললুম পুবাণে অবশ্য আছে যে ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ কবে হিমালযের সেই পথ বন্ধ কবে দিযেছিলেন ।

কেন ?

অসুররা বার বার স্বর্গ আক্রমণ করতে আসতেন বলে তিনি এই কাজ করেছিলেন ।

কিন্তু একশো বছব ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ করে এঁরা তো প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলেন !

তা ঠিক । তখন আবার সূর্য ও চন্দ্র বংশেব বাজারা প্রবল হয়ে উঠছিলেন । বৃত্রবধের পর ইন্দ্র যখন আত্মরক্ষাব জন্যে পালিযে গিয়েছিলেন, তখন তো পুরূরবার নাতি নহুষ ইন্দ্রেব সিংহাসনে বসেছিলেন । ইন্দ্র পদ রক্ষার জন্যে তখন কথায় কথায় এই বাজাদেব সাহায্য নিতে হত অপমানকব শর্তে । এই সবের জন্যেই বোধহয় হিমালয়ের সোজা পথটি বন্ধ করে দিতে হযেছিল এবং অত্যন্ত দুর্গম পথে বহু কষ্ট স্বীকার কবে মানুষকে স্বর্গে যেতে হত । মহাভারতেও এই পথের কথা আছে ।

আব একদিন শুনব ।

বলে স্বাতি নিজের কাজে চলে গেল । কিন্তু পরক্ষণেই ফিরে এসে বলল : পরে হয়তো এই প্রসঙ্গ মনে থাকবে না, তুমি সংক্ষেপে বল ।

বললুম . মহাভারতের লেখক এই পথের হদিস জানতেন না বলে আমাদের ফাঁকি দিয়েছেন ।

কী বকম ?

মহাপ্রস্থানিক পর্বে আছে যে অর্জুনেব মুখে যদু বংশ ধ্বংস হবার কথা জেনে পাণ্ডবরা মহা প্রস্থানে যাত্রা স্থির করলেন । যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা করেছিলেন এবং অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসিয়ে সুভদ্রার ওপরে এঁদের ভার দিলেন । নাগকন্যা উলূপী গঙ্গায় প্রবেশ করলেন, মণিপুরে

ফিরে গেলেন চিত্রাঙ্গদা এবং অন্যান্য পাণ্ডব পত্নীরা সুভদ্রার সঙ্গে রইলেন। শুধু দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে বল্কল পরে যাত্রা করলেন।

তারপর ?

তারপর আমাদের ভোলাবার জন্যে মহাভারতের লেখক লিখলেন যে তাঁরা পূর্ব দিকে বহু দেশ অতিক্রম করে লৌহিত্য সাগরের তীরে পৌঁছলেন। তারপর পৃথিবী প্রদক্ষিণের ইচ্ছায় প্রথমে দক্ষিণ দিকে, পরে লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়ে পশ্চিম দিকে এলেন এবং দ্বারকাপুরী দেখে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। হিমালয় পার হয়ে তাঁরা বালুকার্ণব ও মেরু পর্বত দর্শন করে চলতে লাগলেন।

স্বাতি বলে উঠল : কোন্ পথে হিমালয় পার হলেন, তা তো বললেন না ?

ঠিক ধরেছ ! এই খানেই ফাঁকি দিয়েছেন মহাভারতের লেখক। তারপর একে একে দ্রৌপদী ও চার পাণ্ডব ভূপতিত হবার পর ভূমি ও আকাশ নিনাদিত করে ইন্দ্রের রথ অবতীর্ণ হল। তাঁরা রথে চড়ে স্বর্গে গেলেন।

স্বাতি বলল : বুঝেছি, সত্যিই আমাদের খুব ফাঁকি দিয়েছেন তিনি।

স্বর্গের পথটা জানেন না বলেই ফাঁকি দিয়েছেন।

কিন্তু এখন আমরা এ কাজ করতে পারি না। আমরা জানি যে হিমালয়ের উত্তরে ইলাবৃতবর্ষের মেরু পর্বতকেই সেকালে স্বর্গ বলত। কাশ্মীরে হিমালয়ের উত্তরে কারাকোরম পর্বত তার সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত। হিন্দুকুশ পর্বত এসেছে পশ্চিম থেকে উত্তরে। এই দুই পর্বত শ্রেণীর মাঝখানে গিলগিট অঞ্চল দিয়েই কোন পথ সেকালে ছিল বলে আমার ধারণা। পথ বা সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। দক্ষিণ থেকে যুদ্ধের অভিযান বন্ধ করবার জন্যেই কোন ইন্দ্র এই পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বজ্র তো একটা মারাত্মক অস্ত্র ছিল। কোন প্রাগৈতিহাসিক বিরাট আকারের প্রাণীর অস্থির মধ্যে বারুদ ও পাথর প্রভৃতি ঢুকিয়ে আগুন ধরাতে হত। কামানের গোলা বা বন্দুকের গুলির মতো সেই বারুদ বেরিয়ে গিয়ে শত্রু নিপাত করত। এই গিরিপথ বন্ধ করবার জন্যে হয়তো ডিনামাইট জাতীয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

স্বাতি বলল : পথ বন্ধ করা খুব কঠিন কাজ নয় ! কিন্তু এতো তোমার অনুমানের কথা। ঐতিহাসিকরা কী বলেন ?

বললুম : এ আমার অনুমানের কথা নয়, পুরাণ রচয়িতারা এই কথা বলেছেন। আর ঐতিহাসিকদের কথাও জানি। বিদেশী ঐতিহাসিকদের তৈরি একটি ম্যাপ দেখেছিলুম। তাতে খ্রীস্টের জন্মের ৬০০০ থেকে ২৫০০ বছর আগের অবস্থা দেখানো হয়েছে। বুঝতেই পারছ যে এই সময়ে পৃথিবীতে তিনটি অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল বলে মেনে নেওয়া হয়েছে—মিশরে নীল নদের অববাহিকায়, মেম্ফিস ছিল তার কেন্দ্র ; ইউফ্রেতেস ও তাইগ্রিস নদীদ্বয়ের অববাহিকায়, তার কেন্দ্র ছিল ব্যাবিলন ; এবং ভারতে সিন্ধু ও পঞ্চ নদের উপত্যকায়, মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার মাটির নিচে তার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

স্বাতি বলল : এর সঙ্গে স্বর্গের পথের কী সম্পর্ক আছে ?

বললুম : আছে বলেই আমার মনে হয়। ঐতিহাসিকরা বোধহয় প্রমাণ পেয়েছেন যে পুরাকালে মধ্য এশিয়ায গাঢ় সবুজ রঙের এক রকম মূল্যবান পাথর পাওয়া যেত, তার ব্যবহার ছিল অলঙ্কারে। এই পাথর নিয়ে বণিকরা সিংকিয়াং প্রদেশের কাশগড় থেকে আফগানিস্তানের বাল্‌খ্ হয়ে সিন্ধুর তীরে মহেঞ্জোদারোয় আসত। সেখান থেকে সিন্ধুর মোহনার কাছাকাছি পওল নামের কোন অবলুপ্ত বন্দর থেকে মরুপথে

পার্সিপোলিসের ওপর দিয়ে ইউফ্রেতিসের অববাহিকায় উর নামের একটা শহরে আসত এবং সেখান থেকে যেত নীল নদের তীরে মেম্ফিস নগরে।

স্বাতি এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, এইবারে বসে বলল : মন দিয়ে শুনতে হবে দেখছি। তা না হলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না।

বললুম : শুধু শোনা নয়, ভেবে দেখতেও হবে। তার কারণ আমাদের পুরাণে দেবাসুরের যুদ্ধের যে কাহিনী আছে, তা এই সব সভ্যতা ধ্বংস হবার প্রায় হাজার বছর পরের ঘটনা। আমি হিসেব করে দেখেছি যেএই যুদ্ধের সূত্রপাত হয় খ্রীস্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে এবং স্থায়ী হয় শ খানেক বছর। এই যুদ্ধের শেষের দিকেই সেকালের একটা গুরুত্বপূর্ণ পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুরাণ রচয়িতারা একেই বলেছেন যে ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আসবার পথ বন্ধ করে দেন, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে স্বর্গে যাবার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

স্বাতি বলল : এইবারে তোমার নিজের মত বল।

বললুম : মত বোলো না, ধারণা বল। কেন এই ধারণা হল, তাও নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে মিলিয়ে নাও।

বল :

মেরু পর্বত পামির অঞ্চলে বর্তমান কাশগড়ের কাছাকাছি। গিলগিট হয়ে সিন্ধুর অববাহিকায় আসবার পথ বন্ধ হয়ে গেলে নতুন পথ তৈরি হয় আফগানিস্তানের বাল্‌খ্‌ হয়ে খাইবার পাসের ভেতর দিয়ে। সমুদ্রে তখন জাহাজের ব্যবহার ছিল না বলেই মরুভূমির পথে মিশরে যেতে হত। বিদেশী ঐতিহাসিকেরা আমাদের সংস্কৃতে লেখা পুরাণ পড়েন নি বলেই পুরাকালের পথের হদিস পান নি, অর্থাৎ মধ্য এশিয়া থেকে গিলগিট হয়ে ভারতে আসবার যে সোজা পথ ছিল তার কথা জানতেন না।

গিলগিট হয়েই যে পথ ছিল, তার কী প্রমাণ আছে ?

প্রমাণ নেই। কিন্তু এই অঞ্চল দিয়েই একটা পথ যে ছিল, তা মেনে নেবার মতো যুক্তি কি নেই ?

স্বাতি হেসে বলল : অস্বীকার করতেও তো যুক্তি লাগে, তা আমার নেই।

বললুম : এখন কাশ্মীরের জোজি লা হয়ে লাদাখে যাওয়া যায়। লা মানে গিরিপথ। এই পথে স্বর্গে যাতায়াতের কোন বর্ণনা পুরাণে নেই। হিমালয়ে অনেক লা বা গিরিপথ আছে তিব্বতে যাবার জন্যে। নেপালের পশ্চিম সীমান্তে লিপুলেক পেরিয়ে মানস সরোবরে যাবার পথ এখনও আছে। ব্রহ্ম হত্যার পর ইন্দ্র স্বর্গ থেকে পালিয়ে এই মানস সরোবরে আত্মগোপন করেছিলেন। তার মানে স্বর্গ থেকেও মানস সরোবরে আসার পথ ছিল।

কিন্তু এ পথ নিশ্চয়ই সুগম ছিল না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : কেন বলতো ?

স্বাতি বলল : তা হলে ইন্দ্রের সঙ্গে শিবেরও সংঘর্ষ হত। তিনি তো মানস সরোবরের কাছে কৈলাস বাস করতেন।

হেসে বললুম : তোমার অনুমান হয়তো মিথ্যে নয়। কিন্তু পুরাণে আমরা শিবকে সব সময়েই নিরপেক্ষ দেখি। তিনি দেবতা বা দৈত্য কোন পক্ষই সাধারণত নিতেন না, দরকার হলে অপরাধ বিচার করে দেখতেন।

কী রকম ?

দৈত্য গুরু শুক্রাচার্যকে তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু বিষ্ণু যেমন কথায় কথায়

ইন্দ্রকে সাহায্য করতে আসতেন, শিব কিন্তু দৈতদের পক্ষ নিয়ে কখনও যুদ্ধ করেন নি। তবে অত্যাচারী অসুরকে নিজে বধ করেছেন।

স্বাতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল : আজ ছুটি দাও। কাজ শেষ করে আবার আসব। কিন্তু মনে রেখো যে ভুটানের কথায় এ সব কথা অবান্তর হবে। ধান ভানতে শিবের গীত যেন না হয়।

বললুম : হিমালয়ের প্রসঙ্গেই যে এ সব কথা এসে পড়ল!

হিমালয় এমন বিরাট যে তার কথা বলে শেষ করতে পারবে না।

বলে স্বাতি ভেতরে চলে গেল।

স্বাতি চলে যাবার পরেও আমি হিমালয়ের কথা ভুলতে পারলুম না। যত দূর মনে পড়ে শ্রীমদভাগবতে আমি হিমালয়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের কথা পড়েছিলুম। এই পুরাণ রচয়িতা লিখেছিলেন যে হিমালয় দশ হাজার যোজন দীর্ঘ এবং এর প্রস্থ দু হাজার যোজন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে যোজনের মাপ আছে। আট হাজার ধনুতে এক যোজন হয় এবং একুশ হাতে এক ধনু। এ কালের হিসেবে এক যোজনের পরিমাণ প্রায় আট চল্লিশ মাইল। কাজেই পুরাণ রচয়িতারা হিমালয়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ভাবতেন যথাক্রমে প্রায় চারশো আশি ও ছিয়ানব্বুই মাইল। এ কালের হিসেবের সঙ্গে এই হিসেব মেলে না। এখন বলা হয় যে হিমালয়ের দৈর্ঘ্য পনর শো মাইল এবং এর প্রস্থ পঞ্চাশ থেকে একশো মাইল, বেশির ভাগ স্থানেই তা বোধহয় পঞ্চাশ মাইল। এই গড়মিলের একটা কারণ থাকতে পারে। হিমালয় পাহাড়কে তাঁরা কত দূর বিস্তৃত ভাবতেন তা জানা নেই। গাড়োয়াল অঞ্চল তাঁদের অতি পরিচিত ছিল এবং অনেকগুলি তীর্থের কথা তাঁরা লিখেছেন। পশ্চিমে কাশ্মীর রাজ্যেব অমরনাথ থেকে পূর্বে নেপালের পশুপতিনাথ পর্যন্ত তাঁদের যাতায়াত ছিল। এই অংশকেই তাঁরা বোধহয় হিমালয় ভাবতেন। অর্থাৎ সিকিম বা ভুটান তাঁদের পরিচিত ছিল বলে মনে হয় না। হিমালয়ের শেষ প্রান্তে অরুণাচলেরও পূর্বে যে কুণ্ডে স্নান করে পরশুরাম তাঁর মাতৃ হত্যার পাপমুক্ত হয়েছিলেন, তা কত দিনের প্রাচীন জানা নেই। আব এই তীর্থটি কোন্ পর্বতে অবস্থিত তাও বোধহয় অনেকের জানা ছিল না। কাজেই সেকালের হিমালয় আজকের হিমালয়ের মতো এমন বিস্তীর্ণ ভাবা হত না।

পর্যটকেরাও এত কাল হিমালয়ের খণ্ডিত রূপ দেখে আসছিলেন। তীর্থের আকর্ষণেই মানুষ সবার আগে দুর্গম পথ অতিক্রম করে, তার পিছনে আসে সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ। সাধারণ মানুষ আসতে শুরু করে সবার পরে। এইভাবেই হিমালয়ের পশ্চিমাংশ সব রকম মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। তারা শুধু তীর্থ নয়, হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে অনেক সুন্দর স্থান আবিষ্কার করেছে। হিমালয় পেরিয়ে মানস সরোবরে স্নান করে কৈলাস পরিক্রমা করতেও গেছেন অনেকে। কিন্তু হিমালয়ের কোলে অবস্থিত তিনটি রাজ্য—নেপাল সিকিম ও ভুটান পৃথিবীর পর্যটকদের তেমন আকর্ষণ করতে পারে নি। ভারত থেকে অনেকে গেছেন পশুপতিনাথ দর্শনে, মুক্তিনাথ দর্শনেও গেছেন অনেকে। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এমন নয় যে তা নিয়ে কেউ গর্ব করতে পারে। এই তিনটি রাজ্য এক সময়ে হিমালয়ের পঁচাত্তর হাজার বর্গ মাইল জুড়ে ছিল। কিন্তু ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চল দেখতে কয়েক শো বিদেশী পর্যটক গেছেন কিনা সন্দেহ। নেপাল, সিকিম বা ভুটান দেখে এসেছি, এমন কথা কজন বলতে পারতেন! যাঁরা গেছেন, তাঁদের বেশির ভাগই দায়ে পড়ে গেছেন। প্রাণের টানে গেছেন কিছু হিন্দু ও বৌদ্ধ তীর্থ যাত্রী। তাঁরা দেশ দেখতে যান নি।

গেছেন তীর্থ দর্শনে।

পরিবর্তন এল ১৯৫১ সাল থেকে। চীনের সঙ্গে তিব্বতের সংঘর্ষ বাধল, তিব্বতের দলাই লামা এসে ভারতে আশ্রয় নিলেন। হিমালয়ের কিছু অংশ চীন নিজের বলে দাবী করে বসল ভারত নেপাল ও ভুটানের কাছে। বিবাদ শুরু হল। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধও হল, শেষ হয়ে গেল ভারত ও চীনের ভাই-ভাই সম্পর্ক। আর এই সময় থেকেই নেপাল সিকিম ও ভুটান সচেতন হয়ে উঠল নিজেদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে। বুঝতে পারল যে পৃথিবীতে যে পরিবর্তন আসছে বা এসে গেছে, তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। মধ্য যুগের সামন্ত তন্ত্রে প্রজারা আর সন্তুষ্ট থাকবে না, তারাও চাইবে মুক্তির আস্বাদ। চারি দিকের পৃথিবী তাদেরও নিকটে এসে গেছে, তারাও আর অন্ধকারে বাস করতে চায় না।

ভারতের সীমান্তে রক্সৌল থেকে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত রাজপথ তৈরি করে দিল ভারত। এই পথ বিহারের প্রধান শহর পাটনার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু নেপাল সরকার ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারল না, চীনের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখল। চীনও কাঠমাণ্ডু থেকে তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত একটি পথ নিয়ে গেল। কিন্তু ভুটানের রাজধানীর সঙ্গে সড়ক পথ লাসাকে যুক্ত করা এখনও সম্ভব হয় নি। লাসা থেকে একটা পথ আছে অরুণাচলের তাওয়াঙের উপর দিয়ে পূর্ব ভুটানের তাশিগং পর্যন্ত। ভুটানের দক্ষিণ সীমান্তে ফুনছোলিঙ থেকে বর্তমান রাজধানী থিম্ফু পর্যন্ত পথ তৈরি হয়েছে, পারো ও পুনাখাও এই পথের সঙ্গে যুক্ত। আশা করা যাচ্ছে যে থিম্ফুও তাশিগঙের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পথ তৈরির কাজ চলছিল বলে শুনেছিলুম।

হাতের মানচিত্রে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলুম। তা হল সিকিম ও ভুটানের মাঝখানে চুম্বি নামের উপত্যকাটি তিব্বতের অধীনে ছিল। এই উপত্যকার মধ্য দিয়েও একটি রাজপথ লাসা থেকে পশ্চিমবঙ্গের শহর কালিম্পঙ পর্যন্ত এসেছে। এই উপত্যকাটি এখন চীনের অধিকৃত এবং সিকিমও কিছু দিন আগে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সিকিম এখন পশ্চিমবঙ্গের মতো ভারতের অঙ্গ। সিকিমের রাজা আর সেখানকার জনগণের ভাগ্যবিধাতা নন।

সিকিমে প্রবেশের পথটি এক সময়ে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যের পথ ছিল। এটি বহুকালের পুরাতন পথ। চীন থেকে ভুটানে প্রবেশের এই রকম পথ হয়তো আরও ছিল। না থাকাও সম্ভব। কাজেই ভারতের সঙ্গে ভুটানের বন্ধুতার সম্পর্ক বজায় থাকলে চীনকে ভয় পাবার কোন প্রয়োজন নেই। অভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্যে ভুটানকে ভারতের সাহায্য নিতে হচ্ছে। নেপালের মতো তাকে দুকূল রাখতে হচ্ছে না।

মানচিত্রখানা কখন আমার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল তা খেয়াল করি নি। স্বাতি এসে সেখানা আমার হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল : কী ভাবছিলে ?

বললুম : ভুটানেরই কথা।

তা জানি। কিন্তু ভুটানের সম্বন্ধে কী ভাবছ, তাই জানতে চাইছি আমি।

ভুটানের সমস্যা নেপালের চেয়ে কম।

কেন ?

বললুম : নেপাল যেমন ভারত ও চীন দু দেশকেই মানিয়ে চলছে, ভুটানের সে প্রয়োজন নেই। চীন সরাসরি ভুটানে প্রবেশ করতে পারবে বলে মনে হয় না। তাই ভারতের সঙ্গে বন্ধুতা বজায় রাখলেই তার চলবে।

স্বাতি বলল : ভারতের সঙ্গে তার বৈদেশিক সম্পর্কটাও একটু অন্য রকম বলে শুনেছি। ব্যাপারটা কী রকম বলতে পার ?

বললুম : আমি রাজনীতির ছাত্র নই তো, তাই সব কথা সঠিক বুঝি না। তার ওপর ইংরেজী শব্দগুলোর অর্থ আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়।

তবু বল।

নেপালকে বলে কিংডম, মানে রাজার রাজ্য। ইউনাইটেড নেশন্‌সে যোগ দিয়েছে ১৯৫৫ সালে।

ভুটানেও তো রাজা আছেন!

রাজা আছেন বলে তাকেও কিংডম বলে, কিন্তু ভারতের প্রোটেক্টোরেট। এর মানে বোধহয় প্রতিরক্ষার দায়ীত্ব ভারতের।

আর সিকিমের সঙ্গে সম্বন্ধ কী রকম ছিল ?

সেও তো একটি কিংডম ছিল। কিন্তু ভারত শুধু প্রতিরক্ষায় নয়, বিদেশ নীতিও নির্ধারণ করত। দেশের উন্নতির জন্যেই নাকি জনগণ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছিল। সিকিম এখন পুরোপুরি ভাবে ভারতের অঙ্গ। আগেও সেখানে যেতে কোন অনুমতি পত্র লাগত না, এখন তো লাগবার কথাই নয়।

স্বাতি বলল : মনে আছে। সিকিমের সীমান্তে সেই নদীর পুলের ওপারে আমাদের ল্যাণ্ডরোভার থামিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কে আমরা। ভারতীয় টুরিস্ট শুনেই ছেড়ে দিয়েছিল।

সেদিন সিকিমের মহারাজা আসছিলেন বিদেশ থেকে। মনে হয়, এই জন্যেই বোধহয় সিকিমের পুলিশ দাঁড়িয়েছিল পুলের কাছে।

তা হতে পারে।

তার পরেই স্বাতি বলল : আর একটা কথা মনে পড়ছে।

বললুম : বল।

স্বাতি বলল : শুনেছি যে এই অঞ্চলে বেড়াতে এসে পণ্ডিত নেহেরু নাকি ভুটানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সে বহু দিন আগের কথা।

বললুম : তা তো হবেই। মনে হয়, দেশ স্বাধীন হবার পরেই তাঁরা এই দিকে এসেছিলেন।

কিন্তু কোন্ পথে এসেছিলেন তা বলতে পার ?

কেন জানি না, আমার একটা ধারণা আছে যে তাঁরা সিকিমের দিক থেকেই ঘোড়ায় চেপে ভুটানে গিয়েছিলেন। ফুন্‌ছোলিঙের পথ তখনও বোধহয় তৈরি হয় নি।

ভারি কষ্ট করে গিয়েছিলেন, তাই না ?

কিছু দিন আগেও তো আমাদের দেশে তীর্থ ভ্রমণ এই রকমের কষ্টের ছিল। পুরনো আমলের ভ্রমণ কাহিনী পড়লেই সে সব জানা যায়।

স্বাতি বলল : এঁদের ভুটান ভ্রমণের কথা বোধহয় কেউ লেখেন নি।

কিন্তু তিব্বত ভ্রমণের অনেক বই আছে। হিমালয়ে ভ্রমণের ওপরেও বই-এর কোন অভাব নেই। দেশী ও বিদেশী বহু লেখক হিমালয় ও তিব্বত নিয়ে অজস্র বই লিখে গেছেন। কিন্তু নেপাল সিকিম ও ভুটান আজও আমাদের কাছে তার যোগ্য সমাদর পায় নি।

স্বাতি বলল : তোমার কাছে পাঠকের আশা কতখানি জানি না, আমার আশা

অনেক।

বললুম : আশার সীমা নেই, আছে ক্ষমতার। সীমিত শক্তি নিয়ে যতটুকু পেরেছি, তার বেশি আর কিছু আশা কোরো না।

৫

সেদিন আকাশে মেঘ জমেছিল। ঘন ঘোর মেঘে অন্ধকার আকাশ যেন ঝুলে পড়েছিল অনেকটা। থমথম করছিল কলকাতার আবহাওয়া। কখন বৃষ্টি নামে এই ভয়ে অনেকেই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলেন। আমাকেও অনেকে পরামর্শ দিলেন দেরি না করার। আমি লাইব্রেরি থেকে একখানা বিশ্বকোষ সংগ্রহ করে পড়ব ভাবছিলুম। আকাশের দিকে চেয়ে সে সাহস আর পেলুম না। বইখানা ফিরিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লুম।

ভাগ্য নিতান্তই সুপ্রসন্ন ছিল, তাই বৃষ্টি ঝেঁপে এল বাসে উঠবার পর এবং নামবার আগেই থেমে গেল। কিন্তু দোতলায় উঠে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। স্বাতি ফেরে নি। সে হয়তো বৃষ্টিতেই আটকা পড়েছে। অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করতে পারে ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমার কাছে বাড়ির ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। তাই দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে এলুম। স্বাতি এখুনি এসে পড়বে ভেবে দরজায় খিল দিলুম না।

একা চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছা হল না। ভাবলুম, একখানা বর্ষার গান শুনি। গান নয়, সেতারে বর্ষার রাগিনী। স্বাতির কয়েকটি সেতারের বাজনা আমি টেপে ধরে রেখেছি। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান—মল্লার, মেঘ মল্লার, গৌড় মল্লার ও নট মল্লার। সেই টেপখানি বার করে চালিয়ে দিলুম।

প্রথম গানটি বর্ষার গান নয়। কিন্তু তেওড়া তালে মল্লার। বাজনা শুরু হতেই গানের কথাগুলো মনে পড়ে গেল।—

আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।

টেপ রেকর্ডার অ্যাম্‌প্লিফায়ারের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে গুরু গম্ভীর সুরে বাজনা আরম্ভ হল। আমি বাইরের বারান্দায় এসে আমার নির্দিষ্ট স্থানে বসলুম।

হঠাৎ দেখতে পেলুম যে একটা ট্যাক্সি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল এবং স্বাতি নামল আর একজনের সঙ্গে। প্রায় তার সমবয়সী বলে আমি তাকে সহকর্মী বন্ধু বলেই ধরে নিলুম। তাই তাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেলুম না।

বসবার ঘরে তাদের পায়ের শব্দ পেয়ে উঠে পড়তে হল। এগিয়ে যেতেই স্বাতি বলল : আমার সহকর্মী বন্ধু সুতপা।

আর আমি গোপাল।

বলে তাকে নমস্কার করলুম।

সুতপা সহাস্যে আমার নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে বলল : তা একা বসে এ রকম গান শুনছেন কেন ? জেনে শুনে তো কেউ বিষ পান করে না, না জেনেই করে।

বললুম : না জেনে বিষপান করাটা খুবই আকস্মিক। মানুষ বিষপান করে আত্ম হত্যার চেষ্টায়। কাজেই আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান, এ কথাটাই ঠিক।

স্বাতি বলল : আসলে কী জানো ? আকাশে বর্ষার মেঘ দেখে ওর মল্লার শোনার শখ হয়েছিল। হাতের কাছে এই গানটিই পেয়ে গেছে।

ততক্ষণে দ্বিতীয় গান আরম্ভ হয়েছে— আবার এসেছে আষাঢ়

স্বাতি বলল : এটি দাদরা তালে মেঘ মল্লার।

সুতপার দিকে চেয়ে আমি বললুম : বসে কথা বলা যাক।

সুতপা বলল : সেই ভাল।

বলে বসে পড়ল। কিন্তু স্বাতি বলল : তোমরা একটু গল্প কর, আমি আসছি। বেশি দেরি কোরো না যেন।

বলে সুতপা আমাকে জিজ্ঞাসা করল : এই বাজনা বিলায়েতের, না রবিশঙ্করের ?

স্বাতি বেরিয়ে যাচ্ছিল, থমকে পিছিয়ে এসে বলে গেল : আল্লারাখার।

আমি হাসলুম দেখে সুতপা বলল : আপনি হাসলেন যে ?

বললুম : আল্লারাখা এঁদের সঙ্গে তবলা বাজান।

তবে ?

শিল্পী বোধহয় তেমন কেউ নয়, তাই নাম বলতে চায় না। আর কী দরকার শিল্পীর নাম জেনে ! যদি ভাল লাগে, তাতেই আনন্দ বেশি।

সুতপা আমার কথা মেনে নিয়ে বলল : তা ঠিক। শিল্পীর নামের চেয়ে শিল্পই বড়। কতকটা অকারণেই আমরা নামের পেছনে ছুটি। শিল্পকে যেদিন আমরা তার বিজ্ঞাপনের খোলস ছাড়িয়ে তার নগ্ন রূপে দেখতে শিখব, সেদিনই তার সত্য রূপটি আমাদের কাছে ধরা পড়বে।

বললুম : তার আবেদনও। সেদিন 'জেনে শুনে বিষ করেছি পান' শুনছি, না 'কোথা যে উধাও হল' শুনছি, সে প্রশ্ন জাগবে না। মল্লার শুনছি, না মিশ্র মল্লার, মন তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না, মন উধাও হয়ে যাবে বর্ষার মেঘের মতো।

সুতপা সচকিত হয়ে বলল : আপনি কি কবিতাও লেখেন নাকি ?

ভয় নেই, অনধিকার চর্চা আমি করি না।

সুতপার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই আর একখানা গান শুরু হয়ে গেল।— আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে।

সুতপা আমার দিকে চেয়ে বলল : এও কি মল্লার নাকি ?

হেসে বললুম : গৌড় মল্লার, নট মল্লার, না মিঞাকি মল্লার, তা স্বাতি আপনাকে বলতে পারবে।

গান-বাজনা জানে বুঝি ?

স্বাতি কাছেই ছিল। পর্দার আড়াল থেকে বলল : গানের খাতা আছে, তাতে সব টুকে রাখি। তা গানের চর্চা ছেড়ে একটু ইতিহাসের আলোচনা কর না, আমি এখুনি আসছি।

সুতপা বলল : তুমি এলেই আলোচনা শুরু করব।

আমি বললুম : আপনার বিষয় বুঝি ইতিহাস ?

একটা বিষয়ে পড়াতে হয়, সেটাই ইতিহাস। তা নাহলে বলতাম গল্প উপন্যাস। অর্থাৎ গল্প-উপন্যাস পড়তেই আমার ভাল লাগে।

বলে সুতপা হাসতে লাগল।

আমিও তার হাসিতে যোগ দিয়ে বললুম : গল্প-উপন্যাস পড়তে কার না ভাল লাগে ! আর সে যদি ডিটেক্‌টিভ গল্প হয় তো কথাই নেই।

সুতপা বলল : ডিটেকটিভের চেয়ে আমার সোস্যাল গল্পই ভাল লাগে। আমাদের সমাজটা যে দিনে দিনে কত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে, তা পড়ে আমাদের চোখ খুলে যায়। তাই না ?

আমি বলতে পারলুম না যে গল্প-উপন্যাসের সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তাই বললুম : তাই নাকি ?

সুতপা উৎসাহিত হয়ে বলল : অ্যামেরিকান সমাজের কথা পড়েছেন তো ! কী প্রাণবন্ত জীবন তাদের ! সে সব বই ফেলে বাঙলা বই পড়বার ইচ্ছে হত না। এখন দেখছি যে বাঙলাতেও বেশ ভাল লেখা হচ্ছে। বেশ টেনে রাখার মতো গল্প।

ইতিহাসের বই আপনার কেমন লাগে ?

হরিব্‌ল্।

মানে ?

কুইনিনের মতো গিলেছিলাম, এখনও তাই মনে হয়। যতটুকু না পড়লে নয়, ততটুকুই পড়ি। অর্থাৎ চাকরির জন্যেই পড়েছি, চাকরির জন্যেই পড়ি।

তারপরেই প্রশ্ন করল : আপনার কি ইতিহাস ভাল লাগে নাকি ?

বললুম : ভাল করে বললে ভাল লাগবে না কেন ! এই গানের কথাই ধরুন না। গানের তো কিছুই জানি না, অথচ শুনতে বেশ লাগছে। বর্ষার সঙ্গে এই সুর কেমন মানিয়েছে বলুন ! মনটা কি মাঝে মাঝেই ঐ সুরের দিকে চলে যাচ্ছে না !

গানের সঙ্গে আপনি ইতিহাসের তুলনা করছেন !

কেন, মহাভারত কি আমাদের দেশের ইতিহাস নয় ! অথচ ছেলেবেলায় মহাভারত আমরা কত বার পড়েছি বলুন !

সুতপা আশ্চর্য হয়ে বলল : কত বার !

কেন, আপনি কি বার বার পড়েন নি ?

একবারও না।

তবে ছেলেবেলায় আপনি কী বই পড়তেন ?

সুতপা বলল : পড়ার বই-এর কি কোন অভাব আছে ! টিনটিনের অ্যাড্‌ভেঞ্চার, ইনিড ব্লাইটন—

সুতপার মুখের দিকে আমি তাকিয়ে রইলুম। সে বলল : একটু বড় হতেই আলফ্রেড হিচকক।

ঠাকুরমার ঝুলি ?

ও সব পড়েই তো আমাদের ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়। রূপকথার গল্প, ভূতের গল্প, এই সব সেকেলে গল্প পড়ে একালে আর মানুষ হওয়া যায় না।

তারপরেই প্রশ্ন করল . স্বাতি আজকাল ইতিহাস পড়ছে নাকি ?

কেন বলুন তো !

আজ আমার কাছে ইতিহাসের নানা কথা জানতে চাইছিল। বিশেষ করে হিমালয়ের ইতিহাস। ভারি আশ্চর্য লেগেছে আমার।

সুতপাকে ধরে আনার ব্যাপারটা আমি এতক্ষণে বুঝতে পারলুম। হাসি পেল তার ছেলেমানুষি দেখে। ইতিহাসে যার কোন অনুরাগ নেই, তার কাছে কিছু জানার চেষ্টা যে নিষ্ফল হবে তাতে সংশয় নেই। এই সহজ কথাটা বুঝতে পারলে সে নিশ্চয়ই তাকে ধরে আনত না। বললুম : ওর ধারণা হিমালয়ের একটা অতীত ছিল। খুব সমৃদ্ধ অতীত। এ যুগের কোন ঐতিহাসিক নিশ্চয়ই তা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ। আমাকে বলছিল, হিমালয় সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করা দরকার। হয়তো এমন তথ্য বেরিয়ে পড়বে যা দেখে পৃথিবীর লোক চমকে যাবে।

সুতপা বলল : বলেন কি ! কিন্তু ওর সাবজেক্ট তো ইতিহাস নয়, ইতিহাসে রিসার্চ করে ও কী করবে ?

স্বাতি তার চায়ের ট্রলি ঠেলে ঘরে আসছিল। বলল : একজনকে সাহায্য করতে হবে।

কাকে ?

বলে সুতপা স্বাতিব মুখের দিকে তাকাল।

স্বাতি তার ট্রলিটা নিজেব সামনে নিয়ে বসে বলল : আমার ওপরেই সে নির্ভর করে আছে।

বলে চা ঢালতে লাগল। এক পেয়ালা চা সুতপার হাতে দিতেই সে বলল : তা তোমার দায় কী ?

স্বাতি বলল . দায় কেন হবে ! তাকে সাহায্য করেই আমার আনন্দ।

বলে আমাব হাতেও এক পেয়ালা চা দিল। আর খাবারের প্লেট দেখাল সুতপাকে। সুতপা বলল . না ভাই, এখন শুধু চা।

স্বাতি বলল : একটা সন্দেশ নাও।

সুতপা যেন আঁৎকে উঠল, বলল : মিষ্টি ! গুড লর্ড ! গত মাসে আমার এক কেজি ওজন বেড়েছে।

স্বাতি হেসে প্লেটখানা আমার দিকে এগিয়ে দিতেই আমি একটা সন্দেশ তুলে নিলুম। বললুম · বাড়িতে তৈরি সন্দেশ, ছানার মতো উপকারী। আর যেটুকু চিনি আছে, তাতে কাজে এনার্জি বাড়ে। সন্দেশে আপনি এক সঙ্গে প্রোটিন আর গ্লুকোজ পাবেন। খেয়ে নিন একটা।

স্বাতি সেই প্লেটখানা সুতপার সামনেই রেখে দিল। চা খেতে খেতে সুতপা সব কটা সন্দেশই খেয়ে ফেলল।

স্বাতি এক সময়ে উঠে গিয়ে টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে দিয়ে এসেছিল। এইবারে বলল : তুমি তো এনসেন্ট্‌ হিস্ট্রি পড়াও, শুনেছি কিছু রিসার্চও করেছ। কতকগুলো কথা আমার জানতে ইচ্ছে করে।

বলে সুতপার দিকে তাকাতেই সে বলল : কী কথা বল।

ভারতে সিন্ধু নদের অববাহিকায় একটা সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল এবং তা বিস্তৃত হয়েছিল মহেঞ্জোদারো থেকে হরাপ্পা পর্যন্ত। অর্থাৎ বেলুচিস্তান থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত। দক্ষিণেও নামছিল। কী ভাবে এই সভ্যতা নষ্ট হয়, অর্থাৎ মাটির নীচে চাপা পড়ে ?

সুতপা বলল : সে তো প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের ঘটনা। আর্যরা ভারতে এসে এই সভ্যতার ধারকদের পরাজিত করেই এ দেশে বসবাস করতে থাকেন।

আমি বললুম : শুনেছি যে তিনটি যুগ ধরে নাকি এই সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। আদি যুগের ভিৎ এখন জলের নীচে বলে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। মধ্য যুগে যে উন্নতি হয়েছিল, পরের যুগে তার অবনতি দেখা যায়।

সুতপা বলল : এই সভ্যতার সম্বন্ধে ভাল বই আছে, পড়ে দেখতে পারেন।

স্বাতি বলল : আমি শুনেছি যে একটা মহাপ্লাবনে এই অঞ্চলটা ডুবে গিয়েছিল। এই প্লাবনে শুধু এ দেশ নয়, বিদেশও জলমগ্ন হয়েছিল। বাইবেলে নোয়া'জ আর্কের

গল্প আছে, আমাদের পুরাণে আছে মৎস্য অবতারের কথা। এ ঘটনা কি ঐতিহাসিক নয় ?

না ভাই, ইতিহাসে এ রকমের কথা নেই।

স্বাতি বলল : তা নেই, কিন্তু এ রকমের একটা ঘটনা কি ঘটে থাকতে পারে না ?

তাহলে তিনটে স্তর আসবে কোথা থেকে ?

প্রথম স্তর তো পাওয়া যায় নি ! দ্বিতীয় স্তরটাই এই বন্যায় ডুবে গিয়েছিল ; আর মানুষ জন যারা পাহাড়ে পর্বতে আশ্রয় নিয়ে কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করেছিল, তারাই ফিরে এসে নতুন করে ঘব বাড়ি তৈরি করেছিল। সেটাকেই কি এখন তৃতীয় স্তর বলা হচ্ছে না ? আর্যরা এসে কি এদের সভ্যতাই ধ্বংস করে এ দেশে বসবাস করছে না ?

সুতপা বলল : অনুমান দিয়ে তো ইতিহাস রচনা হয না, প্রমাণ চাই। কোন প্রমাণ দিতে পারলে ঐতিহাসিকেরা মেনে নেবে।

আমি বললুম : খুব ঠিক কথা।

কিন্তু স্বাতি বলল : একটা সমুদ্র থেকে যদি হিমালয় পাহাড় উঠতে পারে, তাহলে বন্যার জলে একটা সভ্যতা, মানে একটা অঞ্চল, ডুবে যেতে পাবে না ? পাঁচ কোটি বছর আগের কথা আমবা মেনে নিয়েছি, আর পাঁচ হাজার বছর আগেব কথা মানতে পারছি না ?

সুতপা বলল : আমরা তো ইতিহাস লিখি না, ইতিহাস পড়াই। যা পড়েছি, তাই পড়াই। নতুন কথা বলতে গেলেই বিপদ হবে।

স্বাতি বলল : কারা হিমালয়ের সবচেয়ে পুরনো অধিবাসী ?

সুতপা তৎপর ভাবে উত্তর দিল : তুমি অ্যানথ্রপলজির হেনা হালদারকে এই কথা জিজ্ঞেস কোরো। আদিবাসীদের কথা তাব মুখস্থ আছে।

স্বাতি বলল : এখনকার আদিবাসীদের কথা আমি জানতে চাইছি না। আমি শুনেছি যে এই হিমালয়ে যে সব লোকেব বাস আছে, তাদের মধ্যে কিন্নর আছে। এই কিন্নর জাতের কথা আমরা পুবাণেও পাই। তাদের সঙ্গে গন্ধর্ব অপ্সরা বিদ্যাধর প্রভৃতি আরও অনেক জাতির কথা। প্রাচীন ইতিহাসে এই সব জাতিব অস্তিত্ব কি মেনে নেওয়া হয়েছে ?

মুখ বিকৃত করে সুতপা বলল · অ্যাবসার্ড কথা। তুমি হয়তো কোন দিন জিজ্ঞেস করবে দৈত্য দানব রাক্ষসদের কথাও হিস্ট্রিতে আছে কিনা !

স্বাতি বলল : বুঝেছি। পুরাণকে তুমি ইতিহাস বলে মানো না। তবে যে আজকাল শুনতে পাচ্ছি যে পুরাণে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আছে ?

তা থাকতে পারে। তাই বলে পুরাণ ইতিহাস হতে পারে না। রূপকথায় ইন্দিরা গান্ধীর নাম ঢুকিয়ে দিলে তা রাজনীতির বই হবে না !

আমি বললুম : খুব ঠিক কথা। ঐতিহাসিকেরা যা লিখে রেখে গেছেন, তাই ইতিহাস। তার সঙ্গে নতুন কোন কথা যোগ করা যাবে না।

সুতপা বলল : নিজেদের দেশ ও মানুষ সম্বন্ধে আমাদের একটা নস্টাল্‌জিক দুর্বলতা আছে। থাকলে দোষ নেই। কিন্তু তা ইতিহাসে আরোপ করলেই বিপদ। অনেকেই তা করেছেন এবং এখনও এই প্রবণতা যায় নি। তাই বিদেশী পণ্ডিতরা আমাদের কাণ্ড দেখে হাসেন।

স্বাতি বলল : আমরাও তো বিদেশী পণ্ডিতদের অজ্ঞতা দেখে হাসতে পারি।

কী রকম ?

তাঁরা আমাদের পুরাণ না পড়েই সে সব বাতিল করে দিয়েছেন কেমন করে ? কিছু বাতিল করবার আগে তা পড়ে দেখতে হবে তো ! শুনেছি প্রফেসর উইলসন নামে এক সাহেব পুরাণের আলোচনা করেছেন। তিনিও কি পুরাণগুলো রূপকথা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ?

সুতপা হঠাৎ বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে চমকে উঠল। বলল : এখনও বৃষ্টি পড়ছে নাকি ?

আমি দেখে এসে বললুম : না, বৃষ্টি নয়, অন্ধকার।

ওরে ব্বাবা !

বলে সুতপা উঠে পড়ল।

স্বাতি বলল : চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

যাবার আগে সুতপা আমাকে একটা নমস্কার করে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই স্বাতি ফিরে এল। আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : এত তাড়াতাড়ি ফিরলে ?

স্বাতি বলল : বেশি দূরে যাই নি তো, বড় রাস্তার পথটা দেখিয়ে দিয়েই ফিরে এলাম।

তারপরেই প্রশ্ন করল : সুতপাকে কেমন দেখলে ?

বললুম : ভাল।

তোমার লেখার সঙ্গে যে পরিচয় নেই, তা বোধহয় বুঝতে পেরেছ ?

থাকলে তোমার উদ্দেশ্যটা ধরে ফেলত। তবে বাঙলা গল্প-উপন্যাস পড়ে। ভালও লাগে।

তাই বলল বুঝি ?

আগে শুধু ইংরেজী বই পড়ত।

স্বাতি বলল : এটা ভাল লক্ষণ। এক দিন তোমার লেখাও নজরে আসতে পারে।

তা না এলেও ক্ষতি নেই।

কেন বল তো !

আমার দরকার একজন পাঠকের। তা পেয়ে গেছি। পাঠক বাড়ল কিনা, সে ভাবনা আমার নেই।

স্বাতি বলল : তোমার না থাকলেও আমার আছে।

কেন ?

একজন পাঠকের জন্যে তো লেখার দরকার নেই, মুখেই তাকে বলা যায়। লেখা অনেক পাঠকের জন্যে। নতুন ভাবনার কথা ছড়িয়ে দিতে পারলে এক দিন তুমিও অনেক পাঠক পাবে।

আমি স্বাতির মুখের দিকে তাকালুম নীরবে। তাই দেখে স্বাতি বলল : ভাবছ, তোমার ভুটান পর্ব লেখা শেষ হলেই ছুটি পাবে। ভুলেও তা ভেবো না।

তবে ?

এই বিরাট দেশটা দেখা শেষ হয়ে গেলে এই দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য উদ্ধারের কথা বলব। সুতপার মুখে শুনলে তো, তারা জানে যে পুরাণে ইতিহাসের তথ্য নেই। এই দেশ দেখেই আমার বিশ্বাস হয়েছে যে এক দিন ইতিহাস রচনার প্রয়োজনেই পুরাণ লেখা হয়েছিল। তারপর তার মধ্যে অনেক অবান্তর কথা ঢুকে পড়েছে। এই পুরাণ থেকেই এ দেশের প্রাচীন ইতিহাস রচনা সম্ভব।

তারপরেই হেসে বলল : কিছুক্ষণের জন্যে ছুটি দাও। কী দিয়ে যাব তোমাকে ?
বললুম : কিছু চাই নে। নতুন ভাবনার খোরাক তো দিয়ে গেলে !
বলে বারান্দায় বেরিয়ে এলুম। আর স্বাতি গেল রান্না ঘরে।

৬

ভুটান যাত্রার পূর্বে যথেষ্ট সময় পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও এই দেশ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তবে ভুটান সরকারের কাছে আবেদন করে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়েছিলুম। আমার চিঠির উত্তরে ভুটান ট্রাভেল এজেন্সি একখানি পর্যটন-পুস্তিকা পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন যে দু একজন যাত্রীর জন্য তাঁরা কোন ব্যবস্থা করেন না। তবে জলপাইগুড়ি অঞ্চলের কোন স্টেশন বা এয়ার পোর্টে নেমে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই ভুটানের সীমান্ত শহর ফুন্‌ছোলিঙে পৌঁছনো যায় এবং ভুটান দেখার বিশেষ অনুমতি পত্র সেখান থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব। তাঁরা এই চিঠি লিখেছিলেন ভুটানের রাজধানী থিম্ফু থেকে। তাঁদের ঠিকানা—ম্যানেজার, ভুটান ট্রাভেল এজেন্সি, ডিপার্টমেণ্ট অব টুরিজম, তাশিছো জং, থিম্ফু, ভুটান।

প্রথমেই বানান সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ইংরেজীতে চিঠি লিখতে হলে ঠিকানায় জং শব্দটি লিখতে হবে সঠিক ভাবে। শব্দটির উচ্চারণ ঠিক জং নয়, ইংরেজী Z-ও নয়। ভুটানে জং লেখা হয় Dzong বানান করে। ফুনছোলিঙ শহরটিরও সঠিক উচ্চারণ অনেকেই জানেন না। ইংরেজীতে এর বানান Phuntsholing দেখে অনেকেই ফুন্‌ৎশোলিং বলেন। বাংলা বই-এ ফুণ্টশিলিং বানানও দেখেছি। বানানের ব্যাপারে অ্যামেরিকানরাই প্রগতিতে বিশ্বাসী। তারা যেমন ইংরেজী বানানকে উচ্চারণ অনুযায়ী বদলে নিচ্ছে, তেমনি তাদের বই-এর পাঠক যাতে দেশ বিদেশের কথা সঠিক উচ্চারণ করতে পারে তার জন্যে বানান লেখে উচ্চারণ অনুযায়ী। তাদের ম্যাপ ও বই-এ ফুনছোলিঙের ইংরেজী বানান Phunchholing। এই বানান দেখে কেউই ফুনছোলিংকে ফুন্‌ৎশোলিং বা ফুণ্টশিলিং বলবে না।

ভুটান ট্রাভেল এজেন্সি থেকে যে পর্যটন সংবাদ পেয়েছিলুম, তাতে অনেক প্রয়োজনীয় কথাও আছে। তাঁরা বলেছেন যে অল্প দিন আগেও ভুটান পর্যটকদের কাছে নিষিদ্ধ দেশ ছিল, অর্থাৎ বিদেশীদের এই দেশ ভ্রমণের সুযোগ ছিল না। তাই এই দেশকে কেউ বলেন 'দি লস্ট হোরাইজন', কেউ বা শ্যাংগ্রি-লা বলেন। সত্যিই এই দেশের সব কিছুই এত দিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল।

এখন পর্যটকদের সবই দেখতে দেওয়া হয়। থিম্ফু, পারো, ওয়াংদিফোদ্রং ও পুনাখা উপত্যকার প্রবেশদ্বার ফুনছোলিঙ। ভুটানীরাই ফুনছোলিঙকে বলে ভুটানের গেটওয়ে। সেখানে নাকি সত্যিই একটা বড় গেট আছে। তার একদিকে ভারত, অন্যদিকে ভুটান। ভুটানে প্রবেশের জন্য বিদেশীদের পাসপোর্ট ও ভিসা নিতে হয়। ব্যতিক্রম শুধু ভারতবাসীর জন্য। তাদের কোন পাসপোর্ট বা ভিসা লাগে না। অবাধে ফুনছোলিঙে এসে সরকারী দপ্তরে আবেদন করলেই বিশেষ অনুমতি পত্র পাওয়া যায় থিম্ফু যাবার জন্যে।

দল বেঁধে গেলে ভুটান ট্রাভেল এজেন্সি দেশ দেখার সব ব্যবস্থা করে থাকেন। একটি দলে কমপক্ষে কতজন থাকতে হবে, তার কোন উল্লেখ নেই। তবে পনের জন বা তার বেশি যাত্রী দলে থাকলে টুর লীডারকে অর্ধেক ভাড়া দিতে হয় এবং দলে পঁচিশ জন বা তার বেশি হলে কোন ভাড়াই দিতে হয় না। তার ওপর টুর অর্গানাইজারকে শতকরা দশ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। এই টুবের নাম 'ভুটান ইন কলার' টুর। সময় লাগে পাঁচ রাত ও ছয় দিন। প্রথম দিন বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে ফুনছোলিঙ। দ্বিতীয় দিন ফুনছোলিঙ থেকে থিম্ফু, তৃতীয দিন থিম্ফু, চতুর্থ দিন ওয়াংদিফোদ্রং হয়ে পুনাখা, পঞ্চম দিন থিম্ফু থেকে পারো ঘুবে আসা এবং ষষ্ঠ দিন থিম্ফু থেকে বাগডোগরা। যাত্রী ভাড়া মাথাপিছু এগারোশো দশ টাকা বা একশো তিরিশ ইউ- এস ডলার, ছাত্রদের আটশো আশি টাকা বা একশো তিন ডলার এবং বারো বৎসরের কম বয়সীদের জন্য পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা বা পঁয়ষট্টি ডলার। এদের অবশ্য বাবা-মার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হবে। অন্যরা দুজন থাকবেন এক ঘরে। কেউ একা ঘরে থাকতে চাইলে বেশি ভাড়া দিতে হবে। টুরের খাওয়া খরচ অর্থাৎ ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনারের জন্য পয়সা লাগবে না। তবে পানীয় ও নিজের অন্য খরচ নিজেকেই বহন করতে হবে। ন্যাশনাল মিউজিয়ম ও মন্দির দেখতে দর্শনী দিতে হবে।

এই পর্যটন পুস্তিকায় ভুটান ট্রাভেল এজেন্সি ছাড়া আরও তিনটি ঠিকানা দেওয়া আছে। একটি দিল্লীর ঠিকানা—রয়াল ভুটান মিশন, চন্দ্রগুপ্ত মার্গ, চাণক্যপুরী, নিউদিল্লী-১১০০২১। দ্বিতীয়টি কলকাতার ঠিকানা—স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ভুটান, ৪৮ টিভোলি কোর্ট, ১-এ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ এবং তৃতীয়টি ফুনছোলিঙের ঠিকানা—টুবিস্ট্‌স ট্রান্‌জিট অফিসাব, ফুনছোলিঙ, ভুটান।

আমি একদিন টিভোলি কোর্টের ঠিকানায় যোগাযোগ করেছিলুম। তাঁরা বেশ সদয়ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। কিন্তু ভ্রমণের ব্যাপারে, বিশেষ কোন সাহায্য করতে পারেন নি। বলেছিলেন, এই দপ্তরটি বাণিজ্যিক সংস্থা, পর্যটনের ব্যাপারে সাহায্য করতে অক্ষম। তবে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে নিউজলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে নেমে একবার তাঁদের বাস স্ট্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই ফুনছোলিঙ যাবার ভাল ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এঁদের কাছেই জানতে পেরেছিলুম যে শিলিগুড়ি শহরে ভুটান সরকারের একটি নিজস্ব বাস স্ট্যাণ্ড আছে এবং সেখান থেকে ফুন্‌ছোলিঙের বাস ছাড়ে দার্জিলিং মেল নিউজলপাইগুড়ি পৌঁছবার পরেই। ট্রেন সময়মতো পৌঁছলে একটু তাড়াহুড়ো করে স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরতে পারলেই ভাল। স্টেশনের বাইরে অজস্র অটোরিক্সা ও সাইকেল রিক্সা দাঁড়িয়ে থাকে। শিলিগুড়ির বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছতে অনেক সময় লাগে বলে অটোরিক্সাতে যাওয়াই নিরাপদ। শিলিগুড়ির স্থানীয় যাত্রীরা আগেভাগেই পৌঁছয়, তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে লাইনে দাঁড়ানোই ভাল। জায়গা না পেলে পরের বাস ধরতে হবে। তাতেও ক্ষতি নেই। ঘণ্টা তিনেকের যাত্রা, দুপুরের আগে পৌঁছতে না পারলে সন্ধ্যার আগে পৌঁছনো যাবে। সময় মতো পৌঁছতে পারলে সেদিন বিকেলেই থিম্ফু যাবার অনুমতি পত্র সংগ্রহ করা যায়।

কিন্তু ভদ্রলোক বলেছিলেন: ফুন্‌ছোলিঙে একটা দিন নিশ্চয়ই থাকবেন।

কেন?

সেখানেও অনেক কিছু দেখবার আছে। শহরের হাটবাজার হিমালয়ের পাদদেশে হলেও অনেক ঘর বাড়ি ও সরকারী অফিস সব পাহাড়ের ওপর। পাহাড়ে উঠে একটা গোম্পাও দেখবেন। সেখান থেকে নীচের শহরের দৃশ্য অপরূপ মনে হবে। শহরের পাশ দিয়ে তো তোর্সা নদী বয়ে গেছে। নাম আমো চু। তার সঙ্গে এসে মিলেছে একটি ছোট পাহাড়ী নদী। তার নাম দুতিখোলা। সেখানেও একবার যাবেন। নদীর ধারে একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট গড়ে উঠছে। নানা রকমের কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি দেখতেও আপনাদের ভাল লাগবে।

তার মানে ফুন্‌ছোলিঙে একটি দিন আমাদের থাকতে বলছেন!

এটা আমার সাজেশন! দিনটা নষ্ট হয়েছে বলে আপনার মনে হবে না। আর রাত্রিবাসের তো কোন অসুবিধে নেই, ছোট বড় অজস্র হোটেল আছে এই শহরে। কোন কষ্ট আপনাদের হবে বলে মনে হয় না।

কষ্টের ভয় থাকলে ভ্রমণ করতে বেরোনোই উচিত নয়।

বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিয়েছিলুম এবং বাড়ি ফিরে টাইম টেবল খুলেছিলুম। ভদ্রলোক নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে শিলিগুড়িতে বাস ধরার পরামর্শ দিয়েছিলেন। শিলিগুড়িতেও একটা স্টেশন আছে বলে জানতুম। এও জানতুম যে এই অঞ্চলে নতুন ব্রডগেজ লাইন তৈরি হবার পর মিটারগেজ লাইনের পুরোনো স্টেশনের কাছাকাছি একটা করে নতুন স্টেশন তৈরি হয়েছে। সেই স্টেশনগুলিই 'নিউ' নামে পরিচিত।

কিন্তু টাইম টেবলের পাতা উল্টে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। দার্জিলিং মেল নিউজলপাইগুড়ি পৌঁছয় ভোর সাড়ে ছটায়, অথচ জলপাইগুড়ি নামের কোন স্টেশন নেই কাছাকাছি। রায়নগর জলপাইগুড়ি ও জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন বহু দূরে। বুঝতে পারলুম যে ব্রডগেজ লাইনে জলপাইগুড়ি নামের কোন স্টেশন নেই, আছে মিটারগেজ লাইনে। নিউজলপাইগুড়ি থেকে ছত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণে জলপাইগুড়ি এবং উত্তরে ন্যারোগেজ লাইনে দার্জিলিঙে যাবার পথে পাঁচ কিলোমিটার দূরে শিলিগুড়ি টাউন, শিলিগুড়ি জংশন আরো দু মাইল দূরে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হল যে এই নতুন স্টেশনের নাম নিউজলপাইগুড়ি না রেখে নিউ শিলিগুড়ি রাখলেই বোধহয় নতুন যাত্রীদের সুবিধে হত। এর মধ্যে জেলার সীমানা নিয়ে কিছু আছে কিনা জানি না। নতুন স্টেশনটি দার্জিলিং জেলায় না পড়ে জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত হতে পারে। যদি এই কারণেই শিলিগুড়ির এত নিকটের স্টেশন নিউজলপাইগুড়ি হয়ে থাকে, তবে তা দুঃখের বিষয় বলতে হবে। স্থানীয় লোকের জন্যে তো নামের দরকার নেই, দরকার দূরের যাত্রীদের। তাদেব সুবিধা না হলে নামের সার্থকতা কী!

তবে এই টাইম টেবল দেখে বেশ আশ্বস্ত হলাম। নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে বেশি দূরে ছুটতে হবে না। পথ মাইল তিনেকের কম হবে বলেই মনে হয়। অটোরিক্সায় এই পথ অতিক্রম করতে কয়েক মিনিট সময় লাগবে। অর্থাৎ ট্রেন রাইট টাইমে পৌঁছলে বাস ধরা যাবে সহজেই।

স্বাতি বলল: যাত্রাব আগে যা সহজ মনে হয়, পরে তা কঠিন সমস্যা হয়েও দাঁড়ায়। আবার কঠিন সমস্যা অভাবনীয় ভাবে সহজ হয়ে যায়।

বললুম: তুমি একে দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য বল, আমি তা ভাবি না।

তবে একে তুমি কী বলবে?

আমরা এই রকম ভাবতেই অভ্যস্ত। নিজেদের দুর্দশাকে ভাগ্যের ওপরে ফেলে

দিয়ে মনে শান্তি পাই।

স্বাতি বলল : অশান্তি হলেও তো ভাগ্যকেই দায়ী করি।

বললুম : আসল কথা হল যে সব দিক ভেবেই আমাদের যাত্রা করতে হবে। ভুটানের বাস না পেলে অন্য কোথাও যাব কিনা, তা আগে থেকেই স্থির করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য তো বেড়ানো, শিলিগুড়িতে দিন কাটানো নয়।

স্বাতি বলল : তাহলে আর একবার সিকিমে যেতে হবে। সেবারে যা দেখি নি, এবারে তা দেখব।

বললুম : পথটাও তো আমাদের কাছে নতুন !

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : কী রকম ?

এবারে আমরা ঘুমিয়ে গঙ্গা পার হয়ে যাব, কিন্তু সেবারের কথা মনে আছে ?

হ্যাঁ। স্টিমারে আমরা গঙ্গা পার হয়েছিলুম। খেজুরিয়া ঘাট থেকে ফরাক্কা।

তুমি বলেছিলে, এমন করে আর বোধহয় কাউকে গঙ্গা পার হতে হবে না। কেন ? বলে আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। আর তুমি উত্তব দিয়েছিলে, গঙ্গার ওপরে পুল তৈরি তো প্রায় শেষ হয়ে এল, এর পরে সেই পুলের ওপর দিয়ে ট্রেন চলবে, মোটর বাস চলবে।

স্বাতি হেসে বলল : আমাদের প্রাচী ভ্রমণের কথা কি তুমি ভুলে গেছ ? গত বছর তো আমরা ট্রেনেই গঙ্গা পার হয়েছি। কখন পেরিয়েছি, তা জানতেও পারি নি'।

কিন্তু সেবারের কথা আমি ভুলতে পারি নি। সন্ধ্যা সাতটার পর ট্রেন এসেছিল খেজুরিয়া ঘাট স্টেশনে। বিচিত্র এই ঘাট পারাপারের অভিজ্ঞতা। পাকা স্টেশন এখানে হয় না, উঁচু পাড়ের উপরে এক সারি বাঁশের ঘর। তারই মধ্যে সব অফিস, রিফ্রেশমেণ্ট রুম। ট্রেন থামলেই কুলিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে গাড়ির উপরে, যাত্রীদের বাক্স পেঁটরা ধরে টানাটানি আরম্ভ করে দেয়। তারপর মাথায় নিয়ে ছোটে। যাত্রীদেরও ছুটতে হয় তাদের পিছনে। অন্ধকারে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে থাকে স্টিমার। সবাই ছুটে গিয়ে তার পেটের ভিতরে হুড়মুড় করে ঢোকে। আমরাও উঠেছিলুম। আমরা ডেকে উঠে রেলিঙের ধারে বসেছিলুম। স্বাতি আর আমি। আমার আহত বাঁ হাতখানা গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে বাঁধা ছিল। সামনের দিক থেকে বাতাস আসছিল জোরে জোরে। শীতল বাতাস। স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলেছিল, তোমার শীত করছে না তো ! আমি বলেছিলুম, না। কিন্তু স্বাতি বলেছিল, না না, ভাল নয় ঠাণ্ডা লাগানো। স্টিমার ছাড়লে বোধহয় আরও বেশি ঠাণ্ডা লাগবে। বলে সে একখানা গরম চাদর এনে বলেছিল, এখানা গায়ে জড়িয়ে নাও। বলে নিজেই জড়িয়ে দিয়েছিল আমার গায়ে। আমি বলেছিলুম, তুমি কিছু গায়ে দিলে না ? স্বাতি তার শাড়ির আঁচল দেখিয়ে বলেছিল, আমার দরকার হবে না। আমি বলেছিলুম, আমাব কি দরকার ছিল ? স্বাতি বলেছিল, অসুখ করলে কে দেখবে তোমাকে ? তার উত্তর শুনে আমি হেসেছিলুম। আর স্বাতি বলেছিল, এ হাসির কথা নয়। ভাবি অসাবধানী তোমবা। চোখে চোখে না রাখলেই বিপদ বাধাও। আমি বলেছিলুম, আঁচল দিয়ে তাহলে ঢেকে বাখো। স্বাতি লজ্জা পেয়েও হার স্বীকার করে নি। বলেছিল, তাই রাখতে হবে।

আমাকে নীরব দেখে স্বাতি বলল : নিশ্চয়ই কোন পুবনো কথা মনে পড়েছে, তাই না ?

বললুম : সেবারের গঙ্গা পেরোবার দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তুমি এগিয়ে গিয়েছিলে রেলিঙের কাছে, আর আমিও তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলুম।

গঙ্গার জল চলতি স্টিমারের গায়ে লেগে কলকল করছিল, আর তারার আলোয় ছল ছল হয়েছিল জলের ধারা। তুমি আমার মুখের দিকে তাকালে, আমি তাকালুম তোমার চোখের দিকে। মুখে কোন কথা আসছিল না। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যাবার পর তুমি অস্পষ্ট ভাবে বলেছিলে, কী ভাবছ ?

স্বাতি বলল : ব্রাউনিং তোমারই প্রিয় কবি। অথচ তুমি বলেছিলে, আমার ব্রাউনিঙের কথা তোমার মনে পড়ছে।—

Let us be unashamed of soul,
As earth lies bare to heaven above.

ওপরের আকাশের কাছে পৃথিবী যেমন নগ্ন, তেমনি মনের জন্যে এখন আমাদের লজ্জা কেন !

বললুম : মনে পড়েছে। এ কথার উত্তরে তুমি বলেছিলে, লজ্জার কথা নয়। তুমি অন্য কথা ভাবছ। যে মুহূর্তটি জীবনে চিরন্তন করতে চাও, তাকে তো ধরে রাখতে পার না !—

Just when I seemed about to learn,
Where is the thread now ? Off again !
The old trick !

স্বাতি লজ্জিত ভাবে বলল : তুমি মনে রেখেছ এই কথা !

ভাল লেগেছিল বলেই মনে রেখেছি। আমার মনে হয়েছিল যে নিজের বাসনার কথা বুঝি এর চেয়ে স্পষ্ট করে বলা যায় না।

স্বাতি বলল : তুমি একবার আকাশের চাঁদের দিকে চেয়েছিলে, তারপর আমার দিকে চেয়ে বলেছিলে, খুব সত্যি কথা।—

Only I discern—
Infinite passion, and the pain
Of finite hearts that yearn

বাসনা অসীম, আর তার জন্যে বুকের যন্ত্রণারও যেন শেষ নেই।

এ কথার উত্তর আমি দিতে পারলুম না। তার পরের কথাও আমার মনে পড়ে গেল। এক ফাঁকে আমরা স্টিমারের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে খেয়ে নিয়েছিলুম। স্টিমার পারে পৌঁছলে আমরা নেমে ট্রেনে উঠব। রিজার্ভেসন আছে আমাদের। তার পরেই একটা দুর্ভাবনা এসেছিল মনে। হয়তো একটা কুপে দিয়েছে আমাদের ! রাতের গাড়ি। সে গাড়িতে আর কোন যাত্রী তো থাকবে না ! আমি ঘেমে উঠেছিলুম কিনা মনে নেই, কিন্তু বেশ গরম বোধ হয়েছিল। গায়ের চাদরখানা স্বাতিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলুম। সেটা সে নিজের হাতে আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিল। ভাল লেগেছিল তার এই স্নেহের স্পর্শ। আমি তার মনের উত্তাপও যেন খানিকটা পেয়েছিলুম।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলল : তুমি চিরকালই ভীরু।

বোধহয় তাই। ট্রেনে আমরা একখানা কুপে কম্পার্টমেণ্ট পেয়েছিলুম। স্বাতি আমাকে অনেক যত্নে ঠেলে গাড়িতে তুলে দিয়ে ট্রেনের সময় জানতে চলে গিয়েছিল। গাড়িতে নীচের বার্থে আমি বসেছিলুম, উপরে একখানি বাঙ্ক। দুজনের জন্যে এই কুপে। তৃতীয় ব্যক্তি এখানে ঢুকতে পারবে না। সারা রাত আমরা একা এই গাড়িতে থাকব, আর কেউ থাকবে না। কিন্তু এত ছোট গাড়িতে সারা রাত আমরা কাটাব কী করে ! এই বদ্ধ পরিবেশে দম যে আটকে যাচ্ছে ! কোন দিক থেকে বাতাস আসছে না

যেন ! গাড়ির পাখাও কি চলছে না ! কিন্তু উপরের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলুম যে মাথার উপরে দুখানা পাখা ঘুরছে। পাখার বাতাস যেন শীতল নয়। মনে হয়েছিল, কপালে আমার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে। আর একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

স্বাতি ঠিক এই সময়ে ফিরে এসেছিল। প্রসন্ন হাসি তার মুখে। বাইরে থেকে মুখ বাড়িয়ে বলেছিল, নিশ্চিন্তে যাওয়া যাবে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে আর কোন ভয় নেই। আমরা কলকাতায় পৌঁছব সকালে।

আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম স্বাতির কথা শুনে। এ কী বলছে সে ! ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে যে দম আটকে যাবে ! এইটুকু গাড়ির ভেতর—

দরজার হাতল ধরে স্বাতি উঠে পড়েছিল। গাড়ির মিটমিটে আলোয় তার স্বচ্ছন্দ ভাব দেখে আমার বিস্ময়ের যেন সীমা ছিল না। আর সে-ও আমার মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠে বলেছিল, তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে ?

আমি বলেছিলুম, কই না, কষ্ট কিসের !

তবে এমন ঘেমে উঠছ কেন ! বলে স্বাতি নিজের হাতে আমার কপালটা মুছে দিয়ে বলেছিল, ইস !

তারপরেই ওধারের জানালার দিকে চেয়ে বলেছিল, ওমা, জানালাটা যে বন্ধ আছে !

বলেই ওপাশে গিয়ে জানালা খুলে দিয়েছিল। এধারের জানালাও খুলে দিয়ে আমার পাশে বসে বলেছিল, গাড়ি ছাড়লে তোমার বিছানা বিছিয়ে দেব।

কিন্তু বাইরে থেকে কোন শীতল বাতাস এল বলে আমার মনে হল না। সেই বন্ধ আবহাওয়া যেন আরও কঠিন হয়ে আমার বুকের ওপরে চাপ দিতে লাগাল। স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, কী কষ্ট হচ্ছে বল তো !

আমার কষ্টের কথা আমি আর লুকোতে পারি নি, বলেছিলুম, এই কামরাটা খুবই ছোট, তাই না ? একটা বড় কামরায় গেলে বোধহয় ভাল হত।

ভয় ! বলে স্বাতি সকৌতুকে হেসে উঠেছিল। আর লজ্জা পেয়ে আমি বলেছিলুম, তোমাকে আমি ভয় পাব কেন !

তবে কি আমি তোমাকে ভয় পাব ?

সহসা এ কথার উত্তর আমি দিতে পারি নি। কিন্তু স্বাতি বলেছিল, মানুষ মানুষকে ভয় পাবে কেন ! ভয় তো পশুকে। মানুষ শয়তানকে ভয় পায়। কিন্তু ভয় পায় না দেবতাকে। আমরা তো সে সব কিছু নই, আমরা মানুষ। আমরা ভয় পাব কেন !

আমি আশ্চর্য হয়ে স্বাতির মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম, আর স্বাতি বলেছিল, মনুষ্যত্বে কি তোমার বিশ্বাস নেই, না বিশ্বাস হারিয়েছ আজকাল ?

বলে আমার চুলের মধ্যে একটা হাত চালিয়ে দিল।

আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম, উত্তর দেবার মতো কিছু ভেবে পাচ্ছিলুম না। তার এই স্নেহের স্পর্শে আমার শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল। বাইরে থেকে কি হঠাৎ বাতাস আসতে শুরু করেছে !

আমার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে স্বাতি বলেছিল, তুমি ভারি ছেলেমানুষ !

সেদিন আমি এ কথার প্রতিবাদ করতে পারি নি। আজও প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হল না। মনে হল, ভীরু বলেই তো তার কাছে হার মেনেছি !

৭

দার্জিলিঙ মেল ছাড়ে কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে। ভারত স্বাধীন হবার আগেও এই স্টেশন থেকেই দার্জিলিঙ মেল ছাড়ত। কিন্তু তার পথ ছিল ভিন্ন। তখন এই ট্রেন কলকাতার গঙ্গা পেরিয়ে ফরাক্কার দিকে যেত না। দার্জিলিঙ মেল তখন সোজা উত্তরে গিয়ে সারা পুলের উপর দিয়ে পদ্মা পেরিয়ে শিলিগুড়ি স্টেশনে এসে দাঁড়াত। দেশ বিভাগের পর এই পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ দিন পরে নূতন পথ তৈরি হয়েছে। কিছু দিন আগেও ফরাক্কায় খেয়াঘাট ছিল। এখন পুল হয়েছে।

যথা সময়ে স্টেশনে এসে দেখলুম যে এবারেও আমাদের ভাগ্যে একখানা কুপে কম্পার্টমেণ্ট জুটেছে। সেবারের কথা মনে পড়ে যেতেই আমার হাসি পেল। স্বাতি ঠিকই বলে, আমি চিরকালই ভীরু। ভয় আমার অন্য মানুষকে নয়, ভয় নিজেকেই। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করার সাহস নেই।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসেছিল। তাই কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করলুম। একটু ভেবে বললুম : এই বিলাসিতার কোন প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীতেও আজকাল রাতে ঘুমোবার ব্যবস্থা ভাল।

স্বাতি বলল : এখন তোমার আর ট্রেনের যাত্রীদের কাছে কিছু জানার নেই তো, তাই আরামে ঘুমোবার ব্যবস্থা করি।

কিন্তু জানার কথার তো শেষ নেই, নতুন মানুষের কাছেই নতুন কথা জানা যায়।তাছাড়া পয়সাও অনেক বাঁচে।

নিজের ভাবনা ভাববার জন্যে পয়সার ভাবনা কি তুমি আমার ওপরে ছেড়ে দাও নি ?

দিয়ে তো নিশ্চিন্ত হয়েছি।

তবে এসো, ট্রেন ছাড়বার আগেই সব গুছিয়ে নিই।

বলে একাই সে গোছাতে লাগল। আমি তাকে সাহায্য করলুম বিছানা পাতার সময়ে। এ কাজে আমরা খুবই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সঙ্গে মালপত্র থাকে যৎসামান্য, অর্থাৎ যতটুকু না থাকলে নয় তার বেশি একটুও নয়। এখন আমরা একটি ছোট সুটকেশেই দুজনের জামাকাপড় নিই, একটি বিছানায় দুজনের চাদর ও বালিশ। শীতের দেশে যাচ্ছি বলে কম্বল নিতে হয়েছে। তারই সঙ্গে পুরো হাতের সোয়েটার। বৃষ্টিতে ভেজার ভয় আছে বলে দু সেট গরম জামা ও দুটি ফোল্ডিং ছাতা। সোয়েটার গুলো বিছানায় বাঁধা হয়েছে বলে সেটা এবারে একটু মোটা হয়েছে। তা না হলে এই বিছানা ও বাক্স আমি নিজেই বহন করতে পারি। স্বাতির হাতে একটি বড় ব্যাগ থাকে, তাতে টুকিটাকি জিনিসপত্রের সঙ্গে দরকারি ওষুধ ও খাবার জিনিসও থাকে। তার ছোট ব্যাগটা সে কাঁধে ঝুলিয়ে রাখে, তাতে টাকা পয়সা থাকে সামান্যই। বাড়তি টাকা আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখি। খরচের টাকা থাকে ট্রাভ্‌লার্স চেকে। ভ্রমণের সময়ে

সঙ্গে টাকা বেশি থাকলে ভাবনা কম। আব মালপত্র কম থাকলে পবিশ্রম নেই। কুলিব জন্যে অপেক্ষা কবতে হয না। ট্রেনে বাসে স্টিমাবে এমন কি প্লেনেও সুবিধে। পথে মিতাহারী হতে পারলে আবও সুবিধে। ব্যাগেব মধ্যে সামান্য কিছু খাদ্যদ্রব্য থাকলে সাবাদিন নিশ্চিন্ত থাকা যায। পথে প্রায় সর্বত্রই চা বা কফি পাওযা যায়। পাঁউরুটি মাখন কলা বা আপেল খেয়ে পেট ভরে। বাতে কোন পবিচ্ছন্ন জায়গায আশ্রয় পাবার পব একবাব পছন্দ মতো আহাব কবে সন্তুষ্ট হতে হয। ভোববেলায স্নান কবে সাবাদিনেব নামে নিশ্চিন্ত। ভ্রমণেব সময সংক্ষেপেব কাযদাটা আযত্ত কবতে হয। তাতে পযসা বাঁচে, আবামও পাওযা যায। এবই জন্যে গৃহত্যাগেব পূর্বে পড়াশুনোর প্রযোজন। টুবিস্ট অফিসেব সঙ্গে যোগাযোগ করে বা ডাকে টুবিস্ট লিটারেচার আনিযে ভ্রমণ সূচী তৈবি কবতে হয় নির্ভুল ভাবে। কোথায কী দেখবাব বা জানবাব আছে, কীভাবে দেখতে হবে, কী জানতে হবে এবং কাব কাছে, কী ভাবে যাতাযাত কবলে কষ্ট কম হবে অথচ সময ও পযসা বাঁচবে, অল্প সমযে বেশি দেখা বা জানা সম্ভব হবে—এসব তথ্য জেনে বেবোলে ভ্রমণ আনন্দেব হবে। তা না হলে ফিবে এসে অনেক সমযেই আফশোস কবতে হয—এটা দেখা হয নি, ওটা জানা হয নি, এখানে না গেলেও চলত, সেখানে কষ্টেব সীমা ছিল না। ভ্রমণ কাহিনীতে সব সমযে সব কথা থাকে না। তাই স্বনির্ভব হওযাই বাঞ্ছনীয। যাঁবা বাড়িতে বসে ভ্রমণেব আনন্দ পেতে চান, ভ্রমণ কাহিনী তাঁদেব জন্যেই ভাল। যাঁবা পথঘাটেব হদিস জানবাব জন্যে ভ্রমণ কাহিনী পড়েন, তাঁদেব অনেক সমযেই ঠকতে হয। তাব কাবণ প্রতিদিন পথেব পবিবর্তন হচ্ছে, যানবাহন বদলাচ্ছে, বাসস্থান ও ব্যয বাড়ছে। পৃথিবীব প্রগতির সঙ্গে সমান তালে ভ্রমণেব সুখ সুবিধাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জটিলতাবও সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আজকেব লেখা ভ্রমণ কাহিনী কাল বাতিল হযে যেতে পাবে। থাকবে শুধু যা কোন দিন বদলায না সেই সব শাশ্বত কথা। ভ্রমণ কাহিনীতে যাঁবা সে কথা লেখেন, সেই ভ্রমণ কাহিনীই চিবস্থাযী হতে পাবে। সমসামযিক কথা সমযই গ্রাস কবে। কালেব গ্রাস থেকে তাব নিস্তাব নেই।

জিনিসপত্র সব গুছিযে নিযে স্বাতি নিশ্চিন্ত হযে বসল। তাবপব আমাকে ডাকল পাশে বসবাব জন্যে। আমি তাব পাশে বসে হেসে বললুম এ তোমাব কতক্ষণেব সংসাব?

যতক্ষণেব জন্যেই হোক, পছন্দ মতো গুছিযে নিতে তো দোষ নেই।

সমযেব অপব্যয নয কি?

স্বাতি বলল সময বযে যাবেই, তাকে তো ধবে বাখতে পাববে না। তাই সে সময়টায বসে না থেকে কিছু কবলে তা সময়েব অপব্যয হয না। কিছু না কবে সমযকে বয়ে যেতে দেওযাই তো সমযেব অপব্যয।

হেসে বললুম তর্কে আমি চিবকালই তোমাব কাছে হেবে যাই।

কিন্তু সে কথা মনে বাখতে পাব না কেন জানি নে। মনে বাখলে সমযটা অন্য ভাবে ব্যয করতে পাবতে।

গাড়িব কবিডবে ব্যস্ততার সীমা ছিল না। অনেক যাত্রী শেষ মুহূর্তেও আসেন ছুটতে ছুটতে। নিজেব জাযগা খুঁজে নেবাবও হযতো সময পান না। সবাই এসে ট্রেন ধবতে পাবেন কিনা সে বিষযেও আমাব সন্দেহ আছে। এ বোধহয গতির যুগের মানসিকতা, ছুটে চলাব বাসনা থেকে এব জন্ম। হাতে ঘড়ি বাঁধা আছে, গাড়ি দাঁড়িযে আছে বাড়ির দরজায। স্টেশনে পৌঁছতে কতটা সময় লাগবে তাও আছে জানা। কিন্তু

ট্রাফিক সিগনালে কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে, বা যানবাহনের জটে জড়িয়ে কতটা সময় নষ্ট হবে, এই হিসেবে তা ধরা নেই। ট্রেনের মতো এখন প্লেনও মিস্ হচ্ছে। তবু চৈতন্য হচ্ছে না অনেকেরই। এক সময়ে স্টেশনের ঘণ্টা বাজল, গার্ডের বাঁশিও বাজল। তার পরেই ট্রেন ছাড়ল। যাত্রীরা তখনও প্ল্যাটফর্মে ছুটছে দেখতে পেলুম।

স্বাতি এক সময়ে দুর্গা দুর্গা বলে দু হাত জুড়ে কপালে ঠেকিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরোবার সময়েও বলেছিল, দুর্গা দুর্গা। যাত্রার আগে আজও অনেকে পাঁজি দেখেন, দিন ক্ষণ দেখে যাত্রার দিন ও সময় স্থির করেন। এ নিয়ম উঠে যাচ্ছে। পুরাতন প্রথায় বিশ্বাস হারাচ্ছে এ কালের মানুষ। মঘা বা অশ্লেষায় যাত্রা করে কোন বিপদ-আপদ ঘটলে বলেন ব্যাপারটা কাকতালীয়, দিনক্ষণ দেখে বেরোলেও এ রকম হত। কিন্তু যাঁরা দিনক্ষণ দেখে বেরোন, তাঁরা এই বিশ্বাস হারালে মনের শান্তিও হারাবেন। বিশ্বাস মানুষকে শান্তি দেয়, জোগায় সাহস। আমি তাই স্বাতিকে সমর্থন করি, নিজের অজ্ঞাত সারেই বলি, দুর্গা দুর্গা। বোধহয় মনে মনেই বলি, দু হাত জুড়ে কপালে ঠেকাই না।

যখন থেকে আমরা এইভাবে একা যাতায়াত করছি, তখন থেকে সে আর একটা কাজ করে নিষ্ঠার সঙ্গে। দরজায় ছিটকিনিগুলো পরীক্ষা করে নেয় ট্রেন ছাড়ার আগেই। জানালাগুলো বন্ধ করে দেয়, পাখা চলে কিনা ও বাতি সব নেবে কিনা তাও পরীক্ষা করে নেয়। প্রয়োজন হলে স্টেশনেই দোষ ত্রুটি ঠিক করিয়ে নেয়। অনেক সময়ে শোনা যায় যে দরজার ছিটকিনি ভাঙা। কিংবা নাইট ল্যাচ্ কেউ উপড়ে নিয়েছে। ট্রেন ছাড়াব আগে জানালা বন্ধ না করলে ভেতরের জিনিস খোয়া যায় ট্রেন ছাড়ার সময় বা ঠিক তার পরেই। বাইরে থেকে চোর গরাদের ভেতর দিয়ে হাত বাড়িযে কিছু বার করে নেবার সুযোগ পায়। পাখা চলে না বা ঘুমোবার সময়ে একটা বাতি নেবে না, এ রকম তো আকছার হয়। তাই কিছু সতর্কতা অবলম্বনের অভ্যাস রাখা মন্দ নয়, অনেক সময়েই তা কাজে লাগে।

ট্রেন স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে আসবার পব স্বাতি তার ঘড়ি দেখে বলল : সোয়া সাতটায় ছেড়েছে, পৌঁছবে সকাল সাড়ে ছটায়। তার মানে প্রায় বারো ঘণ্টার পথ।

হিসেব করে বললুম : পঁয়তাল্লিশ মিনিট কম।

তার মানে এগার ঘণ্টারও বেশি।

তা ঘুমোবার জন্যে যথেষ্ট সময়।

স্বাতি হেসে বলল · যখন খেতে ইচ্ছে করবে, বোলো। সঙ্গে খাবার আছে।

বললুম · আজকের খাবাব যে আছে তা জানি। আগামী কালের ব্যবস্থাও নিশ্চযই আছে!

স্বাতি লজ্জা পেয়েছিল, কিন্তু তা প্রকাশ না করে বলল : সকাল বেলায় ট্রেন থেকে নেমে কিছু খাবার চেষ্টা করলে বাস ধরা আর যাবে না। তারপর বাস যদি সারা দিন ধরে চলে, তবে যেখানে সেখানে অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়াও উচিত হবে না।

তারপর ?

স্বাতি রাগের ভান করে বলল : তাব পরেও যদি কিছু খেতে পাও তো তা নিজের ভাগ্য বলে জেনো।

আমি তার গিন্নীপনা দেখেছি। যে ব্যাগটা সে সঙ্গে নেয, তাতে নানা রকমের প্রয়োজনীয় টুকিটাকির সঙ্গে খাবাব সরঞ্জামও থাকে। পাঁউরুটি মাখন বা মার্মালেড কলা আপেল শুকনো ফল, বিস্কুট, চমনবাহার মেলানো ভাজা মশলা। অনেক দিন আগে নাকি একবার বৃষ্টির জন্যে ট্রেন পথে আটকা পড়েছিল। আর অসময়ে বড়

স্টেশনে এসেছিল বলে তারা সারা দিন খেতে পায় নি। তার পর থেকেই সে সতর্ক হয়েছে।

কিন্তু আমি তর্ক করবার অভিপ্রায় নিয়ে বললুম : কিন্তু আগে অখাদ্য-কুখাদ্য বলে কিছু ছিল, এমন কথা তো শুনিনি! পথের ধারের আলু কাবলি চাট গোলগাপ্পাই অমৃত বলে মনে হত!

স্বাতি চটল না, বলল : সে এখনও হয়, কিন্তু তা খেয়ে তো পেট ভরে না!

বলেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল : ভেতরে আসবেন? আসুন না।

আমি আশ্চর্য হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। বেশ অপ্রতিভ ভাবে বললেন : আপনাদের বোধহয় ডিস্টার্ব করা হবে!

না না, কিছু মাত্র না।

বলে স্বাতি তাঁকে সাদরে এনে বসাল এবং নিজে বসল জানালার ধার ঘেঁষে। আর আমি রইলুম মাঝখানে। ভদ্রলোক বসবার পরে স্বাতি বলল : আপনি তো আমাদের সঙ্গে এই ট্রেনেই চলেছেন। কত দূর যাচ্ছেন? দার্জিলিঙে, না আর কোথাও?

ভদ্রলোকের চেহারা দেখে মনে হল যে তিনি পাহাড়ের মানুষ। কিন্তু উত্তর দিলেন ভাঙা বাঙলায়। বললেন : আমি তুমলঙে যাচ্ছি।

সে আবার কোথায়?

ভদ্রলোক বললেন এখন এ জায়গার নাম আর কেউ জানে না, কিন্তু এক সময়ে এখানেই ছিল স্বাধীন সিকিমের রাজধানী।

আমি আশ্চর্য হলুম এই কথা শুনে। সিকিমে যে এই নামের কোন শহর আছে, এ কথা আমার জানা ছিল না। তবে এই রকমের একটা নাম বিশ্বকোষে পড়েছিলুম বলে মনে হল। ভদ্রলোক আমাদের বিস্ময় দেখে বললেন : আমার বাঙলা কথা শুনে আশ্চর্য হচ্ছেন তো, কলকাতায় এসে শিখেছি।

আমি বললুম : আপনি কি সিকিমেরই অধিবাসী?

ভদ্রলোক বললেন : আমার বাপ-দাদা কোথা থেকে এসেছেন তা বলতে পারব না। কিন্তু আমরা সিকিমেরই লোক ছিলাম বলতে পারেন।

এখন?

এখন তো কলকাতার লোক। এখানেই ব্যবসা করি, ব্যবসার কাজেই তুমলঙে যাচ্ছি।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : কে আছেন সেখানে?

ভদ্রলোক বললেন : এখন আর কেউ নেই। পরিবারের লোকেরা এখন গ্যাংটকেই থাকেন।

এইবারে আমার সন্দেহ হল যে স্বাতি এই ভদ্রলোককে হিমালয় অঞ্চলের লোক ভেবেই ডেকেছে। তিনি বোধহয় দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিলেন। এইবারে তার দিকে ফিরে তাকাতেই সে ইসারায় আমাকে যা বলল, তার অর্থ আমার কাছে বেশ স্পষ্ট। এঁর কাছে যতটুকু জানা যায়, ততটুকু আমাদের জেনে নিতে হবে। তাই আর দেরি না করে বললুম : আমরা তো এবারে সিকিমে যাচ্ছি না, ভুটানে যাবার ইচ্ছে।

ভদ্রলোক তৎপর ভাবে বললেন : তা এই ট্রেন সময় মতো পৌছলে সঙ্গে সঙ্গে ভুটান সরকারের বাস পেয়ে যাবেন। স্ট্যাণ্ড থেকে সাড়ে সাতটায় বাস ছাড়ে। তবে টিকিটের জন্যে লাইন দিতে হবে।

স্বাতি বলল : কখন পৌছব?

তা ঘন্টা তিনেক লাগবে ফুন্‌ছোলিঙ পৌঁছতে। সেখানেও আমাদের যেতে হয়। ভাল জায়গা। কোন অসুবিধা হবে না।

ভাল হোটেল আছে তো?

বাস স্ট্যাণ্ডের কাছাকাছিই অনেক হোটেল আছে। যেমন চান তেমনি।

স্বাতি বলল : তবে তো খুব সুবিধে। কিন্তু আমরা কী ভেবেছিলাম জানেন?

কী ভেবেছিলেন?

ভুটানের বাস না পেলে আমরা গ্যাংটকেই যাব।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন : বেশ তো, চলুন না গ্যাংটকে। দুচার দিন সেখানে থেকে ফিরে এসে ভুটানের বাস ধরবেন!

কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে আমাদের ফেরার দিন যে ঠিক হয়ে আছে। ট্রেনের রিজার্ভেসন তো, বুঝতেই পারছেন। তবে হ্যাঁ, ভুটান থেকে যদি আগে ফিরতে পারি, তবে আর একবার গ্যাংটকে ঘুরে আসব। সেবারে আমাদের বিশেষ কিছু দেখা হয় নি।

স্বাতির মতলব বুঝতে পেরে আমি সরাসরি বললুম : সিকিম সম্বন্ধে কিছু বলুন না আমাদের।

কী বলব বলুন তো!

যা জানেন, তাই বলবেন। আমাদের কাছে তো সবই নতুন কথা বলেই মনে হবে।

স্বাতি বলল : সত্যি বলতে গেলে সিকিম সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। সিকিম শব্দটার মানে কী, তাই আমরা জানি না।

ভদ্রলোক একটু বিব্রত ভাবে বললেন : শুনেছি যে তিব্বতী ভাষার সুখিম শব্দ থেকে নাকি এই সিকিম শব্দটি এ দেশে এসেছে। সুখিম মানে নাকি নতুন গৃহ। তিব্বতী ভাষা তো জানি নে, এ আমার শোনা কথা।

স্বাতি বলল : এ রকমের একটা নাম হবার তো কারণ আছে!

তা নিশ্চয়ই আছে। আমার মনে হয় যে তিব্বতীরাই এই নাম রেখেছিল।

সিকিমে তিব্বতী লোকও আছে নাকি?

আছে বৈকি। সিকিমে যারা বাস করে তাদের মধ্যে প্রধান হল তিব্বতী, নেপালী, ভুটিয়া ও লেপচা। কাজেই মনে হয় যে তিব্বতীরা এসে এই দেশের নাম রেখেছিল সুখিম। তারপর অন্যান্য লোকেরা এসে সুখিম শব্দটাই সিকিম করে নিয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আপনাদের ভাষা কী?

আমাদের ভাষা হল সিকিমী, তবে নেপালীদের গুর্খালী ভাষাও খুব চলে।

আপনারা সিকিমকে কী বলেন?

অনেকে দেনজঙ বলে। এই শব্দটার মানে ধানের উপত্যকা। সঠিক মানেটা ধানের লুকনো উপত্যকা কিনা তা বলতে পারব না। আমরা ইংরেজী ভাষাতেই লেখা পড়া শিখেছিলাম, কাজকর্মও ইংরেজী ভাষাতেই করি।

স্বাতি প্রশ্ন করল : দেশটা কত বড়?

ভদ্রলোক বললেন : এখন আর বড় বলা যায় না। বড় হলে কি ভুটানের মতো স্বাধীন থাকত না! দেশের লোক নিশ্চয়ই স্বাধীন থাকতে চাইত।

তবু?

তা এখন এর আয়তন সাত হাজার বর্গ কিলোমিটার হবে।

আর লোক সংখ্যা কত?

এখন কত তা বলতে পারি না, ৬১ সালের গণনায় ছিলএকলক্ষ বাষট্টি হাজারের কিছু বেশি।

স্বাতি বলল : আশ্চর্য ! একটা মাঝারি মাপের শহরেই তো এক লাখের বেশি লোক বাস করে !

ভদ্রলোক বললেন : স্কুলে পড়েছিলাম যে ইংরেজ আমলে এই দেশে পাঁচশোর বেশি গ্রাম ছিল, আর গৃহের সংখ্যা ছিল প্রায় পনের হাজার। কতগুলো বৌদ্ধ গোম্পা ছিল জানেন ?

না।

চুয়াল্লিশটা। সেই সব গোম্পায় বারোশো লামার বাস ছিল।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : পাঁচশো গ্রামে চুয়াল্লিশটা গোম্পা ! আর দেড় লাখ লোকের জন্যে বারোশো লামা !

ভদ্রলোক বললেন : ব্যাপারটা তিব্বতেরই মতো। ইতিহাসে পড়েছি যে তিব্বতের লামারাই এ দেশে এসে তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্ম এখানে প্রচার করেছিলেন।

কী রকম ?

তাহলে গোড়া থেকেই বলি, কী বলেন ?

তাই বলুন।

আসামের পার্বত্য লেপচারা এসে সিকিমে বসবাস করতে আরম্ভ করে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে। তখন এ দেশে তিব্বতীদের বাস ছিল কিনা, থাকলে সংখ্যায় কত ছিল, তা বলতে পারব না। কিন্তু লাসার লামা আরও দুজন লামার সাহায্যে সিকিমের লেপচাদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দেন এবং পেনছু নামগিয়েল নামে একজনকে গিয়ালপো বা রাজা বলে স্বীকার করেন।

জিজ্ঞাসা করলুম : এ কত দিনের পুরনো ঘটনা ?

ভদ্রলোক বললেন : সালটা বোধহয় ১৬৪১। ৪২ও হতে পারে।

এই পেনছু নামগিয়েলও কি লেপচা ছিলেন ?

পাগল হয়েছেন ! লেপ্চা হলে তিব্বতী লামারা তাঁকে রাজা বলে স্বীকার করতেন ?

তবে ?

তিনিও তিব্বতী ছিলেন, পূর্ব তিব্বতের খাম অঞ্চলের লোক। নামগিয়েলরা মৈনাক নামের একটা জায়গা থেকে এসেছিলেন।

স্বাতি বলে উঠল : আমাদের পুরাণে মৈনাক তো হিমালয়ের ছেলে !

আমি বললুম : মৈনাক পর্বত। সে পর্বত এখন ভারত মহাসাগরের নীচে।

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাতেই বললুম : রামায়ণে পড়েন নি ?

না।

পুরাকালে পর্বতদের পাখা থাকত পাখির মতো। তারা ইচ্ছেমতো উড়ে বেড়াত। সবাই ভয় পেত তাদের। তাই দেবতাদের রাজা ইন্দ্র সবার পাখা কেটে দিচ্ছিলেন। মৈনাক ভয় পেয়ে পবন দেবের সাহায্যে উড়ে এসে এই সমুদ্রের নীচে আশ্রয় নেয়। ইন্দ্র আর তার পাখা কাটতে পারেন নি। পবন দেবের এই সাহায্যের কথা মৈনাক মনে রেখেছিল। আর পবন নন্দন হনুমান যখন লাফ দিয়ে সমুদ্র পার হচ্ছিল, তখন মৈনাক সমুদ্রের নীচে থেকে মাথা উঁচু করে বলেছিল, আমার ওপরে একটু বিশ্রাম করে যাও।

কিন্তু হনুমান তার গায়ে হাত বুলিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিল, তার দরকার নেই।

দু চোখ বিস্ফারিত করে ভদ্রলোক বললেন : সত্যি নাকি !

হেসে বললুম : রামায়ণের কথা মিথ্যে হবে কেন !

কিন্তু এ মৈনাক তিব্বতেরই কোন জায়গার নাম। সিকিমের নামগিয়েল বংশ সেখান থেকেই এসেছিলেন। কিন্তু অতীতে তাঁরা নাকি ভারত থেকেই তিব্বতে গিয়েছিলেন।

এবারে আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : কী রকম ?

ভদ্রলোক বললেন : সিকিম সরকারের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট একখানা ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন—Sikkim, a concise chronicle. তাতে পড়েছি যে ভারতের হিমাচল প্রদেশে ইন্দ্রবোধি নামে এক রাজা ছিলেন। নামগিয়েলরা তাঁরই বংশধর। ইতিহাসে নাকি আছে যে এক সময়ে পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলের সাহসী রাজপুত্ররা পূর্ব দিকে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কমে এলেই নাঁকি এই রকম হয়। এইভাবে হিমাচল প্রদেশের এক রাজপুত্র নবম শতাব্দীতে মৈনাকে এসে এক রাজ্য স্থাপন করেন। পঁচিশ পুরুষ পরে মৈনাক রাজ্যেরই একজন তাঁর পাঁচ ছেলেকে নিয়ে পশ্চিমে তীর্থ যাত্রায় বার হন। এ হল পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ঘটনা।

তারপর ?

খিয়ে বুম্‌সা নামে এক ছেলে সাক্য নামে এক জায়গায় এসে সেখানকার প্রধান পুরোহিতের মেয়েকে বিয়ে করেন এবং নিকটের চুম্বি উপত্যকায় বসবাস করতে থাকেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই বংশেরই একজন সিকিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বাতি বলল : খিয়ে বুম্‌সা শব্দটার কোন মানে আছে নাকি ?

ভদ্রলোক বললেন : ঠিক ধরেছেন। খিয়ে বুম্‌সা মানে এক লাখের শক্তি। সাক্য গোম্পার চারটি বিরাট স্তম্ভ নির্মাণের জন্যে তাঁর এই নাম হয়েছিল। ইনি সাক্যর প্রধান পুরোহিতের মেয়েকে বিয়ে করবার পর ফরি নামে এক জায়গায় থেকে যান, আর অন্য ভাইরা যান পশ্চিম ভুটানে। খিয়ে বুম্‌সা লেপচাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাদের খুব বন্ধু হয়ে ওঠেন। একজন লেপচা সর্দারের সঙ্গে তাঁর ভাই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পিতার মৃত্যুর পর খিয়ে বুমসার তৃতীয় পুত্র মিপন রব প্রধান হয়েছিলেন। এঁর পর মিপন রবের চতুর্থ পুত্র গুরু টাশি গ্যাংটকে চলে আসেন। লেপচারা এই সময়েই গুরু টাশির অধীনতা স্বীকার করেন। এঁর পরেই পেনছু নামগিয়েল। ১৬০৪ সালে গ্যাংটকে তাঁর জন্ম, কিন্তু ইনি তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ইয়োকসমে।

কেন ?

ইয়াটুং উপত্যকায় থাকার প্রয়োজন বোধহয় ফুরিয়ে গিয়েছিল।

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন : এই রাজার নাম নিয়ে একটু গোলমাল আছে।

কী রকম ?

বিদেশী লেখকের লেখা ইতিহাসে আমরা পেনছু নাম পেয়েছিলাম। কিন্তু এই দেশের প্রকাশিত ইতিহাসে তাঁর নাম ফুন্‌ছোগ। মানে Penchoo নয়, Phuntsog, কিন্তু তিনি যে একজনই তার প্রমাণ হল তাঁরই রাজত্ব কালে লাসার লামা আর দুজন লামার সহায়তায় সিকিমে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন এবং ফুন্‌ছোগ্‌ নামগিয়েলকেই গিয়ালপো বা রাজা নামে অভিহিত করেন অর্থাৎ তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে নেন।

সরকারী পুস্তিকায় এই ঘটনা ১৬৪২ সালের। তখন থেকেই বৌদ্ধ ধর্ম সিকিমের রাজধর্ম। ইনিই সরকারী শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। দেশটাকে বারোটি জং বা জেলায় বিভক্ত করে এক এক লেপচা জংপন বা শাসন কর্তা নিযোগ করেন। তাঁর কাউন্সিলেও ছিল বারো জন মন্ত্রী।

হেসে বললুম : এ একেবারে পাকা ব্যবস্থা।

স্বাতি বল : তারপর কী হল ?

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন : এই সব নিরস কথা শুনতে আপনাদের ভাল লাগছে !

বললুম : খুব ভাল।

তাহলে একটু সময় দিন, জামা কাপড় বদলে আসি।

বলে তিনি বেবিয়ে গেলেন।

৮

ভদ্রলোক চলে যাবার পর স্বাতি বলল : ইনি যে ইতিহাসের কথা বললেন, তা কি তোমার বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে ?

বললুম . অবিশ্বাস করার কোন হেতু নেই।

কেন ?

যতটুকু জানি, তার সঙ্গে কোন বিরোধ হয় নি। আর যা জানি না, তার অথরিটি তিনি নিজেই বলেছেন। সিকিম সরকার যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন নিজেরা, তাতে ভুল তথ্য থাকবে না। যা থাকবে, তাকেই সত্য বলে মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ হিমাচল প্রদেশের এক রাজপুত্র তিব্বতে গিয়ে এক ছোটখাটো রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নবম শতাব্দীতে। এই সময়ে ভারতেব অবস্থা কী রকম ছিল, তা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে।

স্বাতি আগ্রহ প্রকাশ করে বলল . কী রকম ?

বললুম : অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে সাম্রাজ্যের জন্য দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তিনটি প্রবল শক্তির মধ্যে। বাঙলায় পাল রাজারা, রাজপুতানায় গুর্জর-প্রতিহারবা এবং দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটবা শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের মধ্যে বিবাদেই সেই শক্তি ক্ষয় করছিলেন প্রায় দুশো বছব ধরে। হজরৎ মুহম্মদের কাল বোধহয় জানো ?

স্বাতি বলল : সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে, তাই না ?

হ্যাঁ, ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে তিনি দেহ রক্ষা করেন। আরব জাতির মধ্যে তিনি এমন এক চেতনা এনেছিলেন যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারা এক প্রবল শক্তি রূপে আত্ম প্রকাশ করে। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে সবুক্তিগিন আসেন ভারতে এবং তাঁর পরেই সুলতান মামুদের ভাবত অভিযান। তিনি সতের বার ভারত আক্রমণ করে যে হত্যা ও ধ্বংসলীলা চালিয়েছিলেন, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। তিনি মথুরা সোমনাথ ও কাংড়ার মন্দির লুণ্ঠন করে সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে গিয়েছিলেন। পাঞ্জাব অধিকার করেছিলেন একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, বোধহয় ১০২১-২২ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর ভয়েই পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের অনেক রাজা ও রাজপুত্র দেশত্যাগী হয়েছিলেন।

স্বাতি বলল : তাব মানে, তুমি বলতে চাও যে এই সময়ে হিমাচল প্রদেশের কোন রাজপুত্রও পালিয়ে তিব্বতে গিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে থাকতে পারে।

বললুম . সে ঘটনা নবম শতাব্দীর না হলেও হতে পারে। দশম শতাব্দীর শেষে বা একাদশ শতাব্দীর প্রথমে বললে আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে মিলে যায়। সে ক্ষেত্রে মৈনাকের রাজবংশকে কয়েক পুরুষ কমিয়ে দিলেই অঙ্ক মিলে যাবে।

কিন্তু ভারতের অন্যত্র না গিয়ে তিব্বতে যাবেন কেন ?

তারও একটা কারণ আছে।

বল।

বললুম : হিউয়েন চাঙ ভারতে এসেছিলেন হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে, অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে। অষ্টম শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি, বোধহয় ৭৩১ খ্রীস্টাব্দে যশোবর্মন তাঁর মন্ত্রীকে চীনের সম্রাটের কাছে পাঠিয়েছিলেন দূত হিসেবে। বাঙলায় পাল রাজাদের আমলে নালন্দা মহাবিহারে তিব্বত ও চীনের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বাঙলার অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে যান ১০৪০ খ্রীস্টাব্দে। সেখানে যে আদিম ধর্ম ছিল, তার বদলে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের নাম বৌদ্ধ ক-দম্ বা গে-লুক। লাসার নিকটে তাঁর সমাধি এখন একটি পবিত্র তীর্থ এবং তিনি সেখানে বুদ্ধের অবতার রূপে পুজো পাচ্ছেন।

স্বাতি বলল : তার মানে, তুমি বলতে চাইছ যে সে সময়ের ভারতবাসী তিব্বতকে বিদেশ বলে ভাবত না।

বিশেষ করে হিমালয়বাসীরা। তারা যেমন দক্ষিণে নেমে আসত, তেমনি উত্তরেও যেত নিজেদের প্রয়োজনে। হিমালয়ের মানুষ পণ্যদ্রব্য আদান প্রদান করতে হিমালয়ের দুদিকেই যাতায়াত করত স্বচ্ছন্দে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই হিমাচল প্রদেশের রাজপুত্রের তিব্বতে পলায়ন বা তিব্বত অভিযানের কথা ভাবতে হবে। বিশ-পঁচিশ পুরুষ পরে এই বংশেরই একজন সিকিমে রাজা হয়ে বসবেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বৌদ্ধ হয়েছিলেন বলেই এঁরা তিব্বতের সমর্থন পেয়েছিলেন। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে উত্তর বাঙলায় তখন এমন কোন শক্তি ছিল না যাঁর সমর্থনের প্রয়োজন ছিল।

স্বাতি বলল : আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে এ কথা মেলে ?

বললুম : সিকিমের এই ঘটনা ১৬৪২ সালের। দিল্লীর বাদশাহ তখন শাহজাহান, বাঙলার হুগলিতে পর্তুগিজরা তখন উপদ্রব করছে। ১৬৩২-এ শাহজাহান তাদের জয় করলেন। ১৬৫৮-য় ঔরঙ্গজেব বাদশাহ হবার পর মীর জুমলাকে বাঙলার সুবেদার নিযুক্ত করেন।

উত্তর বাঙলার কুচবিহারের রাজারা তখন কী করছিলেন ?

বললুম : ভাল প্রশ্ন। কুচবিহারের রাজকীয় অব্দের আরম্ভ ১৫১০ থেকে। বিশ্ব সিংহ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি ভুটান রাজের কাছ থেকে কর দাবী করেছিলেন। দেবরাজা কর দিতে অস্বীকার করলে তিনি ভুটান অক্রমণ করে ভুটানকে কর দিতে বাধ্য করেছিলেন। এঁর পুত্র নরনারায়ণ রাজত্ব করেছেন ১৫৮৭ পর্যন্ত। ছোট ভাই চিলারায় তাঁর সেনাপতি ছিলেন। এঁরা ভুটান থেকে মণিপুর পর্যন্ত নিজেদের অধিকারে আনেন। আসাম, কাছাড় ত্রিপুরা ও জয়ন্তীয়ার রাজারাও কুচবিহারের বশ্যতা স্বীকার করে। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই এঁদের ক্ষমতা কমতে থাকে। ১৬২৫-এর মধ্যেই ভুটান স্বাধীন হয় এবং ১৬৬৫-তে ভুটান কুচবিহার আক্রমণ করে।

স্বাতি বলল : তার মানে বুঝতে পারছি। ১৬৪২-এ সিকিমের রাজ্যাভিষেকের সময় কুচবিহার রাজার ক্ষমতা ফুরিয়ে গেছে। তাই তিব্বতের সমর্থনেই কাজ হয়েছে।

বললুম : আর একটা মনে রাখবার মতো কথা হল যে ভুটানেও এই সময়ে নামগিয়েল নামে এক রাজা ছিলেন। সিকিম ও ভুটানের নামগিয়েলরা একই বংশের লোক কিনা, তা খুঁজে দেখতে হবে।

স্বাতি অন্য কথায় চলে গেল, বলল : সেবারে সিকিম যাত্রার সময়ে এ সব কথা

আমরা জানতে পারি নি।

হেসে বললুম : তখন আমাদের মন-মেজাজ অন্য রকম ছিল।

কী রকম ?

দুর্ঘটনায় আমার হাত ভেঙেছে, আর আমাকে সামলাবার দায় ছিল তোমার ওপর। যতটুকু দেখেছি, ততটুকুতেই আমরা সন্তুষ্ট হয়েছিলুম।

হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম, গৌড় পর্বের জন্যে সিকিমের কথা জানবার দরকার নেই। গ্যাংটককেও টেনে আনতাম না। আমার মনে হয়েছিল যে হোটেলের ঘরে বন্ধ হয়ে থেকে তুমি যেন মুষড়ে পড়েছ। আর কালিম্পঙ শহরটা দেখতে হবে বলেই গ্যাংটকে তোমাকে টেনে এনেছিলাম।

বললুম : মনে আছে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলে তুমি। কিন্তু একটা কথা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।

কী কথা ?

ইতিহাস নিয়ে কেউ কচকচি করে নি বলে সে যাত্রাটা আমার ভালই লেগেছিল।

স্বাতি মাথা নেড়ে বলল : তা তো লাগবেই। সকালে দার্জিলিঙের হোটেলে ব্রেকফাস্ট করে আমরা একটা ল্যাণ্ড রোভারে যাত্রা করেছিলাম। সঙ্গে গাইড ছিলেন মিস্টার গিরি। পেশক রোড ধরে তিস্তা ব্রিজের দিকে আমরা নেমে এসেছিলাম।

বললুম . তিস্তা ব্রিজে পৌঁছোবার আগে ভিউ পয়েন্ট নামে এক জায়গায় এসে আমরা নেমেছিলুম। এক ধারে পাহাড়, অন্য ধারে খাদ। পথের বাঁ ধারে একটুখানি বিশ্রামের জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে যে দৃশ্য দেখেছিলুম, তার তুলনা নেই। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বয়ে আসছে একটি নদী।

স্বাতি বলল · আর একটি নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে আসছে।

একটির জল সবুজ।

আব একটির সাদা স্বচ্ছ টলটলে জল।

বললুম : চোখেব সামনেই দুই নদীর মিলন দেখতে পেয়েছিলুম। তাদের মিলিত ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল দক্ষিণে। মিস্টার গিরির কাছে শুনেছিলুম যে পূর্ব দিক থেকে রঙ্গিত এসে দক্ষিণবাহী তিস্তাব সঙ্গে মিলেছে। সঙ্গমেব পবেও এদের জলের রঙ বদলায় নি।

স্বাতি বলল : আরও একটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিলেন। রঙ্গিতের চেয়ে তিস্তার জল অনেক বেশি শীতল। তাব কারণ, রঙ্গিতের জন্ম হয়েছে নিম্ন হিমালয়ে, বৃষ্টির জলে তার পুষ্টি। আর তিস্তা বরফ-গলা জল আনছে তুষারাবৃত হিমালয়ের হিমবাহ থেকে।

আমি বললুম : এই ভিউ পয়েন্ট থেকে তিস্তাব পুল কত দূরে তোমার মনে আছে ?

না, পথের হিসেব আমি রাখি নি। তবে খুব কাছে বলেই মনে পড়ছে।

মাইল তিনেক পথ আমরা গড় গড় করে নেমে এসে তিস্তার বাজারে দাঁড়িয়েছিলুম। নদীর এ পারটা দোকানপাট আর লোকজনে সারাক্ষণ ব্যস্ত। শিলিগুড়ি থেকে বাস আসছে কালিম্পঙ ও গ্যাংটক যাবার জন্যে, দার্জিলিঙ থেকেও গাড়ি আসছে আমাদের মতো যাত্রী নিয়ে। বাসও বোধহয় আসে। সবাই এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। যাত্রীরা চা জলখাবার খায়, তিস্তার পুলের ওপরে উঠে চারি দিকের শোভা দেখে। এই পুলের নাম অ্যাণ্ডার্সন ব্রিজ। কোন থাম নেই নদীর মাঝখানে।

নদীও এখানে প্রশস্ত নয়। দু ধারের জমির ওপরে দুটি থামের ওপরে একটা বিরাট খিলান, তারই ওপরে পুল।

স্বাতি বলল : মনে আছে। পুলটা দুধারে বাড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে পথের সঙ্গে যোগ করা আছে। ওপারে দু দিকে যাবার পথ। ডান দিকে কালিম্পঙ। আমরা বাঁ দিকের পথ ধরে গ্যাংটকে গিয়েছিলাম। কিন্তু পথের দূরত্ব মনে পড়ছে না।

বললুম : সঠিক মাইল তো আমারও মনে নেই, তবে মোটামুটি মনে রেখেছি।

তাই বল।

দার্জিলিঙ থেকে তিস্তা ব্রিজ বাইশ মাইল, শিলিগুড়ি থেকে মাইল ত্রিশেক পথ। ইংরেজ আমলে এই পথেও দার্জিলিঙের মতো ক্ষুদে ট্রেন চলত। এখন আর সে ট্রেন নেই।

তারপর ?

তিস্তা ব্রিজ থেকে কালিম্পঙ দশ মাইল দূরে, আর গ্যাংটক প্রায় আটত্রিশ মাইল। সিকিম রাজ্যের সীমানা চোদ্দ মাইল দূরে রাঙ্গপো নদীর ওপাব থেকে।

স্বাতি বলল : মনে পড়ছে। রাঙ্গপো নদীর ওপরে লোহার পুল। আমরা এসে সেই পুলের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম।

বললুম : হ্যাঁ, পূর্ব দিক থেকে এই নদী এসে তিস্তার সঙ্গে মিলেছে। এপারে বাঙলা, ওপারে সিকিম। সব যানবাহন ও যাত্রীকে এপাবেই থামতে হয়।

স্বাতি বলল : ইণ্ডিয়ান টুরিস্ট শুনেই পুলিশ আমাদেব ওপাবে যেতে দিয়েছিল।

তার পর ?

সঙ্কীর্ণ পুল খুব সাবধানে পেরিয়ে নদীর ধারে ধারেই এগিয়ে যেতে হয।

হেসে বললুম : রাঙ্গপো নদীর তীর ধরে নয়। এই নদী পূর্ব দিক থেকে এসে তিস্তার সঙ্গে মিলেছে। আর রাঙ্গপোর তীর ধরে কিছু দূর এগোলেই রেনক নামের একটি ছোট শহরে পৌঁছনো যায়। বাঙলা ও সিকিমেব সীমানায এই শহব। কালিম্পঙ থেকে পাকা সড়কে পেডং হয়েও বেনকে পৌঁছনো যায়।

এবারে স্বাতি বলল : তারপর ?

বললুম : প্রথমে আমরা তিস্তার তীর ধরে উওরে এগিয়েছিলুম, তারপরে রঙ্গিনি নদীর তীর ধরে।

স্বাতি বলল : মনে পড়েছে। এই পাহাড়ী নদীটি রঙ্গিনীর মতো নেচে নেচে নীচে নামছিল। তাই দেখে আমাব কাশ্মীরেব কথা মনে পড়েছিল। পহলগামে যাবার সময়ে আমরা লীডার নদীকে এই রকম দেখেছিলাম।

হ্যাঁ। গ্যাংটকের কাছাকাছি এসে এই নদীকে আমরা হাবিয়েছিলুম। মিস্টাব গিবি বলেছিলেন, তিস্তা ব্রিজ থেকে শিলিগুড়িব দিকেও এই বকম। তিস্তাব ধারে ধারে পথ। কিন্তু বাঙলাব সঙ্গে সিকিমের প্রভেদ আমবা দেখতে পাই নি। বাঙলা মানে বাঙলার দার্জিলিঙ জেলা।

স্বাতি বলল : প্রভেদ থাকবে কী করে ? দার্জিলিঙ জেলা তো সিকিম রাজ্যেরই অধীন ছিল।

বড়লাটের ইচ্ছায় ছেড়ে দিতে হয়েছিল এই অঞ্চল। সিকিমপতি রাজা বড়লাটকে উপহার দিয়েছিলেন দার্জিলিঙ জেলা। দার্জিলিঙেব সঙ্গে সিকিমেব তাই কোন প্রভেদ নেই। মনে হয়েছিল যে একই পাহাড়ের ওপর দিয়ে আমরা চলেছি।

দুপুরের আহারের আগেই আমরা গ্যাংটকে পৌঁছে গিয়েছিলুম। বাজাব এলাকায়

এসে আমরা গাড়ি থেকে নেমেছিলুম। পাহাড়ের নীচে একটি সমতল ক্ষেত্রে বাজার, প্রশস্ত পথের দুধারে নানা পণ্যের দোকানপাট। পাহাড়ের ওপরেই ঘর বাড়ি আছে, ওপরে ওঠার পথও আছে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : গ্যাংটক শহরে আমরা কী দেখেছিলাম, মনে আছে তো?

লাঞ্চের পর আমরা শহর দেখেছিলুম আমার পেন ফ্রেণ্ড মণিবাবুর সঙ্গে, তাই না!

হ্যাঁ। তিনি আমাদের প্রথমেই নিয়ে গিয়েছিলেন পাহাড়ের ওপরে। যে পথে এসেছিলাম, সেই পথটাই অন্য ধারে এগিয়ে ডান হাতের পথ ধরে একেবারে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেল। প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর দৃশ্য।

দূর থেকে রাজার প্রাসাদ দেখে হতাশ হয়েছিলুম। পাহাড়ের কোলে একটি সুদৃশ্য দোতলা বাড়ি, ওপরে রঙীন ছাদ দেখার মতো। পাহাড়ী শহরে এই রকম বাড়ি আমরা অনেক দেখেছি বলে মনে হয়েছিল।

স্বাতি বলল : পথের ডান দিকে এই বাড়ি ছিল। আর একটুখানি এগিয়ে বাঁ দিকে দেখেছিলাম সিকিমের সেক্রেটারিয়েট বাড়ি। এর পেছনেই একটি সুন্দর বাগান, আর তার মধ্যে একটি চিড়িয়াখানার মতো আছে। ধাপে ধাপে নেমে সব দেখতে হয়।

এ সব দেখাবার আগে মণিবাবু আমাদের গোম্পা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। খানিকটা এগিয়ে একটুখানি ওপরে উঠে রাজপ্রাসাদের এলাকার মধ্যে এই গোম্পা। দোতলা বাড়ি, তার ছাদ দু থাক। বড় বড় জানালার ওপরে পর্দা। একটি বড় ঘরে প্রার্থনা সভার মতো ব্যবস্থা। দেওয়ালে বুদ্ধের জীবনের কাহিনী চিত্রিত। রাজপরিবারের সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া হয় এই গোম্পার মধ্যে।

স্বাতি বলল : হিমালয়ের দৃশ্য দেখবার জন্যে আমরা পথের অন্য প্রান্তে পলিটিকাল অফিসারের বাড়িতেও গিয়েছিলাম। মণিবাবু বলেছিলেন, সেখান থেকে হিমালয়ের দৃশ্য দার্জিলিঙের চেয়েও সুন্দর।

কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ আমরা দেখতে পাই নি। অথচ কাঞ্চনজঙ্ঘা হল সিকিমের সম্পত্তি।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : সিকিমের! নেপালের নয়?

বললুম : বিলেতে ছাপা অ্যাটলাস বই-এ কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সিকিমের শৃঙ্গ বলে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই শৃঙ্গটি নেপাল ও সিকিমের সীমানায়। মূল শৃঙ্গটি সিকিমে অবস্থিত হতে পারে, কিন্তু নেপাল ও সিকিমের আকাশ জুড়ে এই পর্বতশ্রেণী। অপরূপ তার রূপ।

কত উঁচু?

২৮১৪৬ ফুট।

স্বাতি চমকে উঠে বলল : এতো মাউণ্ট এভারেস্টের প্রায় কাছাকাছি!

বললুম : হ্যাঁ, মাত্র আটশো বিরাশি ফুট কম।

পাহাড়ের ব্যাপারে এ এমন কিছু তফাৎ নয়।

তবে একটা হিসেব শুনলে আরও বেশি আশ্চর্য হবে।

কী?

পঁচিশ হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু পর্বত শৃঙ্গ এক মাত্র ভারতেই আছে। পৃথিবীর আর কোন দেশে এত উঁচু পাহাড় নেই।

নামগুলো তোমার মনে আছে?

আছে। এক নম্বর এভারেস্ট, দু নম্বর মাউণ্ট কে-টু, অনেকে বলেন গডউইন

অস্টেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা তৃতীয়। তারপর মাকালু, নন্দপর্বত, নন্দা দেবী ও কামেত।

স্বাতি বলল : নেপালের কথায় তুমি এভারেস্ট অভিযানের কথা বলেছ। কাঞ্চনজঙ্ঘায় কি এ রকমের অভিযান হয় নি ?

হেসে বললুম : কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানের কথা কারও কাছে শুনি নি। শুধু এইটুকু জানি যে ১৯৫৫ সালে বৃটিশ অভিযাত্রী দল প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করে। এর মধ্যে একটা 'কিন্তু' আছে বলেও শুনেছি।

কী রকম ?

এঁরা নাকি এভারেস্টের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় পা রাখেন নি। কয়েক ফুট নীচে থেকেই নেমে আসেন।

কেন ?

তা ঠিক জানি নে। সিকিমের সেই ভদ্রলোক ফিরে এলে জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটা জেনে নেব।

ঠিক এই সময়েই ভদ্রলোককে দেখা গেল বাথরুমের দিকে যেতে। দরজার বাইরে থেকে বলে গেলেন : হাত ধুয়ে আসছি।

৯

আমরা কোন নতুন আলোচনা আরম্ভ করবার আগেই ভদ্রলোক রুমালে হাত মুছতে মুছতে ফিরে এলেন। বললেন : আপনাদের কী আলোচনা হচ্ছিল ?

স্বাতি আবার জানালার ধারে ঘেঁষে বসে বলল : বসুন।

ভদ্রলোক বসবার পর আমি বললুম : কাঞ্চনজঙ্ঘা নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন : সত্যি নাকি ! কাঞ্চনজঙ্ঘা আমাদের কাছে শুধু পাহাড় নয়, দেবতার মতো পবিত্র এক তীর্থ।

এই জন্যেই কি অভিযাত্রী দলকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গে আরোহণ করবার অনুমতি দেওয়া হয় নি ?

ঠিক ধরেছেন। অভিযাত্রী দলকে তাই কুড়ি ফুট নীচে থেকেই নেমে আসতে হয়েছিল।

বললুম : কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানের বিষয়ে কিছু বলুন।

স্বাতি বলল : কাঞ্চনজঙ্ঘা শব্দটির কোন মানে আছে নাকি ?

ভদ্রলোক বললেন : আছে বৈকি। কাঞ্চনজঙ্ঘার বানান বোধহয় লক্ষ্য করেছেন ! ইংরেজরা বলত কিঞ্চিনজঙ্গা। সিকিমের লেপচারা উচ্চারণ করে কিং দিয়ে, ইংরেজীতে King-tzum-song-bu। এই শব্দটির মানে, যা আমাদের মাথার ওপরে সবচেয়ে উঁচু। আর তিব্বতী নাম কাং দিয়ে—Khang-chhen-dzong-nga। খাং ছেন জং গার তিব্বতী মানে হল বিশাল বরফের পাঁচটি ভাণ্ডার।

স্বাতি বলল : এ রকমের অদ্ভুত নাম কেন ?

ভদ্রলোক বললেন : কাছে থেকে কিংবা খুব মনোযোগ দিয়ে এই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছেন কি ?

না।

এবারে সুযোগ পেলে দেখবেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গ একটি নয়, প্রায় সমান উচ্চতার কয়েকটি শৃঙ্গের সমষ্টি হল এই কাঞ্চনজঙ্ঘা।

সব শৃঙ্গগুলিরই কি একই নাম ?

না, তা নয়। দার্জিলিঙে নিশ্চয়ই জানু আর কাব্রু নাম শুনেছেন, কিংবা অবজরভেটরি হিলে যে ম্যাপ আছে তাতে দেখেছেন। অন্য শৃঙ্গগুলির নাম টুইন্‌স, তালুং, কাম্বচেন, কোকটাং, রাটোং, কাঞ্চনজঙ্ঘা ২, প্রভৃতি। এরই সঙ্গে চারটি গিরি শিরা ও চারটি হিমবাহ আছে। এই সব হিমবাহের নামও আছে—জেমু, তালুং, ইয়ালুং ও কাঞ্চনজঙ্ঘা। তিস্তার উৎস জেমু ও তালুং হিমবাহ, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ইয়ালুং হিমবাহ থেকে বেরিয়েছে তামুর কুশী নদী।

স্বাতি বলল : এ নদীর নাম আমি শুনি নি।

ভদ্রলোক সহাস্যে বললেন : এবারে বোধহয় বুঝতে পারছেন যে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে

তুষারের পাঁচটি ভাণ্ডার বা খাংচেন জংগা কেন বলা হয়।
বললুম : বুঝেছি। সিকিম থেকে বোধহয় পাঁচটি শৃঙ্গ দেখা যায়, তাই এই নাম হয়েছে। কিন্তু আমার আর একটা প্রশ্ন আছে।
বলুন।
সিকিম সরকার কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় পা রাখবার অনুমতি দেন নি, তাই অভিযাত্রী দলকে কুড়ি ফুট নীচে থেকেই নেমে আসতে হয়েছে। তাই না?
ঠিক তাই।
কাঞ্চনজঙ্ঘা কি সিকিম রাজ্যের অধিকারে?
আপনি বলবেন, নেপালের অধিকারে নয় কেন? এই তো?
কতকটা তাই।
ভদ্রলোক বললেন : কাঞ্চনজঙ্ঘার পশ্চিম ঢালে নেপাল আর সিকিম পূর্ব ঢালে। সিকিম থেকেই অভিযান হত বলে অনুমতি দিতেন সিকিম সরকার।
স্বাতি বলল : আর নেপালের অধিকারে তো মাউন্ট এভারেস্টই আছে। শুনেছি, তিব্বত থেকেও এভারেস্টে ওঠার চেষ্টা হয়েছে।
আর আমি বললুম : এইবারে অভিযানের কথা বলুন।
ভদ্রলোক একটু ভেবে বললেন : এক সময়ে মনে করা হত যে কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করা অসম্ভব। পর্বতারোহণের জন্যে এই শৃঙ্গটি অত্যন্ত দুর্গম বলে সবার ধারণা ছিল। তবু অভিযাত্রীরা ১৯০৫ সাল থেকেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সে বছর অভিযাত্রী দলের নেতা ছিলেন অ্যালেস্টার ক্রাওলি। তিনি ইয়ালুং ঢাল দিয়ে শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আকস্মিক ভাবে তুষারপাতে চারজন অভিযাত্রীকে হারিয়ে নেমে আসেন। এর পর চেষ্টা হয়েছিল ১৯২৯, ৩০ ও ৩১ সালে। ১৯২৯ সালের জর্মন অভিযান ব্যর্থ হবার পর ১৯৩০ সালে অভিযাত্রীরা ২১,০০০ ফুট উঠে নেমে আসেন।
কেন?
সেবারেও আকস্মিক তুষারপাতের জন্য অভিযাত্রীরা শেরপা শেতানকে হারিয়েছিলেন।
তারপর?
জর্মন অভিযাত্রী দলের নেতা বাউআর ১৯২৯-এ ব্যর্থ হবার পর ১৯৩১-এ আবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা ২৫,২৬০ ফুট পর্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন। এরপর চব্বিশ বছর আর কোন চেষ্টা হয় নি। ১৯৫৩ সালে এভারেস্ট জয়ের পর দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগিয়ে এলেন বৃটিশ অভিযাত্রী দল। এর নেতা ছিলেন চার্লস ইভান্স। এঁরা দুবার শৃঙ্গের কাছাকাছি পৌঁছোন। কিন্তু সিকিম সরকারের অনুরোধে শৃঙ্গের উপরে পা না দিয়ে কুড়ি ফুট নীচে থেকেই নেমে আসেন।
তারপর?
ভদ্রলোক বললেন : তার পরের খবর আর রাখি নি।
স্বাতি বলল : এর বেশি জানার দরকারও নেই। জানার চেষ্টাতেই যদি সব অধ্যবসায় ফুরিয়ে যায় তো জানার আনন্দ উপভোগ করবে কে?
আমি বললুম : আপনি আমাদের ইতিহাসের কথা বলছিলেন। বেশ ভাল লাগছিল সেই কথা।
ভদ্রলোকের মনে ছিল, বললেন : ফুনছোগ নামগিয়েলের কথা বলেছিলাম।

তিনিই দেনজঙের প্রথম ছোগিয়েল।

স্বাতি বলল : ছোগিয়েল!

ছোগিয়েল মানে রাজা। এখনও এই শব্দটির ব্যবহার আছে। আর নামগিয়েল হল বংশের নাম। সব রাজাই নামগিয়েল। শেষ রাজার নাম ছোগিয়েল পলদেন থোনদুপ নামগিয়েল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক বললেন : প্রজাদের চাপে তিনি রাজ্য হারালেন। আর—

বলুন।

আর সিকিম হারাল তার দীর্ঘ দিনের স্বাধীনতা।

আমি বললুম : এতে কি প্রজাদের মঙ্গল হবে না?

থাক সে আলোচনা।

বলে ভদ্রলোক বললেন : দুশো বছর আগে সিকিমের অবস্থা অনেক ভাল ছিল। অনেক বড় ছিল রাজ্য। ধীরে ধীরে এই রাজ্যের আয়তন কমেছে। প্রতিবেশী শক্তিগুলির সঙ্গে বিবাদেই সিকিম একে একে হারিয়েছে রাজ্যের অনেক অংশ। কিছু তিব্বতে গেছে, কিছু নেপালে, কিছু ভুটানে। কিছু ভারতের ভাগেও পড়েছে। কিন্তু সিকিম তা যুদ্ধ বা বিবাদে হারায় নি, দান করেছে। সিকিমকে সাহায্য করার পর ভারতের বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক তা সিকিমের রাজার কাছে চেয়ে নিয়েছেন। দার্জিলিঙ জেলাটি ইংরেজকে দান করে সিকিমের আর এক বিপদ হয়েছিল। তিব্বত চিরকালই সিকিমকে নিজের অনুগত বলে জানত। ইংরেজের সঙ্গে বন্ধুতা করতে দেখে তারা চটে গেল, শাস্তির ব্যবস্থা করল সিকিমবাসীর।

কী শাস্তি?

তিব্বতের রাজধানী লাসা ছিল বৌদ্ধ লামাদের প্রধান তীর্থ। সিকিমের লামারা সেখানে যাতায়াত করত। ইচ্ছে মতো সেখানে যাওয়া তাদের নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সিকিমের রাজা আট বছরে মাত্র একবার লাসায় যেতে পারবেন, এই ব্যবস্থা হল।

এ তো বিপদের কথা!

বিপদ দু দিকেই। মানে উভয় সঙ্কট। নেপালের সঙ্গে সিকিমের সীমান্ত নিয়ে বিবাদ মেটাতে এসে ইংরেজ এই দার্জিলিঙের সন্ধান পেয়েছিল ১৮২৪ সালে রাজা ছুগফুদ নামগিয়েলের আমলে। তিনি ভেবেছিলেন ক্যাপ্টেন লয়েডকে এই দার্জিলিঙ পাহাড়টা দিলে এর পরিবর্তে তিনি দেবগঙ অঞ্চলটা পেয়ে যাবেন। কিন্তু বন্ধুতার বদলে শত্রুতার সূত্রপাত হল নানা কারণে। ডক্টর ক্যাম্পবেল ও ডক্টর হুকার নামে দুই উদ্ভিদবিদকে সিকিমে বন্দী করার জন্যে বিবাদ বেধে গেল। এর উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্যে ইংরেজ সিকিম আক্রমণ করল পর পর দুবার। ১৮৬১তে যে সন্ধি হল, তাতে ইংরেজ পাকাপাকি ভাবে দার্জিলিঙ পেয়ে গেল। এই সন্ধিপত্রে সই করলেন যুবরাজ, রাজা তখন চুম্বি উপত্যকায়। চুম্বি উপত্যকা তখনও ছিল সিকিমের অধীনে, আর সিকিমের রাজধানী ছিল তুমলুঙে।

তারপর?

ইংরেজের সঙ্গে সিকিমের বিবাদ চরমে ওঠে ছোগিয়েল থুতোব নামগিয়েলের আমলে। তাঁর রাজত্বকাল ১৮৭৪ থেকে ১৯১৪। এই সময়ে ইংরেজ তিব্বতে বাণিজ্যের পথ খুঁজছিল। কিন্তু তিব্বত রাজী হচ্ছিল না আর ইংরেজ সিকিমের সাহায্য চাইছিল। ইংরেজের দুটো তিব্বত অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল আগে। ক্লড হোয়াইট নামে

এক ইংরেজের হাতে সিকিমের রাজারানী অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছিলেন।

তারপরেই ভদ্রলোক বললেন : স্কুলের পড়া বিদ্যে তো, সব কথা ভাল মনে নেই। তবে দার্জিলিঙ যে সিকিমের অধীন ছিল, তা আপনারা জানেন। কিন্তু জানেন না যে কালিম্পঙ ও রেনকও সিকিমের ছিল, ছিল চুম্বি উপত্যকাও।

স্বাতি বলল : পরস্পরের মধ্যে এত বিবাদ হত কেন ?

ভদ্রলোক বললেন : এর একটাই কারণ আছে বলে আমার মনে হয়।

কী কারণ ?

দ্বিতীয় রাজা তেনসুঙ্গ নামগিয়েল তিনটি বিয়ে করেছিলেন—ভুটান তিব্বত ও এক জং কন্যাকে। এঁদের সন্তানরাই বিবাদ আরম্ভ করে। পরবর্তী রাজারা বিবাহ করতেন প্রতিবেশী রাজা বা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের কন্যাকে। তাঁরা সিকিমের রাজনীতিতে ঢুকে পড়ত। অর্থাৎ সিকিমের সিংহাসনের দাবীদাররা তাঁদের মাতৃকুলের সাহায্য চাইতেন। নেপালের রাজা পৃথ্বি নারায়ণ সিং রাজ্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন, তিব্বত চেয়েছিল ধর্মীয় অধিকার, আর ইংরেজ তাদের বাণিজ্যের সুযোগ। এই সবের পরিণাম তো দেখতেই পাচ্ছেন। বিবাদে সবার লাভ হয়েছে, হারিয়েছে শুধু সিকিম। আর দুনিয়ার নিয়মে রাজাও তাঁর রাজত্ব হারালেন।

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

এই নিয়ে তাঁর মনে যে একটা বেদনা আছে তা আগেই বুঝতে পেরেছিলুম। তাই কোন মন্তব্য করলুম না। ভদ্রলোক নিজেই বললেন : দাস প্রথা তো অনেক দিন আগেই উঠে গেছে, জমিজমাও আর বেশি দিন থাকবে না। সবার সব কিছু যাবে।

স্বাতি বলল : সবচেয়ে দুঃখের হবে মানুষের মনুষ্যত্ব কেড়ে নিলে। সেটাই মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর বললেন : খুব বড় কথা বলেছেন।

আমি বললুম : এইবারে সিকিমে দেখবার কী আছে তাই বলুন।

কিসে আপনাদের ইন্টারেস্ট্ বলুন।

স্বাতি বলল : আমাদের ইন্টারেস্ট্ সব বিষয়েই। কোন নতুন জায়গায় গিয়ে যা কিছু দেখে আনন্দ পাওয়া যায়, তাই আমাদের ভাল লাগে।

আমি বললুম : জানার কথা জানবার আগ্রহও আমাদের বেশি। আমরা জাত টুরিস্ট।

ভদ্রলোক একটু বিষণ্ণ ভাবে বললেন : বিদেশী টুরিস্ট্রা নানা মতলব নিয়ে আসে।

কী রকম ?

থাক সে সব কথা।

তবে দেশী টুরিস্টদের ইন্টারেস্টের বিষয়েই বলুন।

তারা আসে ফুর্তি করতে। তারা দার্জিলিঙ অনেকবার দেখেছে, কালিম্পঙও দেখা হয়েছে। এখন গ্যাংটকে এসে দিন কয়েক ফুর্তি করে যায়। এদের জন্যে গ্যাংটকে এখন তিন চারটে হোটেল হয়েছে। আরও হবে। শুনে আশ্চর্য হবেন, বাঙালী হোটেলও হয়েছে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল : সেবারে তো আমরা—

হোটেলে রাত্রিবাসের কথা আমার মনে আছে। বললুম : আমরা একটা পুরো দিনও ছিলুম না, তাই বিশেষ কিছুই দেখতে পাই নি।

ভদ্রলোক বললেন : শহরটাই বোধহয় দেখেছেন, আশে পাশে যে সব দেখবার জায়গা আছে, তা নিশ্চয়ই দেখেন নি।

না, সময় পাই নি আমরা।

সময় পেলেও যেতেন না।

স্বাতি এবারে প্রতিবাদ করে বলল : একটা দুর্ঘটনায় ওর বুকের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। তাই আমাদের শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার ট্রেন ধরতে হয়েছিল।

ভদ্রলোক একেবারে চুপসে গিয়ে বললেন : আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কী ভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছিল ?

আমি বললুম : পাহাড়ের গায়ে জীপের ধাক্কা লেগেছিল। ড্রাইভারের দোষ নেই। কুয়াশায় দেখা যাচ্ছিল না কিছু, আর উল্টো ধার থেকে আর একটা গাড়ি এসে ঘাড়ে পড়েছিল। আমরা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছিলুম বলেই অন্য গাড়িটা খাদে পড়ে যায় নি।

ভদ্রলোক সহানুভূতিব সুরে বললেন : পাহাড়ে এই রকম হয়।

তারপর বললেন : এখন তো ভাল আছেন, এখন একবার আসুন। খবর দিলে আমি আপনাদের সব দেখিয়ে আনব।

স্বাতি বলল : কী দেখাবেন ?

ভদ্রলোক বললেন : আপনারা নেপালে বা ভুটানে গেলে শুনেছি যে সেখানকার পুরনো রাজধানীগুলো দেখেন। কিন্তু সিকিমে এলে শুধু গ্যাংটক দেখেই ফিরে যান। অথচ এখানেও অনেকগুলো রাজধানী আছে।

আমরা তো নামই জানি না ! বলুন না সে সব রাজধানীর নাম।

দেশেব রাজারা তো এই অঞ্চলে এসে প্রথমে ইয়াটুঙে বসবাস করতেন। ইয়াটুঙ অবশ্য এখন আর সিকিমের অধীনে নয়।

কেন ?

চুম্বি উপত্যকা এখন তিব্বতের অধীন। চুম্বিথাঙ নামে আর একটা জায়গা আছে ইয়াটুঙের পথে। প্রথম রাজা ফুনছোগ জন্মেছিলেন গ্যাংটকে, আর ইয়াটুঙ থেকে সরে এসেছিলেন ইয়োকসামে। দ্বিতীয় রাজা তেনসুঙ সবে যান রাব্‌ডেনছে। আর গ্যাংটকেব আগে রাজধানী ছিল আমাদের তুমলুঙে। তুমলুঙ তো দূরে নয়, একদিনেই সেখান থেকে ঘুরে আসতে পারবেন।

জাযগাটা কোন দিকে ?

উওবে পেনলোঙ লা পেরিয়ে ওপারে যেতে হয।

লা মানে তো পাস ? গিরিপথ ?

ভদ্রলোক সহাস্যে বললেন : ভয় পাবেন না এ লা মাত্র ছ হাজার দুশো পঞ্চাশ ফুট উঁচু। গ্যাংটকের উচ্চতা জানেন তো ? পাঁচ হাজার আটশো ফুট। আর গ্যাংটক থেকে দূরত্ব তেরো মাইল। পথ কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায় নি, উত্তরে টুং হয়ে ছুংতাঙ গেছে। সেখান থেকে দুটো পথ গেছে তিব্বতের দিকে লাচেন ও লাচুঙ নদীর উপত্যকা ধরে। লাচেন উপত্যকায় যোল হাজাব ফুটেরও বেশি উঁচুতে কাঙরা লা ও সেবু লা পেবিয়ে তিব্বত। লাচুঙ উপত্যকায আঠাবো হাজার ফুট উঁচুতে ডংকিয়া লা পেরোলে তিব্বতের সীমান্ত। এই অঞ্চলে সতেরো হাজার ফুট উঁচুতে চোলামা লেক দেখবার মতো যাত্রী সিকিমে আসে না। দুই উপত্যকার মাঝে কাঞ্চন ঝাউ নামে একটি পর্বত শৃঙ্গ ২২,৭০০ ফুট উঁচু। এই রকম উচ্চতার শৃঙ্গ সিকিমে আরও কয়েকটি আছে। নেপাল ও সিকিমের সীমানায় কাঞ্চনজঙ্ঘার দক্ষিণে কাব্রু চব্বিশ হাজার ফুট,

তার পূর্বে পন্দিম, উত্তরে সিম্বু, সিনিয়লচু, চোমিওমা বাইশ হাজারের কিছু বেশি। পন্দিমের দক্ষিণে জুবোনু ও নরসিং শৃঙ্গ বিশ হাজারের কম।

ভদ্রলোকের ভূগোলের জ্ঞান দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছিলুম। স্বাতি সে কথা জানতে চেয়ে বসল। বলল : সিকিমের ভূগোল আপনি গুলে খেয়েছেন দেখছি!

ভদ্রলোক হাসলেন। তারপর বললেন : উপায় ছিল না।

কেন?

লেখাপড়া শেষ করে স্কুলে একটা চাকরি পেয়েছিলাম। ভূগোল পড়াতে হত। ব্ল্যাক বোর্ডে সিকিমের একটা বড় ম্যাপ টাঙিয়ে ছেলেদের সব বোঝাতে হত। কিছু দিন পরে দেখলাম, ম্যাপের আর দরকার নেই, নিজেই ম্যাপ এঁকে সব দেখিয়ে দিতে পারি।

স্বাতি বলল : এই জন্যেই আপনি সব বলতে পারছেন।

আমি বললুম : আপনার তুমলুঙে কী দেখবার আছে?

এখন সেখানে ফোদং গোম্পা দেখতে পাবেন। সিকিমের চুয়াল্লিশটা গোম্পার মধ্যে যে পাঁচটি বিখ্যাত, তার মধ্যে তুমলুঙের ফোদং গোম্পা একটি। গ্যাংটকের আট মাইল দূরে রুমটেক গোম্পা আর একটি।

বাকি তিনটে কোথায়?

সে তিনটে দূরে, কিন্তু পরস্পরের কাছাকাছি। দার্জিলিঙ থেকে গ্যাংটকে আসবার পাহাড়ী পথে এই সব গোম্পা দেখা যায়। ইচ্ছে করলে আরও অনেক ছোট ছোট গোম্পাও এই অঞ্চলে দেখতে পাবেন।

স্বাতি জিজ্ঞেস করল : আপনি দেখেছেন?

ভদ্রলোক হেসে বললেন : দেখেছি।

তবে পথঘাটের কথা আমাদের বলুন না।

দার্জিলিঙ থেকে গ্যাংটকে আসবার যে চার পাঁচটা পথ আছে, তা বোধহয় শুনেছেন।

বললুম : মনে নেই।

ভদ্রলোক বল্‌লেন: দার্জিলিঙ থেকে অনেকেই আজকাল নেপাল সীমান্তে সন্দক্‌ফু ও ফালুটে বেড়াতে যাচ্ছেন। সেখান থেকে আরও উত্তরে নেপাল সীমান্তেই চিয়াভঞ্জন যেতে হবে, তারপর পূর্ব মুখে ডেনতাম হয়ে সাঙ্গছেনিং,। পামিয়ঞ্চি ও তাশিডিং। দ্বিতীয় পথ হল দার্জিলিঙ থেকে রুম্মম নদীর ওপর সাসপেন্স ব্রিজ পেরিয়ে চাকুং, সেখান থেকে রিনচিনপঙ গোম্পা হয়ে পামিয়ঞ্চি।

তৃতীয় পথ?

দার্জিলিঙ থেকে মাঞ্জিটারে এসে গ্রেট রঙ্গিত নদী পার হবেন সাস্‌পেন্স ব্রিজের ওপর দিয়ে। সেখান থেকে নামচি হয়ে টেমিতে আসুন। গ্যাংটকের পথ সোজা হয়ে টেমি এসেছে তিস্তা পেরিয়ে। এই মিলিত পথই পামিয়ঞ্চির পথ। এরই কাছাকাছি সঙ্গছোলিঙ, তাশিডিং ও রালোং গোম্পা। বৌদ্ধ ধর্মে অনুরাগ থাকলে এই সব গোম্পা আপনাদের দেখতেই হবে। আর—

বলুন।

গ্যাংটকের নামগিয়েল ইনস্টিটিউট অব টিবেটোলজিও দেখতে হবে সাগ্রহে। বৌদ্ধ ধর্ম শিখবার প্রতিষ্ঠান।

এর নাম টিবেটোলজি হল কেন?

তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মই যে সিকিমের রাজধর্ম। মহাযান ধর্মেরই একটা ভিন্ন রূপ। একে আপনারা লামা ধর্ম বলতে পারেন।

হঠাৎ তাঁর নিজের হাতের ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই ভদ্রলোক চমকে উঠে পড়লেন, বললেন : আপনাদের ডিনারের খুব দেরি করিয়ে দিলাম!

স্বাতি বলল : বসুন না, আমরা এক সঙ্গেই খাই।

ভদ্রলোক কিছু লজ্জিত ভাবে বললেন : মাপ করবেন, খাবার জন্যেই আমি উঠে. গিয়েছিলাম। খেয়ে নিয়েছি। গুড নাইট।

বলে বিদায় নিলেন।

হাত মুখ ধুয়ে এসে আমরা খেয়ে নিলুম। তারপর শোবার আয়োজন করলুম। কাল ভোরে উঠে ট্রেনেই সারাদিনের জন্যে তৈরি হতে হবে।

আমার বিছানা পাতা হয়েছিল উপরের বাঙ্কে, নীচের বার্থে স্বাতি। আমি উঠে শোবার পরে স্বাতি বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু সহসা আমার চোখে ঘুম এল না। সেবারে গ্যাংটকের হোটেলে রাত কাটাবার কথা আমার মনে পড়ে গেল।

আমরা তিনজন ছিলুম। মিস্টার গিরি বোধহয় আমাদের জন্যে একখানা ঘর ঠিক করেছিলেন। দ্বিতীয় ঘর পাওয়া যায় নি বলে তিনি অন্য ব্যবস্থা করতেন নিজের জন্যে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, রাত কাটাবার মতো জায়গা পাওয়া গেল?

তিনি হ্যাঁ বললেন না, না-ও বললেন না। বললেন : হবে একটা ব্যবস্থা।

স্বাতি বলেছিল, কী রকম ব্যবস্থা শুনি!

মিস্টার গিরি বলেছিলেন, আপনাদের জন্যে একটা তিন বেডের ঘর পাওয়া গেছে। আমার জন্যে ভাবনা নেই।

স্বাতি বোধহয় অপরিসীম খুশী হয়েছিল এই সংবাদে। বলেছিল : তা হলে তো ভালই হল। আমরা তিনজনেই এক ঘরে থাকতে পারব।

মিস্টার গিরি পরম বিস্ময়ে তাকিয়েছিলেন স্বাতির মুখের দিকে, আর সে বলেছিল, ট্রেনের কামরায় আমরা চারজন থাকি না!

আমি সহাস্যে বলেছিলুম : থাকি বৈকি!

আজ আমার হাসি পেল এই পুরনো কথা মনে করে। স্বাতি এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোয় এক সঙ্গে।

১০

ভোরবেলায় সময় মতোই আমাদের ঘুম ভেঙেছিল এবং ট্রেনও সময় মতো নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছে গেল। আমার ইচ্ছে ছিল যে স্টেশন থেকে বেরোবার আগে ফেরার রিজার্ভেসন দেখে নেব রিজার্ভেসন অফিসে। কিন্তু স্বাতি বলল : না, স্টেশনে সময় নষ্ট করলে চলবে না। ভুটান সরকারের বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে টিকিটের জন্যে লাইন দেবার দরকার বেশি।

কিন্তু ফেরার সময়ে যদি রিজার্ভেসন না পাই?

আগে তো এ রকমের ভাবনা আমরা ভাবি নি!

তাহলে বলব, বয়েস বেড়েছে, বয়েসের সঙ্গে ভাবনাও।

স্বাতি বলল : অভিজ্ঞতাও কি বাড়ে নি? সেই দিনই ফিরতে হবে, এমন কোন দায় আমাদের নেই। ছুটি ফুরোবে না। ফিরে এসে রিজার্ভেসন না পেলে আর একবার সিকিমে বেড়াতে যাব টিকিটের ব্যবস্থা করে।

বললুম : বুদ্ধিটা মন্দ নয়। মণিবাবুর সঙ্গে আব একবার দেখা হয়ে যাবে।

কাজেই আমরা ট্রেন থামতে না থামতেই মালপত্র নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলুম। নতুন স্টেশন, বেশ বড়সড় ব্যাপার। দোতলায় বোধহয় অনেক কিছু আছে। কিন্তু সে দিকে না তাকিয়ে আমরা একখানা অটো রিক্সায় চেপে বসলুম এবং শহরের ভেতর দিয়ে ছুটে চললুম বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে।

সেবারে আমরা শহরটা দেখবার সুযোগ পাই নি। এবারেও সে সুযোগ পাওয়া গেল না। শুধু এইটুকু বোঝা গেল যে শহরটা আরও বেড়েছে, দিনের বেলায় জমজমাট হয়ে উঠবে। পথঘাট নির্জন বলে শহরের সমৃদ্ধি ভাল বোঝা যাচ্ছে না।

এক জায়গায় এসে অটো রিকসার গতি মন্থর হল এবং তারপরেই একটি গলির মতো পথে ঢুকে পড়ল। একটুখানি এগিয়েই বোঝা গেল যে আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে গেছি। একটি ছোট কম্পাউণ্ডের ভেতরে দু তিনখানা বাস দাঁড়িয়ে আছে। একখানা ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে। যাত্রীরা এসেছে, মালপত্র উঠেছে বাসের ছাদে। সিকিমের ভদ্রলোককে আমরা আর দেখতে পাই নি। পরিচিত কেউ ছিলেন না। তাই একটা জানালার কাছে ভিড় দেখে আমি এগিয়ে গেলুম স্বাতির কথায়। স্বাতি বলল : তুমি লাইনে দাঁড়িয়ে যাও, ভাড়া মিটিয়ে আমি আসছি।

বাসের দিকে চেয়ে মনে হল যে টিকিট বোধহয় পাওয়া যাবে না। যাঁরা বাসের ভেতরে বসে আছেন, তাঁদের দেখেই এ কথা মনে হল। তবু আমি লাইনে দাঁড়ালুম। স্বাতি এসে আমার পাশে দাঁড়াল।

কিন্তু বিধাতা বুঝি আমাদের সঙ্গে পরিহাস করলেন। আমার নম্বর যখন এল, তখন আর একখানি মাত্র টিকিট বাকি। কাউন্টারের ভেতর থেকে ভদ্রলোক বললেন :আর একটি সীট আছে, দুখানা টিকিট পাবেন না।

স্বাতি মিনতি করে বলল · অনেক দূর থেকে আমরা এসেছি, আমাদের নিরাশ করবেন না।

ভদ্রলোক ইংরেজীতে বললেন : কিন্তু আমি কী করতে পারি বলুন !

আমরাই বা তাহলে কী করি ?

পরের বাসের জন্যে অপেক্ষা করুন।

খানিকটা তফাৎ থেকে কে একজন বললেন : নিয়ে নিন একখানা টিকিট।

আমি আর দ্বিধা না করে একখানা টিকিট নিয়ে নিলুম, আর স্বাতি এগিয়ে গেল সেই ভদ্রলোকের কাছে। তিনি কোন্ অঞ্চলের মানুষ তা বোঝাব উপায় নেই। মাথায় একটা পাহাড়ী টুপি। তা নেপাল, ভুটান না সিকিমের, তা বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই। এঁদের পোশাকে হয়তো প্রভেদ আছে, কিন্তু টুপি বা চেহারা দেখে চিনবার কোন উপায় আছে কিনা আমাদের জানা ছিল না। ভদ্রলোকের বেশবাস সমতলের মানুষের মতোই—প্যান্টের ওপরে একটা ফুল হাতের সার্ট পরেছেন, হাতে একটা ব্রীফকেশ। সঙ্গে আর কোন মালপত্র নেই। বাসের একখানা টিকিট হাতে নিয়ে আমি কাউন্টারের ভদ্রলোককেঁ জিজ্ঞেস করলুম : একখানা টিকিটে আমাদের দুজনের কী করে হবে ?

ভদ্রলোক বললেন : সে আপনারাই জানেন।

বলে তিনি অন্য কাজে মনোনিবেশ করলেন। আর আমি স্বাতির দিকে এগিয়ে গেলুম। স্বাতি আমাকে দেখেই বলল : ইনি আমাদের মালপত্র ছাদে তুলে দিতে বলছেন।

তারপর আমাদের একজনকে নামিয়ে দিলে কী হবে ?

স্বাতি বলল : একজন চলে গিয়ে আর একজনের অপেক্ষা করব।

ভদ্রলোক হাসছিলেন, বললেন : দুজনেই বাসে উঠে বসুন না। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।

কিন্তু কী ভাবে হবে ?

ভদ্রলোক বললেন : ভয় নেই, আপনাদের কাউকে নামতে হবে না। দরকার হলে আমি নেমে যাব, আমার টিকিট আছে।

স্বাতি বলল : না না, এ কোন ভাল ব্যবস্থা নয়। আমাদের জন্যে আপনি কেন নেমে যাবেন !

তবে আপনাদের টিকিটখানা দিন। আমি বেচে দিচ্ছি। দুজনেই অপেক্ষা করুন পরের বাসের জন্যে।

বলে এক রকম জোর করেই মালপত্র ছাদে তুলে দিয়ে আমাদেরও বাসে উঠিয়ে দিলেন। বললেন : দুটো সীট দখল করে বসে যান।

আমরা আর প্রতিবাদ না করে তাঁর আদেশ পালন করলুম।

বাস খুব আরামপ্রদ নয়। খুব খারাপও নয়। নেপালের বাসের কথা আমার মনে পড়ে গেল। সে বাসে দীর্ঘ সময় বসে থাকা খুবই কষ্টকর ছিল। বাসগুলো আকারে ছোট, কিন্তু আসনের সংখ্যা বেশি। সারিগুলো কাছাকাছি বলে পা ছড়িয়ে বসার উপায় ছিল না, হাঁটু ঠেকে যাচ্ছিল সামনের সীটের সঙ্গে। তাই আমার বন্ধু বিনয় খুবই রেগে গিয়েছিল। আর নির্বিকার ছিল গোরখপুরের বাঙালী ছেলে পরমানন্দ। তাদের কথাবার্তাও আমার মনে পড়ছিল। কিন্তু স্বাতি বসেই আমাকে বলল : ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না !

বললুম : কোন্ ব্যাপার বলতো !

যিনি আমাদের উঠে বসতে বললেন, তিনি বাসের কোন কর্তাব্যক্তি, না আমাদের মতো যাত্রী ?

বললুম : বাসের কর্মকর্তা নন, হলে তাঁর নিজের টিকিট থাকত না।

টিকিট না থাকলেও একটা সীট হয়তো রিজার্ভ করা আছে।

সীট রিজার্ভ করার ব্যবস্থা থাকলে আমাদের ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।

কী রকম করে ?

আমরা একজন ওয়েটিং লিস্টে আছি। কোনও যাত্রী সময় মতো এসে পৌঁছতে না পারলে আর একখানা টিকিট পেয়ে যাব। কিংবা বাসে দাঁড়িয়ে যাওয়া চলতে পারে। সে যাই হোক। ওঠা যখন গেছে, তখন বসেই থাকব।

স্বাতি বলল : ভদ্রলোকের পরিচয় জেনে নেওয়া আমাদেব উচিত ছিল।

সুযোগ পেলেই জেনে নেব। কিন্তু সে কথা বলা যাবে না।

কেন ?

সিকিমের সেই ভদ্রলোকের পরিচয়ও তো জেনে নিয়েছিলুম। তাঁর কলকাতার ঠিকানাও। কিন্তু তা প্রকাশ করে তাঁকে বিপদে ফেলা উচিত হবে না।

বিপদ কিসের ?

কিষণগড়ের ডাক্তারবাবুর কথা মনে নেই ! তাঁর নামধাম লেখার জন্যে কী রকম বিপদ হয়েছিল তাঁর। বাঙালীরা গিয়ে তাঁর অতিথি হত।

তিনি তো অতিথি আপ্যায়ণ করতে ভালই বাসতেন !

বললুম : সবাই তো তাঁর মতো নয় যে জ্বালাতন করলে খুশী হবেন বাঙালী বলে ! তাই আজকাল আর আসল নামটা বলি না। সিকিমের পেন ফ্রেণ্ডের নামটাও বদলে দিয়েছি। তা না করলে অনেকেই হয়তো তাঁর অতিথি হতে চাইতেন। কিছু বলা যায় না তো !

স্বাতি বলল : অনেকেই ভাবতে পারে যে তোমার চরিত্রগুলো সবই কল্পিত। গল্পের প্রয়োজনে তুমি এঁদের আমদানি করেছ !

পাঠকেরা তো আমাদেরও কল্পিত ভাবতে পারে ! তাদের ভাবনার ওপরে তো আমার দখল নেই। কাজেই দুদিক সামলানো সম্ভব নয়।

এই সময়ে নীচের কিছু যাত্রী বাসে উঠে পড়লেন এবং বাসের ভিতরে ঠেলাঠেলি হতে লাগল। স্বাতি ঘড়ি দেখে বলল : সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।

এক সময়ে বাসের ড্রাইভার এসে তার আসন অধিকার করে বসল, হর্ন বাজিয়ে জানিয়ে দিল যে বাস এবারে ছাড়বে। তারপর কণ্ডাক্টরের সংকেত পেয়ে যাত্রা শুরু করল। আমাদের কাউকেই নামিয়ে দিল না। কেউ টিকিটও চাইল না। কণ্ডাক্টর আমাদের আর একখানি টিকিট দিল অনেকখানি এগিয়ে যাবার পরে। বাসে অনেক যাত্রী দাঁড়িয়েও চলেছেন। পরে দেখতে পেলুম যে মাঝে অনেক জায়গায় এই বাস দাঁড়াচ্ছে এবং যাত্রী ওঠা-নামা করছে। যাত্রীরা এ পথে দাঁড়িয়ে থাকতে অভ্যস্ত এবং যিনি আমাদের উঠে বসবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাকে এই ভিড়ের মধ্যে দেখতে পেলুম না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা শহর ছেড়ে এলুম এবং প্রশস্ত রাজপথ ধরে ছুটে চললুম। স্বাতি জানালার ধারে বসেছিল। এক সময়ে বলল : এ বোধহয় ন্যাশনাল হাইওয়ে।

বললুম : শিলিগুড়ি থেকে উত্তরে সিকিম ও পূর্বে আসামের দিকে ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে জানি, ম্যাপে তার নম্বরও খুঁজে বার করতে পারব। কিন্তু এই পথই ন্যাশনাল হাইওয়ে কিনা বলতে পারব না।

এই পথ হিমালয়ের কোল ঘেঁষে চলছে না। হিমালয় এখান থেকে অনেকটা দূরে। মাঝে মাঝে বাঁ দিকের জানালা দিয়ে দূরের দিগন্তে তার নীল ছায়া দেখতে পাচ্ছি। সম্পূর্ণ অপরিচিত পথ। এর আগে আমরা ট্রেনে আসামের দিকে গিয়েছি। সেই সময়েই জেনেছি যে এখন আসামে যাবার জন্যে দুটো রেলপথ আছে। পুরনো পথ মিটার গেজ, শিলিগুড়ি থেকে বঙ্গাইগাঁও হয়ে গৌহাটি পৌঁছেছে ব্রহ্মপুত্রের পুল পেরিয়ে। আর নতুন পথটি ব্রড গেজ, সে পথও গৌহাটি গেছে। আমরা সেবারে বড় লাইনের গাড়িতেই বঙ্গাইগাঁও গিয়ে ছোট লাইনের ট্রেনে উঠেছি গৌহাটি যাবার জন্যে। অদূর ভবিষ্যতে বড় লাইনের ট্রেনই গৌহাটি পর্যন্ত যাবে বলে শুনেছি। এই বাসে চেপে যেতে যেতে মাঝে মাঝেই রেলপথের সাক্ষাৎ পাচ্ছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না সে পথ ছোট লাইনের, না নতুন বড় লাইনের পথ। আশেপাশে এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, যাকে জিজ্ঞাসা করে কিছু জেনে নিতে পারি।

স্বাতিও একবার চারি দিকে চেয়ে দেখল। বোধহয় আশা করেছিল যে কোন যাত্রী তার প্রশ্নের উত্তর দেবে। কিন্তু আমরা দুজনেই হতাশ হলুম।

এই অঞ্চলের কোন বড় মানচিত্র আমাদের কাছে ছিল না। আছে কিনা, তা জানা নেই। হিমালয়ের দক্ষিণের অঞ্চলকে তরাই বলে জানি। এই তরাই হিমালয়ের সানুদেশের দক্ষিণে ও গাঙ্গেয় সমতল ভূমির উত্তরে একটি সঙ্কীর্ণ বনভূমির নাম। হিমালয়ের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে এই তরাই যমুনার পূর্ব দিক থেকে আসামের গোয়ালপাড়া জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাঙলা ও আসামের তরাই দুয়ার বা ডুয়ার্স নামে পরিচিত। এখন আমরা এই ডুয়ার্সের মধ্য দিয়ে চলেছি কিনা জানি না। কোথাও পড়েছিলুম যে এই ডুয়ার্স তিরিশ মাইল প্রশস্ত এবং দৈর্ঘ্যে একশো আশি মাইল। এই অঞ্চল এক সময়ে ভুটানের অন্তর্গত ছিল এবং ভুটানে প্রবেশের দ্বার ছিল বলেই দুয়ার বলা হত। ইংরেজ এই দুয়ার শব্দকেই ডুয়ার্স বলেছিল। ভুটান যুদ্ধের পর এই অঞ্চল ইংরেজ অধিকারে আসে এবং এর পশ্চিমাংশ বাঙলার সঙ্গে ও পূর্বাংশ আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। হিমালয় থেকে তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সা, রায়ডাক, সঙ্কোশ প্রভৃতি নদী এই ডুয়ার্সের ওপর দিয়ে সমতল ভূমিতে নেমে এসেছে। এক সময়ে এই অঞ্চল ঘন অরণ্যে পূর্ণ ছিল—শরবন ও এক জাতের লম্বা ঘাস ছিল বনে। এই ঘাস লম্বা হয় দশ হাত এবং হাতি লুকোতে পারে এই ঘাসের আড়ালে। সাহেবরা তাই এই ঘাসকে এলিফেন্ট গ্রাস বা সাভানা বলত। মানুষ তো ছাই, জন্তু জানোয়ারও এই ঘাসের মধ্য দিয়ে সহজে চলাফেরা করতে পারত না। তার ওপর প্রবল বৃষ্টি পাত—বছরে প্রায় একশো আশি ইঞ্চি। তাই ম্যালেরিয়ায় জ্বরের প্রকোপ ছিল বেশি।

এখন শুনছি যে এদিকে অস্বাস্থ্যকর অঞ্চল পরিষ্কার করে চাষ আবাদ হচ্ছে ধান পাট ও তামাকের। মালভূমিতে ও পাহাড়ের ঢালে চা বাগান আছে অনেক। প্রচুর শাল ও জারুল গাছ। এই সব রপ্তানি হয় উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ফালাকাটা, বক্সা ও আলিপুরদুয়ার থেকে। আর যা আছে, তা হল বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য বা স্যাঙ্কচুয়ারি। জলদাপাড়ার অভয়ারণ্যের নাম আছে। এ ছাড়াও আছে গোরুমারা ও মহানন্দা অভয়ারণ্য।

এই সব অভয়ারণ্যের প্রধান আকর্ষণ হল এক-শৃঙ্গের গণ্ডার। বাঘ, চিতা, বুনো

হাতি, বাইসন ও হরিণও আছে। জলদাপাড়া অভয়ারণ্য দেখার জন্যে একবার আমি খোঁজ খবর নিয়েছিলুম। শিলিগুড়ি থেকে ছিয়াত্তর মাইল দূরে তোর্সা নদীর তীরে এই অভয়ারণ্য। বাসে বা ট্রেনে হাসিমারায় এসে সেখানে যেতে হয়। কলকাতা থেকে উড়ো জাহাজেও আসা যায় হাসিমারায়। অনতি দূরে মাদারিহাটে টুরিস্ট লজ আছে এবং বনের মধ্যে হলং ও বরদাব্রিতে দুটি ফরেস্ট লজও আছে। হাসিমারা থেকে মাদারিহাট চার মাইল দূরে এবং সেখান থেকেই বনের আরম্ভ। পাঁচ মাইল এগোলেই হলং ফরেস্ট লজ। সেখানে হাতির পিঠে চড়ে বন্য জন্তু দেখার ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি এই অভয়ারণ্য বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বলে শুনেছি।

আমার মনে হল যে আমাদের এই বাস এই বনভূমির বাইরে দিয়ে যাবে। ভুটানের সীমান্ত শহর ফুনছোলিঙ হাসিমারার খুব কাছে। তাই আমাদের বাস মাদারিহাট ও হাসিমারার ওপর দিয়েই যাবে বলে মনে হয়। কিন্তু ভুটান সরকারের বাস বলে এই সব ছোট শহরে হয়তো দাঁড়াবে না। কিংবা সোজা পথে এড়িয়ে যাবে। ছোট লাইনের ট্রেনে বা এই অঞ্চলের বাসে এলে এই সব জায়গায় নামা চলত। অবশ্য বলা যায় না, এই বাসও শহরে বা তার উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে যাত্রীদেব নামিয়ে দিতে পারে। বাসের সমস্ত যাত্রী নিশ্চয়ই ভুটানে যাচ্ছে না।

এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতেই আমি চলেছিলুম। বাসের শব্দে কোন কথা বলার ইচ্ছা হচ্ছিল না। এক সময়ে বাস এসে একটা বাজারের মধ্যে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই এখানে নেমে পড়ল দেখলুম। আমাদের পাশ থেকে একজন যাত্রী নেমে যাচ্ছিলেন। তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন : চা জল খাবার খেতে হলে এখানেই খেয়ে নিন।

আমি স্বাতির মুখের দিকে তাকাতেই সে বলল : নামবে ?

বললুম : দেখি, কী পাওয়া যায়।

স্বাতি যে নামবে না, তা আমি জানি। তাই একাই নেমে পড়লুম।

এ জায়গার নাম গয়েরকাঁটা। রাস্তার দুধারে কয়েকটা মিষ্টির দোকান, চা-ও তৈরি হচ্ছে। যাত্রীরা অনেকেই এই সব খাচ্ছেন দেখে আমবাও কিছু খেয়ে নিলুম।

শুনলুম, এখান থেকে ভুটান সীমান্তে সামচি শহরে বাস যায়। কেউ বললেন, সামচি থেকেই দ্রুক অরেঞ্জ স্কোয়াশ জ্যাম ও মার্মালেড আসে। ষোল-সতেরো মাইল দূরেই এই শহর। কিন্তু বাস এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না বলে তাড়াতাড়ি চা শেষ করে বাসে উঠে বসলুম।

বাস আবার আগের মতো ছুটল। পথে এই বাস কোথায় কোথায় দাঁড়িয়েছিল তা বলতে পারব না। প্রভাতের মধুর বাতাসে একটা নেশা আছে। সেই নেশায় চোখ আপনা থেকেই বুঁজে আসে। পথের কথা কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

শৈশবে এই অঞ্চলের কথা শুনেছিলুম। এই অঞ্চলের রেলপথকে তখন বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলপথ বলত। মিটার গেজ রেল। শিলিগুড়িতে বড় লাইনের দার্জিলিঙ মেল আসত, শিলিগুড়ি থেকে খেলনার মতো ন্যারো গেজ রেলের নাম ছিল দার্জিলিঙ-হিমালয়ান রেলওয়ে। এই রেলপথেরই একটা শাখা শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পঙের দিকে তিস্তা ব্রিজের কাছাকাছি পর্যন্ত যেত। বড় লাইনের ট্রেন ছিল ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে। পরে এই নাম হয়েছিল বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ে। তখন পার্বতীপুর জংসন থেকে একটা মিটার গেজ লাইন লালমণির হাট জংসনের উপর দিয়ে হিমালয় পর্যন্ত আসত। কুচবিহার ও আলিপুরদুয়ার ছাড়িয়ে রাজাভাতখাওয়া

থেকে একটা লাইন যেত দলসিংপাড়া, আর একটা লাইন বক্সাদুয়ারের উপর দিয়ে জয়ন্তী পৌঁছত। দলসিংপাড়া থেকে কমলালেবু আসত। আর জয়ন্তী পাহাড়ের এক জায়গায় ছিল মহাকাল শিব। শিবরাত্রির দিনে ঐ অঞ্চলের ছেলেরা বিনে টিকিটে জয়ন্তী যেত। তাদের অনেকেই ফিরে এসে বলত, ভুটান দেখে এলাম। ঐ পাহাড় ডিঙিয়ে ওপারে গেলেই নাকি ভুটানের সীমান্ত। পায়ে চলার পথ ছিল। লরি যাতায়াত করত বলেও শুনেছি। কিন্তু সত্যিই সেদিক দিয়ে ভুটানে যাবার পথ ছিল কিনা জানি না।

এখন বোধহয় জয়ন্তী পর্যন্ত কোন ট্রেন চলাচল করে না। এই স্টেশনটি বোধহয় আর নেই। কিন্তু একখানা মার্কিন বই-এ জয়ন্তী নাম দেখেছি। তার কাছেই ফুনছোলিঙ। উত্তরে ফুনছোলিঙ, দক্ষিণে জয়ন্তী। মাঝখানে কী আছে দেখানো নেই। হাসিমারা আগে ছিল। এখনও আছে। কিন্তু সেই মানচিত্রে তার অবস্থান দেখানো নেই। আগে লালমণির হাট জংসন থেকে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে উত্তরে আসত। ১৯৪৭-এ ভারত বিভক্ত হবার পরে বাঙলাদেশের নাম হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। সেই সময়ে এই অঞ্চলে রেলপথের অনেক পরিবর্তন হয়। কলকাতা থেকে সবাসরি শিলিগুড়ি আসা বন্ধ হয়ে যায়। লালমণির হাট পূর্ব পাকিস্তানে পড়ে বলে উত্তরবঙ্গে নূতন রেলপথ স্থাপিত হয়—শিলিগুড়ি থেকে পূর্ব দিকে বিস্তৃত হয় আসামে যাবার রেলপথ। সেই মিটার গেজ পথ এখনও আছে, তার পাশেই খানিকটা তফাতে বসেছে নূতন বড় লাইনের পথ। আমাদের এই বাসের পথও পশ্চিম থেকে পূর্বে চলেছে।

ফুনছোলিঙ হয়ে ভুটানে প্রবেশের পথ আগে ছিল না। পণ্ডিত নেহেরু তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে ভুটানে গিয়েছিলেন। সে ১৯৫৮ সালের কথা। তাঁরা সিকিম থেকে ভুটানে প্রবেশ করেছিলেন বলে জানি। তখন সেই পথই সুগম ছিল বলে মনে করা হত। গ্যাংটক থেকে নাথু লা পেবিয়ে ভুটানের পশ্চিমাংশে পৌঁছতে হত।

ওই ঘটনার কত দিন পরে ফুনছোলিঙ থেকে ভুটানের রাজধানী থিম্ফু পর্যন্ত রাজপথ তৈরি হয়েছে, তা আমার জানা নেই। শুধু এইটুকু জেনেই নিশ্চিন্ত আছি যে আমাদের আর হাঁটতে হবে না, ঘোড়া বা ঝব্বুর পিঠেও চাপতে হবে না। আমরা বাসে বসেই ভুটানের সীমান্ত শহরে পৌঁছব, তারপর অন্য বাসে চলে যাব রাজধানী শহরে। মাঝে অনুমতি পত্রের জন্যে হয়তো এক দিন অপেক্ষা করতে হবে ফুনছোলিঙে।

আমরা বোধহয় হাসিমাবা শহরেব পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। অল্পক্ষণের জন্য দাঁড়িয়েছিলুম এক জায়গায়। পথে জলদাপাড়ার অভয়ারণ্যও দেখতে পাই নি। তবে দু একখানা ট্যাক্সি দেখতে পেয়েছিলুম। বুঝতে পেরেছিলুম যে হাসিমারা থেকে ট্যাক্সিতে জলদাপাড়া ও ফুনছোলিঙ পৌঁছনো যায়। দূরত্ব হয়তো কোন দিকেই বেশি নয়। কিন্তু এ সব কথা সঠিক ভাবে জেনে নেবার মতো যাত্রী দেখতে পেলুম না।

এক সময়ে আমরা একটা বিরাট গেটের নীচে দিয়ে একটা শহরে ঢুকে পড়লুম। বাস সেখানে না থেমে শহরের বাজার এলাকার মধ্যে বাস স্ট্যাণ্ডে এসে ঢুকে পড়ল। সব যাত্রীই এখানে নামছেন দেখে আমরাও নেমে পড়লুম। বুঝতে অসুবিধা হল না যে এখানেই আমাদের আজকের যাত্রা শেষ। ঘড়িতে সময় তখন বেলা দশটা বেজে চল্লিশ মিনিট। তিন ঘণ্টাতেই আমরা ফুনছোলিঙে পৌঁছে গেলুম।

১১

কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে আমরা কোন্ দিকে এগোব ভাবছিলুম। ঠিক এই সময়েই সেই ভদ্রলোক ব্যস্ত সমস্তভাবে আমাদের সামনে এসে বললেন : আসুন।

শিলিগুড়ি বাস স্ট্যাণ্ডের সেই ভদ্রলোক, যিনি আমাদের একখানা টিকিট কিনে দুজনকেই উঠে বসতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এখানেও তাঁকে এইভাবে দেখতে পাব, তা একেবারেই আশা করিনি। বাসে তাঁকে একবারও দেখতে পাইনি। তিনি যে আমাদের সঙ্গেই এসেছেন সে কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলুম। তাই আমি চমকে উঠে বললুম : আপনি!

আর স্বাতি বলল : বাসে আপনাকে আমরা একবারও দেখতে পাইনি।

ভদ্রলোক হেসে বললেন : ভিড়ের জন্যেই দেখতে পান নি।

বলে কুলিকে নিয়ে এগোলেন।

বাস স্ট্যাণ্ডের সামনে দিয়েই প্রশস্ত পথ পাহাড়ের দিকে গেছে। কিন্তু ভদ্রলোক সেদিকে না গিয়ে যেদিক থেকে আমরা এসেছিলুম, সেই দিকেই এগোলেন। পথে যেতে যেতে বললেন : আপনারা তো ভুটান দেখতে এসেছেন, এখান থেকে নিশ্চয়ই থিম্ফু যাবেন?

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : আপনি জানলেন কি করে?

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে বললেন : টিকিটের কাউন্টারে উনি এই কথাই বলেছিলেন।

তারপরেই বললেন : এই জন্যেই আমি আপনাদের রিগিয়া হোটেলে নিয়ে যাচ্ছি। থিম্ফু শহরেও একটা রিগিয়া হোটেল আছে ভাল জায়গায়। এদের সঙ্গে কী সম্বন্ধ জানি নে, তবে শুনেছি যে এরা সেখানকার ব্যবস্থাও করে দেয় টেলিফোনে। থিম্ফুর সরকারি হোটেলে খরচ অত্যন্ত বেশি। বিদেশী টুরিস্টদের জন্যেই ব্যবস্থা।

বললুম : বেশি হোটেল বুঝি নেই?

যতদূর জানি, আর হোটেল নেই। থাকলেও তা আপনাদের পছন্দ হবে না। আর রিগিয়া হোটেলেও ঘর খুব কম। একতলায় ডাইনিং হল, আর দোতলায় খান কয়েক ডবল বেড রুম। তাই এখানকার রিগিয়া হোটেল থেকে ব্যবস্থা করে গেলে নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারবেন।

খুব্ ঠিক কথা।

বড় রাস্তা থেকে একটুখানি ভেতরে ঢুকেই রিগিয়া হোটেল। এ বাড়িও একটি তেরাস্তার ওপরে। পরিবেশটি ভাল। এরও একতলায় ডাইনি হল। কাউন্টারে এক পাহাড়ী ভদ্রলোক বসে আছেন। আমাদের সঙ্গী ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কইলেন : এঁরা টুরিস্ট, ভুটান দেখতে এসেছেন। দোতলায় একখানা ভাল ডবল বেড রুম দিন, আর থিম্ফুর রিগিয়া হোটেলেও একটা ঘর রিজার্ভ করে দিন।

তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন : বাস স্ট্যাণ্ডে খবর নিয়ে এসেছি। পরশু মিনি বাস আছে থিম্ফুর। তাতে আরামে যেতে পারবেন, সময়ও কম লাগবে। আর কাল ফুনছোলিঙ শহরটাও ভাল করে দেখে নিতে পারবেন।

স্বাতি বলল : খুব ভাল হয় তাহলে।

ভদ্রলোক এবারে ম্যানেজারের দিকে চেয়ে বললেন : এঁদের পার্মিটটা কি আপনি করিয়ে দিতে পারবেন, না আমি কাউকে বলে যাব ?

বলে টেলিফোনে তিনি একজনকে ডেকে কিছু নির্দেশ দিলেন। তারপর আমাদের বললেন : আপনাদের পার্টিকুলার্স নিয়ে গিয়ে আজ বিকেলেই পার্মিট দিয়ে যাবেন। মিনি বাসের টিকিটও এনে দেবেন তিনি। নমস্কার।

ভদ্রলোক চলে যাচ্ছেন দেখে স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : আপনি চলে যাচ্ছেন !

আমি থিম্ফু যাচ্ছি। আমার বাস দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু আপনার পরিচয় যে জানা হল না !

আমি সরকারি কাজ করি। থিম্ফুতে আবার দেখা হতে পারে।

বলে আর অপেক্ষা না করে হনহন করে চলে গেলেন। আমরা যে তাঁকে দু হাত জুড়ে নমস্কার করলুম, তা বোধহয় দেখতেই পেলেন না।

আমরা দোতলায় রাস্তার ধারের একখানা ঘর পেলুম। জানালার পর্দা সরিয়ে দিতেই প্রসন্ন আলোয় ঘব ভরে গেল। ঘরের লাগোয়া বাথরুম।মধ্যবিত্ত ব্যবস্থা, অপরিচ্ছন্ন নয়। দুপুরে আমরা নীচে নেমে খাব বলে এসেছিলুম। আর যিনি আমাদের নামধাম জানতে আসবেন, তিনি এসেছেন খবর পেলেই আমরা নেমে আসব।

স্বাতি বলল : ভদ্রলোক টেলিফোনে যাঁর সঙ্গে কথা বললেন, তাঁর নাম বোধহয় দোরজি। এই দোরজি নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

হেসে বললুম : দোরজি নাম শুনেই তাঁকে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ভাবা উচিত হবে না।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর নাম দোরজি নাকি ?

এখনকার প্রধানমন্ত্রীর নাম জানি নে, কিন্তু এক সময়ে এই দোরজিরাই পুরুষানুক্রমে প্রধানমন্ত্রী হতেন।

সত্যি নাকি !

সেবারে কালিম্পঙে আমরা ভুটান হাউস দেখেছিলুম মনে আছে ? উগ্যেন দোরজি এই বাড়ি তৈরি করেছিলেন বলে শুনেছিলুম। তারপর নরি রুস্তমজীর লেখা 'এনচ্যান্টেড্ ফ্রন্টিয়ার্স' বইখানা পড়ে এঁদের সম্বন্ধে অনেক কথা জেনেছি।

স্বাতি বলল : এখন তো আমাদের বসে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ নেই, বল্ না দোরজিদের কথা !

বললুম : উগ্যেন দোরজির ছেলে রাজা দোরজি বিয়ে করেছিলেন সিকিমের রাজকন্যা রানী চুনিকে। রাজা দোরজি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তাঁর বড় ছেলে জিগ্‌মি দোরজিও হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। জিগ্‌মির স্ত্রী টেস্‌লা তিব্বতের মেয়ে। সাধারণ ঘরের মেয়ে। দলাই লামার সুনজরে ছিলেন বলে বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন টেস্‌লার বাবা। জিগ্‌মির ছোট বোনকে বিয়ে করেছিলেন ভুটানের রাজা এবং রাজার সৎ মায়ের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন জিগ্‌মির মেজো ভাই রিমপোছে। সে বিয়ে নাকি অল্প দিন পরেই ভেঙে গিয়েছিল।

স্বাতি বলল : এর মানে, রাজা ও প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

হ্যাঁ। ভুটানের স্বর্গত রাজা তাঁর প্রধানমন্ত্রীর ভগ্নীপতি ছিলেন। শুনেছি, এই প্রধানমন্ত্রী আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন।

আর রাজকন্যা তাঁর ভ্রাতৃবধূ হয়েছিলেন। কিন্তু সে সম্পর্ক টেঁকেনি। রাজকন্যা যখন দার্জিলিঙের স্কুলে পড়তে এসেছিলেন, তখন প্রেমে পড়েছিলেন রিমপোছের। তাই বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সুজনের আর কোন মিল ছিল না বলেই বোধহয় বিচ্ছেদ হয়েছিল।

বিচ্ছেদ কে চেযেছিলেন জানো ?

জানি না। তবে ভুটানে মেয়েদেরও বিচ্ছেদ চাইবার অধিকার আছে বলে শুনেছি। এখন ভারতের মেয়েরা নতুন আইনের বলে যা পারে, ভুটানের মেয়েদের সে অধিকার নাকি আগে থেকেই ছিল।

স্বাতি বলল : রিমপোছে নামটাও যেন শোনা মনে হচ্ছে।

রিমপোছের মানে অমূল্য রত্ন। কিন্তু সবাই এ নামটা রাখতে পারে না।

কেন ?

কোন বড় লামার অবতার হলেই এই নাম পাওয়া যায়। রাজা দোরজি তাঁর মেজো ছেলের নাম রেখেছিলেন উগ্যেন।

তারপর ?

এক দিন তিব্বত থেকে একদল লামা এসেছিলেন রাজা দোরজির কাছে। বলেছিলেন, উগ্যেন তাদের গোম্পার বড় লামার অবতার। তাঁরা জানতে পেরেছেন যে তিনিই এই ঘরে জন্ম নিয়েছেন। তাঁরা এসেছেন উগ্যেনকে নিয়ে গিয়ে তাঁদের গোম্পায় লামার শিক্ষা দেবেন।

বাপ রাজী হলেন ?

রাজী না হয়ে উপায় কী ! তিনি নিজেও তো একজন ধার্মিক বৌদ্ধ, এসব ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাসও অপরিসীম। তাই লামাদের সঙ্গে নিজেও গিয়ে ছেলেকে গোম্পায় পৌঁছে দিলেন।

তারপর ?

উগ্যেন সেখানে থাকবে কেন ? বড়লোকের ঘরের দুলাল গোম্পাব কৃচ্ছ্রতা সইতে না পেরে বাপের কাছে কালিম্পঙে ফিরে এল। সঙ্গে নিযে এল তার রিমপোছে নাম। কিন্তু লামারা নাকি এঁর আশা ছেড়ে দেন নি। রিমপোছে যখন বিয়ে করতে যাচ্ছেন, তখনও তাঁরা সেই খবর পেয়ে বাধা দিতে এসেছিলেন চুম্বি উপত্যকায়। কিন্তু তাঁদের অনুরোধে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে তো ভেঙে দেওযা যায় না ! বিয়ে হল। সে বিয়ে থিম্ফুতে নয়, বিয়ে হয়েছিল রাজ পরিবারের পুরনো বাড়ি মধ্য বা পশ্চিম ভুটানের বুম্‌থাঙে। কালিম্পঙ থেকে তেইশটা গিরিপথ পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। এক একটা পাসের উচ্চতা তেরো হাজার ফুটও আছে। কালিম্পঙ থেকে গ্যাংটকে এসে নাথু লা পেরিয়ে চুম্বি উপত্যকা ছাড়িয়ে ভুটানের হা উপত্যকা থেকে পারো থিম্ফু হয়ে প্রায় তিন সপ্তাহের পথ। আর ঘোড়া ঝব্বু বা হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

স্বাতি বলল : কঠিন ব্যাপার !

বললুম : সিকিম আর ভুটানের রাজারা তো তিব্বতী মেয়েই বিয়ে করতেন। সিকিমের ছোগিয়েল পলদেন থোনদুপ নামগিয়েলও প্রথম বিয়ে করেছিলেন তিব্বতের মেয়ে সাঙ্গি ডেকিকে। এঁর মৃত্যুর পর মার্কিন মহিলা হোপ কুক্‌কে বিয়ে করেন। তাঁরাই সিকিমের শেষ ছোগিয়েল ও গিয়ালমো।

মানে ?

রাজা ও মহারানী।

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল · কিন্তু ভুটানের প্রধানমন্ত্রীরা কালিম্পঙে থাকতেন কেন ?

বললুম : ভুটানেব প্রধানমন্ত্রীরা সে সময়ে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর মতো ছিলেন না বলে। তাঁরা কতকটা নামে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ইংরেজীতে প্রাইম মিনিস্টার বলা হত, আর ভুটানের ভাষায় দেব জিমপন। আসলে তিনি ছিলেন হা জেলার টুঙ্গপা, মানে প্রধান। রাজকোষ থেকে কোন মাইনে পেতেন না। হা জেলা থেকে যে রাজস্ব আদায় হত, তাব একটা অংশ রাজকোষে পাঠিয়ে বাকিটা নিজে রাখতেন। ভুটানের রাজা নিজে দেখতেন রাজকার্য এবং প্রয়োজন বোধ করলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ চেয়ে পাঠাতেন। ইনি বোধহয় বৈদেশিক ব্যাপারে ভুটানের প্রতিনিধি ছিলেন এবং কালিম্পঙে থাকলে সেই সুবিধে হত।

এখনও কি এই ব্যবস্থাই চলছে ?

বললুম : তা সঠিক বলতে পারব না। নরি রুস্তমজীর বই বেরিয়েছে বারো-তেরো বছর আগে। কিন্তু তিনি প্রায় তিরিশ বছর আগের ঘটনা লিখেছেন। ফুনছোলিঙের নাম তাঁর বই-এ নেই, তার মানে থিম্ফুর পাকা সডক তখনও তৈরি হয় নি। তাঁবা থিম্ফু গেছেন গ্যাংটক হয়ে। নাথু লার দিকে মাইল পনের পথ জীপে যাবার কথা ছিল, কিন্তু মাইল আষ্টেক যাবার পরেই হাঁটতে হয়েছিল। এখন শুনেছি নাথু লা পর্যন্ত আব হাঁটতে হয না। তবে—

হ্যাঁ, বল।

ভুটান থেকে ফেবার পথে তাঁরা চুম্বি উপত্যকায় চীনের সীমান্ত রক্ষীদেব হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন। জিগমি দোবজি তাঁকে বলেছিলেন যে এই শেষ, এর পর আর এ পথে তিনি ভুটানে যাবেন না। যাবেন ভাবতেব মাটির ওপব দিয়ে। বছর চল্লিশেক আগে তাঁবা উপলব্ধি করেছিলেন যে ভাবত থেকে ভুটানে যাতায়াতেব পথ তৈরি কবা দরকার এবং তাঁদের পক্ষে এই ব্যবস্থাই কল্যাণকর হবে।

স্বাতি বলল · ভাবতেব সাহায্য নিতে বাধা কী ছিল ?

বললুম . ভয়। ভুটানীরা বিদেশীদেব, বিশেষ করে ইংরেজদেব, ভয় পেত। ইংরেজরা সিকিমের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিল, তা তাবা ভাল চোখে দেখে নি। হিমালয়ের তিনটি রাজ্যেব সঙ্গেই তাদেব সম্পর্ক ভাল ছিল না। এমন কি তিব্বতের লোকও তাদের পছন্দ করত বলে মনে হয় না। ভুটানীরা হয়তো ভাবত যে ভারত স্বাধীন হবার পরে সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলি যে ভাবে এক দিনে কব্জা করেছে, তেমনি করেই হিমালয়ের এই তিনটি রাজ্যও অধিকার করবার চেষ্টা করবে। তাই তাবা বিদেশীদের ওপর থেকে বিধি-নিষেধ তুলে দিতে চাইছিল না। ভাবছিল, দেশের উন্নতি করতে দেবি হবে হোক, কিন্তু রাতারাতি উন্নতির আশায় দেশটাকে বেচে দেওযা ঠিক হবে না।

তারপর ?

তাবপর যখন বিশ্বাস হল যে না, সে বকমের কোন আশঙ্কা নেই। অথবা যখন ভয় হল চীনারা তিব্বত যেভাবে গ্রাস করল এবং সীমান্ত নিয়ে বিরোধ যেমন বেড়ে উঠছে, তাতে আত্মরক্ষাব জন্যেই একটা পথ খোলা থাকা দরকার। চীনের ভারত আক্রমণের কথা তোমার বোধহয় মনে আছে ?

সময়ের কথা মনে নেই।

সেই দিনটা ছিল ১৯৬২ সালের তেইশে অক্টোবর। চীনারা অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং আক্রমণ করছে বলে একটা খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে ভয়ে পালিয়ে এসেছিল সবাই, আর চীনারা সেই সব অঞ্চল অধিকার করে নিচ্ছিল। এক সময়ে সবাই ভয় পেয়েছিল যে চীনারা বোধহয় সমস্ত অঞ্চলটাই দখল করে নেবে।

স্বাতি বলল : মনে পড়েছে। এক সময়ে কেন তারা থমকে থেমে গেল, তারপর ফিরে চলে গেল, তা অনেকেই বুঝতে পারল না। কিন্তু এর সঙ্গে ভুটানের কী সম্পর্ক আছে ?

বললুম : সেই সময়েই সবাই জেনেছিলুম যে চীনারা মনে করে—শুধু তাওয়াং অঞ্চল নয়, অরুণাচলের উত্তর সীমান্তের মতো নেপাল ও ভুটানেরও সীমান্তের মধ্যে তাদের অধিকার আছে। অর্থাৎ তিব্বত একটা সীমান্ত মেনে নিয়েছিল বলেই যে তা ঠিক, চীনারা তা মনে করে না। শুধু সিকিম তার চুম্বি উপত্যকা তিব্বতকে ছেড়ে দিয়ে এই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে।

স্বাতি বলল : বুঝেছি। ভুটান বোধহয় ভয় পেয়েছিল যে এই সীমান্ত নিয়ে তাদের ওপরেও চীন হামলা করতে পারে।

এই সময়েই আমার মনে পড়ে গেল যে ১৯৬৩ সালে অ্যামেরিকা থেকে প্রকাশিত একখানা বই-এ আমি ভুটানের মানচিত্র দেখেছিলুম। তাতে ফুনছোলিঙ থেকে পারো ও থিম্ফু পর্যন্ত সড়ক পথ দেখানো আছে। এর মানে চীনা হামলার পর ভুটানের সড়ক পথ তৈরি হয় নি, হয়েছে তার আশঙ্কার কথা ভেবেই। আমি আরও একটা কথা শুনেছি একজনের কাছে, তিনি বলেছেন যে ভুটানে এখন প্রায় সব জায়গাতেই বাসে যাতায়াত সম্ভব। সব জায়গাতে বলতে দেশের প্রধান শহরগুলি এখন মোটর পথে যুক্ত হয়েছে। ভারতের তিনটি জায়গা থেকে এখন ভুটানে প্রবেশ করা যায়। এই তিনটি জায়গা হল হাসিমারা, বঙ্গাইগাঁও ও রঙ্গিয়া। হাসিমারা থেকে ফুন্‌ছোলিঙে এসে পারো, থিম্ফু ও পুনাখা গেছে। থিম্ফু থেকে যে পথ পুনাখায় গেছে, সেই পথের উপরে ওয়াংদিফোদ্রং থেকে পূর্ব দিকে পেলে-লা হয়ে তংসাও যাওয়া যায়। কিন্তু মধ্য ভুটানের এই তংসা যেতে হলে বঙ্গাইগাঁও থেকে গেলেফু লুদ্রাই হয়ে সোজা উত্তরে যাওয়াই সুবিধে। তংসা থেকে একটা পথ পূর্ব মুখে পূর্ব ভুটানের তাশিগঙ পর্যন্ত গেছে। কিন্তু আসামের রঙ্গিয়া স্টেশন থেকে তাশিগঙ আসাই সুবিধের। ভুটানের সীমান্ত শহর সমদ্রুপজঙ্কার থেকে উত্তরে তাশিগঙের দূরত্ব খুবই কম।

স্বাতি আমাকে নীরব দেখে বলল : হঠাৎ কী ভাবতে শুরু করলে ?

বললুম : ভুটানে নাকি সর্বত্রই আজকাল বাসে যাতায়াত করা যায়। কিন্তু এই সব পাথঘাট কবে তৈরি হল কিছুই জানি না। কার কাছে এই পথ তৈরির কথা শুনেছিলুম, তাও মনে নেই। তবে এইটুকু মনে পড়ছে যে চীনা হামলার পর কেউ আমাকে ভুটানে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বলেছিলেন যে তিনি পথ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত আছেন এবং তাঁর অধিকারে একটি জীপ গাড়িও আছে। কাজেই আমাকে তিনি অনেক কিছুই দেখিয়ে দিতে পারবেন।

কেন গেলে না ?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল দেখে হেসে বললুম : তখন আমার কোন সঙ্গী ছিল না।

সঙ্গী না থাকলে কি কোথাও যাওয়া যায় না ?

যাওয়া ঠিকই যায়, কিন্তু আনন্দ পাওয়া যায় না। মনে হয়, কর্তব্য পালন করতে এসেছি, কিংবা চাকরি করতে।

কিন্তু নতুন জায়গা তো দেখা হয় !

যাতে আনন্দ নেই, তার মূল্য কতটুকু ?

স্বাতি হাসল আমার কথা শুনে। কিন্তু প্রতিবাদ করল না। তার বদলে ঘড়ি দেখে বলল : বেলা তো অনেক হল। কেউ এখনও এলেন না তো !

বললুম : তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই। দরকার হলে আমরা নিজেরাই বেরিয়ে পড়ব।

স্বাতি বলল : নীচে নেমে খোঁজ নিলে মন্দ হত না।

তাহলে মুখ হাত ধুয়েই নীচে নামা যাক। সময় মতো খেতে বসা যাবে।

সেই ভাল।

উপর থেকে নেমে আমরা ম্যানেজারের কাছে গেলুম। স্বাতি বলল : কেউ আমাদের খোঁজে আসেন নি তো ?

ম্যানেজার বললেন : এক ভদ্রলোক আপনাদের নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে গেছেন আমার খাতা থেকে। বললেন, এতেই কাজ হবে, আর কিছু চাই না।

স্বাতি বলল : বাসে টিকিট কাটবেন বলেছিলেন। ভাড়ার টাকাটা দিয়ে দিতে পারতাম !

উত্তরে ম্যানেজার বললেন : আমি সে কথা বলেছিলাম। কিন্তু তিনি বললেন, না, অপরিচিত লোকের কাছে আগে টাকা নেওয়া ঠিক হবে না। টিকিট ও রিজার্ভেসন স্লিপ এনে দিয়ে টাকা নেব।

আমরা আশ্চর্য হলুম এ কথা শুনে। আর ম্যানেজার বললেন : দুপুরে আপনাদের বিশ্রাম করতে বলে গেছেন। বিকেলে তিনি এসে সব জিনিস বুঝিয়ে দেবেন।

স্বাতি বলল : তাহলে আমাদের আর কিছু করবার নেই, তাই না ?

আমি বললুম : আমরা নিশ্চিন্ত মনে খেতে বসতে পরি। কী খাওয়াবেন বলুন তো ?

বলে ম্যানেজারের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন : এ দিকের স্পেশালিটি ? তা চাইনীজ চাওমিন নিশ্চয়ই খেয়েছেন। ভুটানী থুক্‌পা বা তিব্বতী মোমো খাওয়াতে পারি।

স্বাতি বলল : এখন নয়। দুপুরে আমরা ভাত খাব। তার সঙ্গে মাছ বা মাংস, ডাল, তরকারি। আর একটা সুইট ডিশ।

ম্যানেজার বললেন : তা হলে বসে যান। আমি ব্যবস্থা করছি।

বলে একজন বেয়ারাকে ডেকে অর্ডার দিয়ে দিলেন।

১২

থিম্ফু যাবার ব্যবস্থা আমাদের হয়ে গেল। বিকেলের দিকে এক ভদ্রলোক এসে সব কাগজপত্র আমাদের দিলেন। তাঁর চেহারা দেখেই আমরা বুঝতে পারলুম যে তিনি স্থানীয় অধিবাসী। কিন্তু পরিচয় জানতে চাইলে বললেন : কঠিন প্রশ্ন।

কেন ?

এখানেই কয়েক পুরুষের বসবাস। বংশের আদিপুরুষ হিমালয়ের ওপার থেকে এসেছেন, না এ-পারেরই লোক ছিলেন, তা কোথাও লিখে রেখে যান নি। এ-পারের হলেও পশ্চিম দিক থেকে এসেছেন না পূর্ব দিক থেকে, তা লিখে রাখা উচিত ছিল। আমরা আদার ব্যাপারী তো, কোন দিন কারও যে জাহাজের খবরের দরকার হতে পারে তা ভাবতে পারি নি। পারলে এক দিন প্লাঞ্চেটে পিতৃপুরুষদের ডেকে এনে কথাটা জেনে রাখতাম।

বলে হাসতে লাগলেন।

আমি আশ্চর্য হলুম তাঁর সাবলীল হিন্দী কথা শুনে।

স্বাতি বলল : নিজেদের এই ব্যবস্থা করতে হলে কোথায় আমাদের যেতে হত ?

ভদ্রলোক বললেন : কেন, আবার আসবেন নাকি ? তাহলে আমার টেলিফোন নম্বরটা আপনাকে দেব, এখানে এসে একটা ফোন করবেন।

স্বাতি বলল : দরকার অন্য লোকের জন্যে। কেউ জানতে চাইলে আমাদের বলতে হবে তো। সবাইকে আপনার টেলিফোন নম্বর দেওয়া সম্ভব নয়।

ভদ্রলোক বললেন : বুঝেছি। পাহাড়ের নীচে বাজার এলাকায় আপনারা আছেন, সরকারী দপ্তরগুলো সব পাহাড়ের ওপরে। বাস স্ট্যাণ্ডের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা পাহাড়ের দিকে গেছে, তা ডান হাতে বেঁকে উঠেছে পাহাড়ের ওপরে। ঐ পথের ধারেই এই শহরের ব্যাঙ্ক পোস্ট অফিস ও সমস্ত সরকারী অফিস। একটা টুরিস্ট অফিসও আছে। সেখানে গিয়ে বলবেন, আমরা ভুটান দেশটা দেখতে এসেছি। তারা আপনার নামধাম জেনে নেবে। থিম্ফুতে কোন আত্মীয় বন্ধু থাকলে তো কথাই নেই, ভারতীয় টুরিস্ট বললেই পার্মিট পেয়ে যাবেন। তবে শুধু থিম্ফু যাবার পার্মিট পাবেন। অন্য কোথাও যেতে হলে থিম্ফু গিয়ে আপনাকে বলতে হবে, পারো যাবেন, না পুনাখা। পুরনো দিন আর নেই। ভুটানের সর্বত্র আপনি যেতে পারেন। তবে পার্মিট ছাড়া কোথাও যাবার চেষ্টা করবেন না। চেক পোস্ট আছে জায়গায় জায়গায়, সেখানে পার্মিট দেখাতে না পারলেই বাস থেকে নামিয়ে দেবে। বিপদে পড়ে যাবেন বেকায়দা জায়গায়। কাজেই ঐ পার্মিটটি যত্ন করে সঙ্গে রাখবেন এবং যত জায়গায় দেখতে চায়, তত জায়গাতেই দেখাবেন। থিম্ফুর পথে তিন জায়গায় দেখাতে হবে।

হেসে বললুম : বুঝেছি। ওটা আমরা মুহূর্তের জন্যেও হাতছাড়া করব না।

ভদ্রলোকও সহাস্যে বললেন : এইবারে বাসের টিকিটের কথা।

বলুন।

ভদ্রলোক বললেন : যেখানে আপনারা বাস থেকে নেমেছিলেন, সেইখানেই বুকিং অফিস। তবে বাইরে নয়, ভেতরে ঢুকতে হয়। কাউন্টার আছে। অ্যাড্‌ভান্স্ বুকিঙের ব্যবস্থাও আছে। আপনাদের রিজার্ভেসন স্লিপে দেখুন—ডেট অব বুকিং ও ডেট অব জার্নি দেওয়া আছে। আপনারা ইচ্ছা করলে সপ্তাহের যে কোন দিন সাধারণ বাসে থিম্ফু যেতে পারতেন। তাতে সময় বেশি লাগত, আর যেতে হত স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে। মেম সাহেবরা তাঁদের ভ্যানিটি ব্যাগে আতরের শিশি নিয়ে ওঠেন। কোন স্থানীয় মহিলা পাশে বসলে আতর মাখানো তুলো নিজের নাকেই মাঝে মাঝে বুলিয়ে নেন।

কেন?

বলে স্বাতি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি অট্টহাস্যে ঘর ভরে দিলেন। তারপর হাসি থামলে বললেন : তাঁদের ধারণা যে পাহাড়ের চড়াই পথে যেমন গা ঘুলোয়, তেমনি স্থানীয় লোকের গায়ের গন্ধেও তাই হয়। আপনাদের বন্ধু বোধহয় এই জন্যেই আপনাদের জন্যে মিনি বাসের টিকিট কাটতে বলেছেন। ভাড়া বেশি বলে স্থানীয় লোকের ভিড় হয় না।

ভদ্রলোকের এই রসিকতার আড়ালে আমি একটা বেদনার আভাস পেলুম। মনে হল যে তিনি কোন দিন কারও কাছে এই ব্যাপারে কোন আঘাত পেয়েছেন। অসম্ভব নয়। মানুষকে আমরা ঘৃণা করি, গরিবের দারিদ্র্যকেও। যারা এক বস্ত্রে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়, দুমুঠো অন্নের জন্যে যারা দিবারাত্রি কাজ করে দুর্যোগ মাথায় করে, তাদের বাইরের নোংরা পোশাক দেখে আমরা নাক সিঁটকোই, কিন্তু অন্তরের নির্মল রূপ দেখে মুগ্ধ হই না, সেই রূপের সঙ্গে তুলনা করি না নিজেদের মনের নোংরা ও বিষাক্ত চিন্তা ভাবনার।

স্বাতি বোধহয় এই কথাই ভেবেছিল, বলল : বাইরে তো মানুষের একটা খোলস, আসল মানুষটা এই খোলসের ভেতরে। যারা ভেতরের গন্ধ পায় না, তারাই আতর মাখে।

ভদ্রলোক থমকে গেলেন। তারপর বললেন : আমাকে মাপ করবেন।

আমি বললুম : আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা যে সভ্যতার গর্ব করি, তার রূপ এই রকমই। নিজের নাকে নিজের মনের গন্ধ পেলে বাইরের দুর্গন্ধে আমরা বিচলিত হতুম না।

চা খেতে খেতেই আমাদের কথা হচ্ছিল। কাগজ পত্র নিয়ে বাস ভাড়ার টাকা স্বাতি আগেই মিটিয়ে দিয়েছিল। এইবারে বলল : এই শহরে আমরা কী দেখব, তা বলবেন না?

এই প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক বেশ আরাম পেলেন। বললেন : টুরিস্টরা ভাবেন যে এই শহরে কিছু দেখবার নেই। তাই পার্মিট পেলেই পালিয়ে যান। না না, আপনারা এরকম করবেন না। এই শহরটা দেখার জন্যে কিছু সময় ব্যয় করলেই বুঝতে পারবেন যে একে এড়িয়ে যাওয়া উচিত হত না।

তারপর বললেন : আজ এই হোটেলের পেছনের রাস্তা ধরে নদীর ধারে চলে যান। দুতিখোলা নামে একটা ছোট নদী এই শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আমো চুর সঙ্গে মিলেছে। চু মানে নদী। আমো চুর বাঙলা নাম তোর্সা। সন্ধ্যেবেলায় এই জায়গাটা আপনাদের ভাল লাগবে।

তারপর ?

তারপর ফিরে আসবেন শহরের গেটে। স্থাপত্যশৈলী দেখবেন দুধার থেকে—এধারে ভুটান, অন্য ধারে ভারত। সে দিকেও একটা ছোট বাজার আছে আর ঘরবাড়ি। অনেক ট্যাক্সিও দাঁড়িয়ে আছে দেখবেন। শহর দেখবার জন্যে একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে আসবেন। সকালে এসে হোটেল থেকে আপনাদের নিয়ে যাবে খারবন্দী পাহাড়ের মাথায়। ছোট একটা গোম্পা আছে, সেটা দেখতে ভুলবেন না। বাইরে দাঁড়িয়ে সমস্ত ফুনছোলিঙ শহরটা দেখতে পাবেন নীচে, আর দূরে তোর্সা নদীর প্রশস্ত ধারা। চোখ আপনাদের জুড়িয়ে যাবে।

বললুম : তারপর ?

এই পাহাড়ের ওপরেই অনেক কিছু দেখবার আছে। গোম্পার কাছে রাজার একটা বাড়ি আছে। খানিকটা তফাতে একটা বড় স্কুল, আর সরকারী হোটেল। বিদেশী টুরিস্টরা এই হোটেলে থাকে। যাতায়াতের পথের ধারেই দেখতে পাবেন সরকারী অফিস, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস।

তারপর ?

পাহাড় থেকে নেমে হোটেলে ফিরে আসবেন না।

তবে কোথায় যাব ?

সোজা এগিয়ে যাবেন। নদীর পুল পেরিয়ে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট দেখে আসবেন। নতুন গড়ে উঠছে এই এস্টেট। নানা রকমের কটেজ ইণ্ডাস্ট্রির কাজ হচ্ছে দেখতে পাবেন। ঘুরে দেখতে মন্দ লাগবে না। ভয় নেই, হাঁটতে হবে না। ট্যাক্সি ড্রাইভার আপনাদের সব দেখিয়ে আনবে। আর তারপরেও যদি কিছু দেখতে চান তো দুপুরে আহারের পর ঐ দিকেই আবার যাবেন সিনেমা দেখতে। হিন্দি ছবি চলছে। সন্ধ্যে হবার আগেই হোটেলে ফিরে আসতে পারবেন।

চা শেষ করে ভদ্রলোক আমাদের দিকে তাকালেন। আমাদেরও চা শেষ হয়ে গেছে দেখে বললেন : এবারে আমাকে বিদায় দিন।

বলেই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন।

স্বাতিও উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল : আবার কখন দেখা হবে ?

ভদ্রলোক একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন : আবার !

হ্যাঁ, আবার আপনার দেখা পেতে চাইছি।

কেন বলুন তো।

মনে হচ্ছে আপনার কাছে আরও অনেক কিছু জানা যাবে।

আমি বললুম : নিজের পরিচয় দিলে আমরা আপনার বাড়িতেও যেতে পারি। কিন্তু—

বলুন।

আমি তো এখন একা আছি। আমিই বরং এখানে চলে আসব।

স্বাতি বলল : তাহলে রাতে আমরা এক সঙ্গে ডিনার খাব।

ভদ্রলোক বলে উঠলেন : না না, খাবার কথা ভাববেন না। আমি নিজের বাড়িতেই খাব। আপনাদের এন্টার্টেন করতে পারব না বলেই আমি লজ্জিত বোধ করছি।

এতে লজ্জার কোন কারণ নেই। আপনার উপদেশ মতো আমরা নদীর ধার থেকে শহরের এই দিকটা দেখে ফিরে আসছি।

ভদ্রলোক বললেন : এই অবকাশে আমিও কাজ শেষ করে আসছি।

একসঙ্গেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। ভদ্রলোক নদীর দিকে যাবার পথটা দেখিয়ে দিয়ে নিজে বড় রাস্তার দিকে চলে গেলেন।

প্রথমেই একটা বইয়ের দোকান দেখে আমরা সেখানে ঢুকে পড়লুম। হিন্দি ও ইংরেজী বই থরে থরে সাজানো আছে। কিছু বাংলা পত্রপত্রিকাও আছে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে শহরে অনেক বাঙালীরও বাস আছে। তাঁরা চাকরি বা ব্যবসার জন্য এখানে আছেন। বাস করেন সপরিবারে। ভুটানের সম্বন্ধে কোন বই বা পর্যটন পুস্তিকা পাওয়া গেল না। ড্র্যাগন কান্ট্রি নামে একখানা চটি ইতিহাসের বই পাওয়া যায়। কিন্তু সে বইখানা এ দোকানে নেই, অন্য দোকানে থাকতে পারে। তবে সিকিমের ওপরে একখানা শিশুপাঠ্য বই আছে। সেখানা দিল্লী থেকে প্রকাশিত হিন্দি বই।

স্বাতি খোঁজ খবর নিচ্ছিল। বললুম : দেরি করে লাভ নেই। তার চেয়ে বেলা থাকতে নদীর ধারটা ঘুরে আসা যাক।

সেই ভাল।

বলে স্বাতি দোকান থেকে পথে নেমে এসে এগিয়ে চলল। ভদ্রলোক বলেছিলেন যে এই পথেই কিছুটা এগিয়ে ডান দিকের একটা গলি ধরে নদীর ধারে পৌঁছতে হবে। তাই আমরা ডান দিকে চোখ রেখেই এগোচ্ছিলুম। এক জায়গায় এসে দেখলুম যে কিছু লোকজন আসছে ডান দিকের একটা গলি দিয়ে। কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করেই আমরা সেই গলির পথ ধরে এগোলুম। খানিকটা উঁচু নীচু পথ পেরিয়েই খোলা মাঠে পৌঁছলুম। তারপরেই দেখতে পেলুম নদীর পাথুরে বুক।

দুতিখোলা নদীর নাম আমি আগে শুনি নি। পাহাড়ে এই রকমের ছোট নদী অজস্র আছে। ঝর্নার মতো পাহাড়ের গা বেয়ে তারা নীচে নামে, তারপর কোন নদীর সঙ্গে মিশে যায়। গ্রামের মানুষ আদর করে এইসব ঝর্নারও একটা নাম দেয়, আদরের নাম। দুতিখোলাও বোধহয় এই রকমের একটা নাম। শহরের উপকণ্ঠেই এই নদী আমো চুর সঙ্গে মিলেছে। আমো চু নামও আমার জানা ছিল না। কিন্তু বাঙলায় এই নদী তোর্সা নামে পরিচিত। তোর্সার সঙ্গে আমার পরিচয় শৈশবে। আমাদের বাড়ির পিছন দিয়ে এই নদী প্রবাহিত হত। শহরের পশ্চিম দিকে দক্ষিণ মুখো প্রবাহিত হতে হতে পূর্ব মুখে ঘুরে যেত শহরের দক্ষিণে এসে। শহরের অনেক ক্ষতি করেছে একবার। পশ্চিম দিকের অনেক ঘর বাড়ি গ্রাস করেছে। তারপর বাঁধ দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে এই নদীর ভাঙন।

কিন্তু এখানে কোন দুরন্ত নদী দেখতে পাচ্ছি না। পাথরের উপর দিয়ে ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ জলের ধারা। বর্ষা শেষ হয়ে গেছে অনেক দিন। তাই নদী এখন বিস্তীর্ণ নয়। তোর্সার সঙ্গে কোথায় মিলেছে। সেই দৃশ্য দেখবার জন্যে আমি চারিদিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : কাল সকালে খারবন্দী পাহাড়ের গোম্পা থেকে আমরা তোর্সা নদী দেখব।

আমি চমকে উঠলুম স্বাতির কথায়, লজ্জা পেয়ে বললুম : সেই ভাল।

বলে ত্বরিত পদে নদীর ধার থেকে ফেরার পথ ধরলুম। স্বাতি আমার সব দুর্বলতার কথা জানে, আমার ভাবনার উৎস সে সহজে দেখতে পায়।

অল্পক্ষণ পরেই আমরা সদর রাস্তায় ফিরে এলুম। এই পথটি প্রধান রাজপথের সমান্তরাল চলেছে। বুঝতে পারছিলুম যে একটুখানি বাঁ দিকে গেলেই প্রধান রাজপথে

পড়ব। পড়লুমও। শহরের সেই বিরাট গেট এইখানেই। গেট বললে ঠিক বলা হয় না, একে একটা উঁচু তোরণ বলা যেতে পারে। পথ উন্মুক্ত, কোন দরজা নেই। প্রহরীও নেই। এই তোরণ যে ভুটানের নির্মিত, তা এর স্থাপত্যশৈলী দেখেই অনুমান করা যায়। দুধারে দুজোড়া করে থামের উপরে দু চালা ঘরেব মতো ব্যাপার, তার উপরে শিখরও আছে। উপরের দিকটা দেখে একটি কারুকার্যমণ্ডিত বৌদ্ধ মন্দির বলে মনে হবে। ভারতের দিকেও ঘরবাড়ি আছে, তার পিছনে পাহাড। ভুটানের দিকে তো জমজমাট শহর। এই গেটের নীচে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আমরা শহরের মধ্যে বাস স্ট্যাণ্ডে নেমেছিলুম। স্বাতির কাঁধে ক্যামেবা ছিল, বলল : একটা ছবি তুলে নেওয়া যাক। লিখে তুমি ঠিক বোঝাতে পারবে না।

বললুম নেপালে আমরা এই রকমের কোন গেট দেখি নি।

স্বাতি বলল : সিকিমেও দেখি নি।

কিন্তু এই গেট দেখেই বুঝতে পারছি যে আমরা ভারতের বাইরে কোন বৌদ্ধ দেশে এসে প্রবেশ করেছি।

নেপালের স্থাপত্যের সঙ্গে এর কিছু মিল আছে বলে মনে হয়।

খানিকটা তফাতে খান কয়েক ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। ছবি তোলার পর সেই দিকে এগিয়ে যেতেই কয়েকজন ড্রাইভার এগিয়ে এল। তাদের একজনের সঙ্গে ঠিক হল যে আগামীকাল সকাল আটটায় আমাদের হোটেল থেকে তুলে নিয়ে শহরটা দেখিয়ে আনবে। প্রথমে খারবন্দী পাহাড়ে, তারপর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে। ভাড়াও চুক্তি হয়ে গেল।

নিশ্চিন্ত মনে আমরা শহরে ফিরে এলুম। সোজা পথ ধরে দু ধারের দোকানপাট বাস স্ট্যাণ্ড দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলুম পথের শেষ পর্যন্ত। এখান থেকেই একটা পথ খারবন্দী পাহাড়ে উঠেছে ডান হাতে, আর একটা পথ বাঁ হাতে নদীর পুল পেরিয়ে ওপারের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের দিকে গেছে। ফেরার পথে মনে হল যে এই রাজপথের পেছনেও একটা সমান্তরাল সড়ক আমাদের হোটেল পর্যন্ত গেছে। একটা গলিপথে দু একজনকে আসতে দেখে আমরাও ঢুকে গেলুম এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে সে পথটির দুধারেও দোকানপাট। বেশির ভাগ দোকানেই ভারতীয় মালিকানার বলে মনে হল। প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে পাওয়া যায়।

বই কেনার কথা স্বাতির মনে ছিল। একটা বইয়ের দোকান দেখতে পেয়ে সে ঢুকে পড়ল এবং দি ড্র্যাগন কান্ট্রি নামের বইখানা কিনে তার ব্যাগে পুরল।

বললুম : কী হবে এই বই দিয়ে ?

স্বাতি বলল : তোমার কাজে লাগতে পারে।

কীরকম ?

বইখানার চেহারা দেখে স্কুলের পাঠ্য বই বলে মনে হচ্ছে। যদি তাই হয়, তবে এতে ভুটানের সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কথা আছে।

পথ চলতে চলতে বলল : তোমার বিশ্বকোষে ভুটানের যে সব কথা আছে, তা পুরনো হয়ে গেছে। আর ইতিহাস ছাড়াও এ বইয়ে অন্য কথা থাকতে পারে।

বললুম : কাল টুরিস্ট অফিসেও একবার খোঁজ নিতে হবে।

একটা দোকানে আমরা নানা রকমের স্কোয়াশ ও জ্যাম দেখলুম। স্বাতি ভিতরে গিয়ে জেনে এল যে ভুটানেই এই সব তৈরি হচ্ছে। সাম্‌চিতে এর কারখানা আছে। ভুটান সীমান্তের এই শহরে যেতে হয় গয়েরকাঁটা থেকে। এখানে আসার সময় এই

জায়গায় আমরা চা খেয়েছি।

স্বাতি বলল : লেবেলে 'দ্রুক' লেখা দেখলাম কলকাতাতেও পাওয়া যায়। এরা বলল, এদের অরেঞ্জ মার্মালেড আর অরেঞ্জ স্কোয়াশ খুব তাজা। এক রকম বড় বোতলও আছে।

আমি বললুম : তুমি কি সঙ্গে নেবার কথা ভাবছ?

স্বাতি বলল : যা কলকাতায় পাওয়া যায় তা এখান থেকে বয়ে নিয়ে যাবার কোন মানে হয় না। সঙ্গে নিতে হলে চিরকাল মনে রাখার মতো কিছু নিতে হয়, কিংবা কলকাতায় পাওয়া যায় না এমন কোন সুন্দর জিনিস।

আজ আকাশ পরিষ্কার। শীতও পড়েনি। তাই ভাল লাগছিল হাঁটতে। স্বাতি বলল : থিম্ফুতে নিশ্চয়ই শীত পড়েছে। দার্জিলিঙের মতো শীত।

বললুম : ভয় কি। সঙ্গে আমাদের গরম কাপড় আছে।

আর শীতের দেশে এসে শীত না পেলে মনও খারাপ হয়ে যায়।

আমি হাসলুম তার কথা শুনে।

স্বাতি বলল : তুমি হাসছ! সেবারে মরুভূমির দেশে গিয়ে মরুভূমি দেখতে না পেয়ে কি দুঃখ হয় নি?

হয়েছিল।

তবে?

শীতের রাতে বৃষ্টিতে ভিজতে পারলে বোধহয় আরও ভাল লাগবে, তাই না?

স্বাতি সকৌতুকে বলল : কপালে থাকলে তাও হবে।

তখন আমরা হোটেলের সামনে পৌঁছে গেছি। বিদ্যুতের আলোয় ঝকঝক করছে চারিদিক। দরজা ঠেলে আমরা ভেতরে ঢুকে পড়লুম।

১৩

হোটেলের ডাইনিং রুমে ঢুকতেই সামনের কাউন্টার থেকে ম্যানেজার বললেন : আপনাদের বন্ধু এসে গেছেন।

বন্ধু !

হ্যাঁ।

বলে তিনি ডাইনিং হলের একটা কোণা দেখিয়ে দিলেন। আমরা সবিস্ময়ে দেখলুম যে সেই ভদ্রলোক আমাদের আগেই এসে গেছেন। ইনিই আমাদের পার্মিট ও বাসের টিকিট এনে দিয়ে বেড়িয়ে আসবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমরা তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে দেরির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলুম।

ভদ্রলোক একখানা কাগজ পড়ছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে তিনি খুশী হলেন, কিন্তু ক্ষমার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেন : সেকি, আপনারা নতুন জায়গায় বেড়াতে এসে ঘুরেই বেড়াবেন তো ! আমার জন্যে হোটেলে বসে থাকবেন কেন ! আর বেড়াতে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরার কথাই বা ভাববেন কেন ! এর জন্যে আবার অ্যাপলজি কিসের ! এইবারে বসুন তো।

স্বাতি বলল : একটু কফি খাবেন তো ?

বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই কফির অর্ডার দিয়ে দিল। ভদ্রলোকের আপত্তি সে শুনল না।

টেবিলে তাঁর মুখোমুখি বসে বলল : সবার আগে আপনার নামটা জেনে নেব। পরিচয়টা এড়িয়ে গেছেন, কিন্তু নাম বলতে তো আপত্তি নেই !

ভদ্রলোক বললেন : আপত্তি কিছুতেই নেই। আমাকে পেম বলবেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : শুধু পেম ! আমরা দোরজি শুনেছিলুম।

ভদ্রলোক বললেন : নামের শেষ অংশটা অবান্তর বলে বর্জন করেছি।

স্বাতি বলল : তার মানে, আমাদের পেম সাহেব বলতে হবে, তাইতো ?

ভদ্রলোক সহাস্যে বললেন : সাহেব নয়, লা বলবেন। ভুটানে লা শব্দের ব্যবহার হিন্দির জী শব্দের মতো সম্মানজনক।

আমাদের দুজনেরই নামধাম তাঁর জানা ছিল, তাই বললুম : আমাদের সবই তো আপনার জানা, আমরা গোপাল ও স্বাতি নামেই পরিচিত। অনেকে খাতির করে গোপালবাবু বলে বাঙালী কায়দায়, গোপালজী বা গোপাল সাহেব বলে না।

স্বাতি বলল : বন্ধু বান্ধবের মধ্যে আজকাল প্রথম নামের ব্যবহারটাই বেশি চলছে। শুধু নাম, আর কোন লেজুর নয়।

ভদ্রলোক বললেন : সেটাই বোধহয় ভাল, ঘনিষ্ঠতা হয় তাড়াতাড়ি, আন্তরিকতা বাড়ে।

বললুম : আপনার কাছেই আমরা ভুটানের প্রথম পাঠ নেব।

ভেতর দিয়ে—নেফা মানে এখনকার অরুণাচল প্রদেশ—তখনও তাঁদের দর্শন পাই নি। কিন্তু তার জন্যে আমার কোন ক্ষোভ নেই। ক্ষোভ আছে ভুটানের উন্নতির যুগটা দেখতে পাই নি বলে।

বললুম : সে যুগের কথা নিশ্চয়ই জানেন ?

বই পড়ে বা লোকের মুখে শুনে জানা আর নিজের চোখে দেখে জানার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। ভুটানে নব যুগের সূচনা হয়েছিল রাজা জিগ্‌মে দোরজি ওয়াঙচুকের আমলে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

কোন সালে ?

১৯৭২-এর জুলাই মাসে। তাঁর ছেলে বর্তমান রাজা জিগ্‌মে সিঙ্গে ওয়াংচুকের বয়েস তখন আঠারো। তাঁর রয়েল ক্যাবিনেটে তাঁর দুই বোনের বয়েস ছিল উনিশ আর কুড়ি। আর যে দুজন মন্ত্রী, তাঁদের বয়েসও ছিল ত্রিশের কম।

স্বাতি বলল : এত কম বয়েসের ছেলেমেয়ে রাজ্য চালিয়েছেন !

চালিয়েছেন মানে ! সদ্যজাত একটা দেশকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে আমার বাবা মা যদি আমাকে শিক্ষার জন্যে দার্জিলিঙের স্কুলে না পাঠাতেন, তাহলে আমি স্বর্গত রাজার বিয়ের উৎসবটা দেখতে পেতাম। খুব ধুমধাম হয়েছিল বলে শুনেছি।

আমি বললুম : অনেক ঘটনাই আমরা দেখতে পাই নে। তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই।

পেম লা বললেন : আরও একটা ঘটনা আমি দেখতে পাই নি। পণ্ডিত নেহেরু ইন্দিরাকে নিয়ে ভুটানে এসেছিলেন সেই তরুণ রাজার আমন্ত্রণে। এঁদের আমি দার্জিলিঙে দেখেছিলাম। তাঁরা এসেছিলেন হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউটের একটা উৎসবে যোগ দিতে। সিকিমেও এসে নামগিয়েল ইন্‌স্টিটিউট অব টিবেটোলজির উদ্বোধন করেছিলেন। তারপর ভুটানের পারোতে গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আর সেই দেখার পর থেকেই ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ভুটানের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সূত্রপাত। ভুটানের রাজাকে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু।

সালটা আপনার মনে আছে ?

পেম লা একটু ভেবে বললেন : ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস। ফুনছোলিঙের পথ তখনও তৈরি হয় নি, তাই তাঁরা এসেছিলেন গ্যাংটক থেকে চুম্বি উপত্যকার ওপর দিয়ে। আমরাও সেই পথে যাতায়াত করতাম।

স্বাতি বলল : হেঁটে এসেছিলেন ?

হাঁটবেন কেন ! ঝব্বুর পিঠে চেপে এসেছিলেন।

ঘোড়া ছিল না ?

ঘোড়ার চেয়ে ঝব্বুর পিঠে চাপাই তো নিরাপদ ও আরামদায়ক। উৎরাইয়ের পথে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা যায় না তো ! ঝব্বুর পিঠে চাপলে পড়ে যাবার ভয় নেই।

স্বাতি বলল : আমরা যে পথে যাব, সে পথ কবে তৈরি হয়েছে ?

পেম লা বললেন : ভুটানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আরম্ভ ১৯৬১ সালে, দু বছরের মধ্যেই ফুনছোলিঙ থিম্পুর পথ তৈরি হয়ে যায়।

আমি বললুম : শিলিগুড়ি থেকে আপনি নিশ্চয়ই এ পথে যাতায়াত করেছেন ?

অনেকবার !

আজ আমরা শিলিগুড়ি থেকে এখানে এলুম। কিন্তু বাসের ভেতরে বসে থেকে পথের সম্বন্ধে কোন ধারণা হল না।

পেম লা বললেন : তা হওয়া তো সম্ভব নয়। এই অঞ্চলের সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা দরকার, তা না হলে কোন স্থানীয় লোকের সাহায্য নিতেই হবে। অবশ্য যদি কোন ম্যাপ জোগাড় করতে পারেন তো আলাদা কথা।

স্বাতি বলল : আমাদের ভাগ্য ভাল যে আপনার দেখা পেয়ে গেছি। যা কিছু জানবার আছে, তা আপনার কাছেই জানতে পারব।

পেম লা বললেন : আমরা দুটো পথেই যাতায়াত করি। এর মধ্যে একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে। আপনারা ট্রেনে এসেছেন তো ?

হ্যাঁ।

তাহলে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে নামেন নি। নকসালবাড়ি নামের সেই বিখ্যাত জায়গাটি এয়ারপোর্টের মাইল দশেক পশ্চিমে, আর শিলিগুড়ি ছ মাইল উত্তর-পূর্বে। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙ পঞ্চাশ মাইল উত্তরে। একত্রিশ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়েও উত্তরে মহানদী স্যাঙ, চুয়ারির পাশ দিয়ে তিস্তার ওপর করোনৈশন ব্রিজ পেরিয়ে গোরুমারা স্যাঙ্কচুয়ারি দক্ষিণে রেখে গায়েরকাঁটা এসেছে।

স্বাতি বলে উঠল : গয়েরকাঁটায় আমরা চা খেয়েছি।

কিন্তু আর একটা পথেও গয়েরকাঁটা আসা যায়। শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি ধুপগুড়ি হয়েও আসা যায়।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু আমি ভদ্রলোককে কোন প্রশ্ন করলাম না। তিনি বললেন : সিকিমে যেতে হলে করোনেশন ব্রিজ পেরোতে হয় না। তিস্তার পশ্চিম পার দিয়ে তিব্বতের সীমান্ত নাথুলা পর্যন্ত ন্যাশনাল হাইওয়ের একটা শাখা তিস্তার ওপরে অ্যাণ্ডার্সন ব্রিজ পেরিয়ে গ্যাংটকের ওপর দিয়ে গেছে। দুই পুলের মধ্যে দূরত্ব কুড়ি মাইল।

গয়েরকাঁটা থেকেই তো সাম্‌চি যায় ?

হ্যাঁ, পথ পনের মাইল। কিন্তু সে এখানে আসার পথে নয়। আপনারা এসেছেন বীরপারা, মাদারিহাট ও হাসিমারা হয়ে। মাদারিহাট ও হাসিমারার মাঝে জলদাপাড়া স্যাঙ্কচুয়ারি। হোলঙের রেস্ট হাউসে যেতে হয় মাদারিহাট থেকে।

এই সব জায়গার দূরত্ব কীরকম ?

সবই খুব কাছাকাছি। মাদারিহাট থেকে হোলঙ চার মাইলেরও কম, হাসিমারা সাড়ে সাত মাইল। আর হাসিমারা থেকে ফুনছোলিঙ মাত্র দশ মাইল।

আমি বললুম : আমরা শুনেছিলুম যে জয়ন্তি পাহাড়ের ওপারেই ভুটান সীমান্ত। আর একটা ম্যাপ দেখে মনে হয়েছিল যে ফুনছোলিঙ জয়ন্তির খুব কাছে। কথাটা কি ঠিক নয় ?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন : না, হাসিমারা থেকে জয়ন্তি অনেক দূরে। মাইল পঁচিশের কম হবে না। কালচিনি রাজাভাত খাওয়া হয়ে জয়ন্তি যেতে হয়। জয়ন্তি পৌঁছবার আগে অন্য একটা পথ ধরে বক্সা ফোর্টে যেতে হয়।

স্বাতি বলল : তবে সে পথের কথা থাক।

আমার কুচবিহারের পথের কথা জেনে নেবার ইচ্ছে হল। তাই বললুম : কুচবিহার কোন্ পথে যেতে হয় ?

পেম লা বললেন : কুচবিহারে যেতে হলে জলপাইগুড়ি থেকে ধুপগুড়ি এসে উত্তরে গয়েরকাঁটার দিকে না গিয়ে পূর্বে ফালাকাটায় এসে জলদাপাড়া স্যাঙ্কচুয়ারির দক্ষিণ দিয়ে কুচবিহারে যেতে পারবেন। শহরে না ঢুকে এগিয়ে গেলে আসামের গৌরীপুরে পৌঁছে যাবেন।

তারপর বললেন : উত্তরবঙ্গের পথঘাট এখন বেশ ভাল। পরিবহণ ব্যবস্থাও মন্দ নয়। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত তো নিয়মিত বাস যাতায়াত করছে।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল : থিম্ফুর পথের কথা জেনে নিলে মন্দ হয় না, তাই না ?

ভদ্রলোক বললেন : আপনারা তো পরশু দিনের বেলায় যাচ্ছেন ! সবই নিজের চোখে দেখতে পাবেন।

হেসে বললুম : শিলিগুড়ি থেকেও তো আমরা দিনের বেলায় এসেছিলুম !

ভদ্রলোক আমার কথা মেনে নিয়ে বললেন : তা ঠিক। থিম্ফুর পথ সমতলের ওপর দিয়ে নয়। ফুনছোলিঙ ঠিক সমুদ্র সমতলে নয়। আমরা যেখানে আছি, তার উচ্চতা সাতশো উনসত্তর ফুট। খারবন্দী পাহাড়ের গোম্পা আরও আটশো ফুট ওপরে, অর্থাৎ তার উচ্চতা দেড় হাজার ফুট।

থিম্ফু কত উঁচুতে ?

আট হাজার ফুটের কিছু কম, মানে খুব বেশি হলে একশো দেড়শো ফুট কম।

আর দূরত্ব ?

একশো দশ মাইলের মতো। কিলোমিটারের হিশেবে একশো উনআশি। এই পথে অনেক নাম আছে, কিন্তু সে সব জায়গার নাম জানার কোন দরকার নেই। প্রথমেই খারবন্দী মাইল চারেক দূরে, এর পর তক্তিকোটি। সে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে। সেখান থেকে চুখা মাইল পাঁচেক দূরে। তারপর চিমাকোটি।

দূর কত ?

ধরুন মাইল আষ্টেক।এর পরেই বড় জায়গা হল কন্‌ফ্লুয়েন্স। কন্‌ফ্লুয়েন্স বোঝেন তো ?

বললুম : দুই নদীর সঙ্গম, তাই তো ?

ঠিক বলেছেন। পশ্চিম দিক থেকে এসেছে পারো চু, আর থিম্ফু চু নেমেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। এই দুই নদী মিলে হয়েছে ওয়াঙ চু। আর চুখার নীচে বাঙলায় এই নদীর নাম রায়ডাক। চুখার কাছে চুখা প্রজেক্ট চেক পোস্ট আছে। সেখানে যখন থামবেন, তখন সেখানকার হাইডাল প্রজেক্টের দৃশ্য দেখে নেবেন। ওপর থেকে নীচের দিকে একটা রাস্তা নেমে গেছে।

তারপর ?

চুখা থেকে মাইল আষ্টেক এগিয়ে চিমাকোটি।

কিন্তু স্বাতি বাধা দিয়ে বলল : কন্‌ফ্লুয়েন্স থেকেই কি পারো যেতে হয় ?

হ্যাঁ, পারো ষোল মাইল দূরে, তার উচ্চতা সাত হাজার সাতশো পঞ্চাশ ফুট। কন্‌ফ্লুয়েন্স থেকেই হা উপত্যকায় যাবার জন্যে আর একটা পথও আছে। হা শহরের উচ্চতা ন হাজার একশো ফুট, আর দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ মাইল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : কন্‌ফ্লুয়েন্স থেকে থিম্ফু কত দূরে ?

মাইল কুড়ি।

তারপরেই বললেন : একটা কথা মনে রাখবেন। মাঝপথে একটা রোড জংসন

আছে। সেখান থেকে ডান হাতে বেরিয়েছে পুনাখার পথ। ওয়াংদিফোড্রং হয়ে উত্তরে পুনাখা ও পূর্বে তংসা যেতে হয়।

কিন্তু এসব জায়গার কথা জানতে চাইবার আগেই হোটেলের বেয়ারা এসে বলল : ডিনার লাগাব ?

স্বাতি বলল : তিনজনের জন্যে।

একথা বলতেই পেম লা লাফিয়ে উঠে বললেন : না না, তিনজনের নয়। দুজনের জন্যে।

স্বাতি একটু জোর করতেই তিনি বললেন : হোটেলের খাবার আমার সহ্য হয় না। তাই আমাকে ছুটি দিন।

একথা সত্যি কিনা তা বোঝবার আগেই 'গুড নাইট' বলে তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

১৪

আমাদের ট্যাক্সি সময় মতোই এসেছিল এবং আমরাও বেরিয়ে পড়তে দেরি করি নি। শহর খুব জনবহুল নয়, যানবাহনও বেশি নেই। সকাল বেলায় শহর যেন সদ্য আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠেছে, কোন ব্যস্ততা নেই কারও জীবন যাত্রায়। আমরা বাস স্ট্যাণ্ডের সামনে দিয়ে বাজারের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেলুম। তারপর ডান হাতের পথ ধরে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলুম। এই দিকটা দেখেই ফুনছোলিঙকে পাহাড়ী শহর বলে মনে হয়। সুন্দর পরিচ্ছন্ন পথ, ছিমছাম ঘরবাড়ি, সরকারী অফিস ব্যাঙ্ক পোস্ট অফিস। এই পাহাড়েরই নাম খারবন্দী পাহাড়। টুরিস্টদের জন্যে সরকারি হোটেল আছে, বড় স্কুল আছে লেখাপড়ার জন্যে। আমরা গোম্পা দেখতে যাচ্ছি।

গোম্পা শব্দটি বাঙলা অভিধানে নেই। বঙ্গীয় শব্দকোষে গুম্ফা আছে, গোফাও আছে। তার অর্থ গুহা। হিন্দিতে গুফা এবং ইংরেজীতে কেভ্। কিন্তু গোম্পা শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধ লামাদের বিহারকে গোম্পা বলে, ইংরেজীতে বলে মনাস্টেরী। তিব্বতী ভাষায় গোন-পা মানে নির্জন স্থান। সাধারণ লোক গোন-পাকেই গোম্পা বলে। গুহার সঙ্গে গোম্পার একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। লামারা বোধহয় কোন সময়ে নির্জন স্থানের অন্বেষণ করতেন সাধনার জন্য এবং আশ্রয় নিতেন পর্বতের নির্জন গুহায়। হয়তো একাধিক লামা একত্র বা কাছাকাছি বসবাস করতেন। তারপর প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হলে নিজেদের একত্র বসবাসের জন্য বিহার নির্মাণ করতেন। সাধারণত এইসব বিহার নির্মিত হত লোকালয় থেকে দূরে, পাহাড়ের ওপরে কোন নির্জন স্থানে। সাধারণ লোকে লামাদের এইসব নির্জন আবাসকে গোন-পা বা গোম্পা বলত। এখনও বলে। ইংরেজীতে এরই নাম monastery। বাঙলায় কোন প্রতিশব্দ নেই বলেই একে আমরা গোম্পা বলি।

সাধারণত গোম্পাগুলি পূর্বমুখী. প্রভাতের প্রথম সূর্যরশ্মি আসে গোম্পায়। কিন্তু পাহাড়ে সব সময়ে এই সুবিধা হয় না। তখন দক্ষিণ-পূর্ব বা দক্ষিণ মুখেও গোম্পা নির্মিত হয়। পাহাড়ে ঘরবাড়ি নির্মাণের বেলাতেও এই নিয়মই মানা হয়'। সূর্যের আলো না এলে বাসস্থান আরামের হয় না।

সিকিম ভ্রমণের সময়ে মিস্টার গিরির কাছে আরও দুটি শব্দ শুনেছিলুম, ছোর্তেন আর মেনডঙ। তিনি সংক্ষেপে বলেছিলেন যে ছোর্তেন হল সমাধি স্থান। শুধু বুদ্ধের নয়, বড় বড় লামাদেরও ছোর্তেন আছে। আর পথের ধারে নীচু দেওয়ালের গায়ে ওম্ মনিপদ্মে হুম বা ঐ ধরনের যে সব প্রার্থনার মন্ত্র লেখা থাকে তারই নাম মেনডঙ। পরে জেনেছিলুম যে ছোর্তেন শুধু সমাধি স্থান নয়, কোন মুনি বা লামা এসে পদার্পণ করলেও সেইখানে সেই স্মৃতিরক্ষার জন্যেও ছোর্তেন নির্মিত হয়।

আমরা চড়াই পথে পাহাড়ের উপরে উঠছিলুম কতকটা নিঃশব্দে। কারও মুখেই কোন কথা ছিল না। কিন্তু গাড়ির গতি কিছু মন্থর হতে দেখে স্বাতি বলল : তোমার

দৃষ্টি তো পথের দিকে নেই! তুমি কিছু ভাবছ বলে মনে হচ্ছে!

আমি স্বাতির দিকে তাকালুম। কিন্তু কোন কথা বললুম না দেখে স্বাতিই আবার বলল : ঠিক ধরেছি, তাই না?

বললুম : মন কখনও অলস হয়ে থাকতে চায় না, ঘুমের সময়েও সে তার কাজ করে যায়, স্বপ্ন দেখে।

স্বাতি বলল : তুমিও কি স্বপ্ন দেখছ?

বললুম : স্বপ্ন দেখছি না, ভাবছি স্বপ্ন দেখব কিনা!

একটু বুঝিয়ে বল।

ভুটান সম্বন্ধে আমরা সামান্যই জানি। কিছু জানি না বললেও ভুল হবে না। ইচ্ছে করলে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে অনেক কিছু বলা যায়। কেউ আপত্তি করতে আসবে না। আবার এতদিন যা করেছি সে চেষ্টাও করতে পারি।

কীরকম?

জানবার চেষ্টা। যা জানি না, তার অনুসন্ধান। কতটা সফল হব, তা অনুমান করতেও পারছি না।

স্বাতি বলল : অনুসন্ধান করাই তো আমাদের কাজ। তাতে ফল না পেলেও দুঃখ নেই।

তাহলে চোখ বুঁজে কিছু দেখলে চলবে না, দেখতে হবে চোখ মেলে সাদা চোখে। তুচ্ছ বলে কিছু বাদ দিলে হিশেবের ভুল হতে পারে।

আমাদের ট্যাক্সি এসে পথের একটা ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। ড্রাইভার নিজে নেমে স্বাতির দিকের দরজাটা খুলে ধরতেই স্বাতি নেমে পড়ল। আমিও নামলুম। বুঝতে পারলুম যে এর পর খানিকটা হেঁটে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

এক জায়গায় একটা গেটের সামনে একখানা বিদেশী গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। ঝকঝকে নতুন গাড়ি। প্রহরী দাঁড়িয়েছিল গেটে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে বাড়ির মালিক কোন সাধারণ গৃহস্থ নন। রাজ পরিবারের কেউ এই বাড়িতে এখন আছেন বলে সন্দেহ হল।

কিন্তু স্বাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এই গেটের পাশেই আর একটি গৃহ। সেটি পথের ধারে একটি টিলার মতো উঁচু জায়গায় অবস্থিত। গৃহ বলা উচিত হবে না। একটি বড় ঘর, তার ছাদ চালার মতো একটির উপবে আর একটি, তার উপরেও আর একটি ছোট চালা। এই গৃহের সামনে একটি বিরাট আকারের উল্টোনো ঘণ্টার মতো দেখতে পাচ্ছি। কোন ধাতুর নয়। ইটের তৈরি সাদা চুনকাম করা একটি স্তূপের মতো। স্বাতি বলল : এইটেই গোম্পা বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললুম : আর সামনের স্তূপটি বোধহয় ছোর্তেন।

স্বাতি বলল : কথাটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

তা হওয়াই স্বাভাবিক। গ্যাংটকে মিস্টার গিরির কাছে শুনেছিলুম ছোর্তেন আর মেনডঙের কথা।

ভুলে গেছি।

বললুম : ছোর্তেন সাধারণত লামাদের সমাধি, আর মেনডঙ পথের ধারের মন্ত্র লেখা দেওয়াল।

গোম্পার মধ্যে সমাধি!

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাতে বললুম : বৌদ্ধ বিহারে বোধহয় এই

রকমই হয়। বোধ গয়াতেও দেখেছি, মূল মন্দিরের এলাকাতেই ছোট বড় নানা আকারের স্তূপ। তবে সব ছোর্তেনই যে লামাদের সমাধি, তা নয়। গোম্পায় কোন বড় লামা এসে পদার্পণ করলেও তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যেও এই রকম ছোর্তেন তৈরি হয়।

পথের ধার থেকেই ধাপে ধাপে পাথরের সিঁড়ি টিলার উপরে উঠেছে। কেউ ওঠা-নামা করছে না। শুধু আমরাই উপরে উঠে একটা সমতল ক্ষেত্রে পৌঁছে গেলুম। প্রথমেই এসে দাঁড়ালুম সেই ছোর্তেনের সামনে। কিন্তু স্বাতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল অন্য দিকে। বলল : আগে এই দিকে চলে এসো।

সে দাঁড়িয়েছিল পশ্চিমের দিকে মুখ করে প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে। সেখানে এসে সমতলের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। নীচে ফুনছোলিঙ শহর দেখা যাচ্ছে প্রসন্ন আকাশের নীচে। পিছনে শ্যামল পাহাড়, আর তার কোল দিয়ে বয়ে যাচ্ছে প্রশান্ত নদী। এ নিশ্চয়ই দুতিখোলা নয়, এ তোর্সার স্রোত। বর্ষার পরে শীর্ণ হতে শুরু করেছে। কিন্তু শুকিয়ে যায় নি। শীতে বোধহয় তার পাথুরে বুকের উপর দিয়ে সঙ্কীর্ণ জলের ধারা ঝিরঝির করে বইবে। পাহাড়ের নদীর এই অবস্থাই হয়। কিন্তু যে নদীর জন্ম হিমালয়ের হিমবাহ থেকে, তার রূপ অন্য রকম। বৃষ্টির জলে তার পুষ্টি নয়, তার ঢল নামে প্রখর তাপে তুষার গলা জলে।

স্বাতি বলল : এই নদীই তো তোর্সা !

বললুম : তাই মনে হয়।

এ তো তোমার পরিচিত নদী !

শৈশবের পরিচয়। কিন্তু বড় অন্তরঙ্গ। এই নদীর সঙ্গে যেন আমাব নাড়ির যোগ আছে।

যেমন জন্মভূমির সঙ্গে। সেও তো জননীর মতো স্বর্গের চেয়েও প্রিয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল আমার। আর সেই শব্দে স্বাতি চমকে উঠে বলল : কী হল ?

বললুম : জননী বা জন্মভূমিকে আর আমরা আগের মতো প্রিয় ভাবি না। যেদিন তা ভাবতাম, সেদিন নিজের দেশকেও ভালবাসতাম। দেশের জন্যে অনেক স্বার্থত্যাগ করতে পারতাম। প্রাণ দিতেও পারত অনেকে।

স্বাতি কিছু বিষণ্ণ হয়ে বলল : কেন এমন হল, বলতে পার ?

সমাজের সর্বস্তরে আমরা স্বার্থপরতার প্রশ্রয় দিচ্ছি। ধর্মে আর আমাদের আস্থা নেই।

কেন ?

ধর্মেব মানে বদলে গেছে।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল : কী বকম ?

বললুম : আগে ধর্মের মানে ছিল মানুষেব মতো জীবন যাপনের নীতি। অন্যে যা করলে নিজেব ভাল লাগে, সেই কাজই ধর্ম। নিজের যা ভাল লাগে না, অন্যের বেলায় তা করলেই অধর্ম হবে। এই ছিল মানুষের ধর্ম। যাগযজ্ঞ পূজা-পাঠ আচার-নিষ্ঠা উৎসব—এই সবই এখন ধর্মের স্থান অধিকার করেছে। ভগবান তো পাথরে বা পুঁথিতে নেই। ভগবান মানুষের মধ্যে আছেন। মানুষকে কষ্ট দিয়ে ভগবানের আরাধনা হয় না।

স্বাতি বলল : কিন্তু আজ তোমার এ সব কথা মনে আসছে কেন ?

মনে আসছে বুদ্ধের কথায়। যে দেশে আমরা এসেছি, দাঁড়িয়ে আছি যেখানে,

সেখানে বুদ্ধই ভগবান হয়েছেন। কিন্তু ভগবানে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি মানুষকেই ভগবান ভাবতেন।

স্বাতি বলল : বুদ্ধের কথা তোমার কাছে আবার শুনব।

কিন্তু আমি এ কথার উত্তর দেবার আগেই দেখলুম যে একজন লামা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি তাঁর দিকে ফিরে দু হাত তুলে নমস্কার করলুম। স্বাতিও নমস্কার করল তাঁকে।

তিনি বোধহয় জানতে চাইলেন, আমরা গোম্পা দেখতে এসেছি কিনা। প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে না পারলেও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। তিনি আমাদের গোম্পার ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

গম্ভীর প্রশান্ত ভাব ভিতরে। ধর্ম চর্চার উপযুক্ত স্থান। মাখনের প্রদীপ জ্বলছে, তার মৃদু সৌরভ। ভিতরের আড়ম্বরের দিকে আমাদের দৃষ্টি গেল না, বুদ্ধকে প্রণাম করে আমরা বেরিয়ে এলুম নিঃশব্দে। তারপর ছোর্তেনের সামনে এসে দাঁড়ালুম।

লামা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন আমাদের পাশে, তারপর ধীর পদক্ষেপে ফিরে গেলেন।

স্বাতি এই ছোর্তেনের গঠন রীতি মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। আমিও সেই দিকে নজর দিলুম। একটি চতুষ্কোণ ভিতের উপরে যেন একটি হাতলওয়ালা পুজোর ঘণ্টা বসানো আছে। তার বিরাট আকার। হাতল ঠিক দণ্ডের মতো নয়, উপরের দিকে সরু হয়ে উঠেছে। তার উপরে ছাতার মতো। সবচেয়ে উপরে একটি অর্ধচন্দ্রের মধ্যে গোলাকৃতি সূর্য। গত রাত্রে দি ড্র্যাগন কান্ট্রি পড়ে জেনেছিলুম যে সত্যিই এরা চন্দ্র সূর্যের প্রতীক, নাম নিমা-দাওয়া।

এক সময়ে বুদ্ধ বা লামাদের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার জন্যে স্তূপ নির্মিত হত। তারপর সমাধি। এখন স্মরণীয় ঘটনা নিয়েই ছোর্তেন নির্মিত হচ্ছে। ছোর্তেন আট রকম। তাশি জুংগে চৈত্যের মতো প্রার্থনার মন্দির, বুদ্ধের নামে জংছুপ ছোর্তেন। লাভুপ ছোর্তেন তাঁর স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আগমনের প্রতীক এবং নিয়াঙ্গদে ছোর্তেন স্মরণ করিয়ে দেয় বুদ্ধের বুদ্ধ হবার ও তাঁর নির্বাণের কথা। এরপর ধর্মের নামে ছোর্তেন—ধর্ম বিস্তারের জন্য ছুখোর, ধর্ম বিরোধে শান্তি ও সহিষ্ণুতার জন্য ইয়েনধুম, নিজেদের ধর্ম জানার জন্য জিনলাপ এবং ধর্মের প্রসার ও প্রভাব বৃদ্ধির জন্য নামগিয়াল ছোর্তেন।

এইসব বড় বড় ছোর্তেন। এর কাছে কাপড়ের নিশানও ওড়ানো হয়। তাতে নানারকমের মন্ত্র লেখা থাকে। বাতাসে সেই নিশানের টুকরো যদি ছিঁড়ে উড়ে যায় তো তা শুভ ইঙ্গিত বলেই মনে করা হয়। মন্ত্রের মঙ্গল বার্তাই তত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে বলে জনসাধারণ বিশ্বাস করে। তাই নিশান ওড়াবার কাজও ধর্মের অঙ্গ বলে স্বীকৃত। এই বিশ্বাস নিয়েই পথের ধারে নীচু দেওয়ালের উপরেও মন্ত্র লেখা হয়—ওম মণিপদ্মে হুম্। পদ্মের মধ্যে আছেন যে অবলোকিতেশ্বর, তাঁকে নমস্কার। পদযাত্রীরা এই মন্ত্রকে নমস্কার করে যায় তাদের যাত্রা পথে। এরই নাম মেনডঙ। বুদ্ধের বাণীকে গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্যেই এই সব নির্মিত হয়েছে শ্রদ্ধার সঙ্গে। এ দেশের মানুষ বিশ্বাস করে যে জীবনে ধর্মের চেয়ে বড় আর কিছু নেই, ধর্মই জীবন। ধর্ম শুধু গোম্পায় নয়, ধর্ম আছে পথে প্রান্তরে। সেই ধর্মকে কুড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে নিজের গৃহে, বুকে ধরে রাখতে হবে বিশ্বাস দিয়ে।

তাই ক্ষুদ্রায়তন ছোর্তেনও তৈরি হয় এ দেশে। মিনিয়েচার ছোর্তেন কাঠ মাটি বা ধাতুর তৈরি ছোর্তেন। অনেক সময়ে তার মধ্যেও থাকে পবিত্র স্মৃতি সম্পদ। তার

স্থান হয় উপাসনার বেদীর উপরে। এই সব ছোর্তেনের মধ্যে যখন দেবতা বা মুনি-লামাদের ছোট মূর্তি থাকে, তাকে বলা হয় তাশিগোমন, মানে গৌরবান্বিত ছোর্তেন। সাধারণত তাশিগোমন কোন বিশেষ দিনে গ্রামে গ্রামান্তরে জনসাধারণের সামনে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ির ওপরে নির্মিত হয়।

আমরা নিঃশব্দে ফিরে এসে আমাদের ট্যাক্সিতে বসেছিলাম। মন আমাদের আচ্ছন্ন হয়েছিল এক রকমের গম্ভীর ভাবে। মনে হচ্ছিল যে এই পাহাড়ের উপরে এই নির্জন স্থানে এই গোম্পার বার্তা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার কত অভিনব ব্যবস্থা আছে এই দেশে। এখানে আসবার আগে স্বাতিকে আমি এই সব কথা বলেছিলুম। তাই নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন হল না।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল: স্কুল দেখবেন?

স্বাতি বলল: না।

হোটেল?

তাও না।

তবে আমরা নীচেঁ নেমে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটেই যাই।

বলে ড্রাইভার পুরনো পথেই পাহাড় থেকে নেমে এল। এই খারবন্দী পাহাড়টাই ফুনছোলিঙ শহরের শৌখিন অংশ। নীচে শুধু বাজার আর বাস স্ট্যাণ্ড। আর তার পিছনে পাহাড়ের কোলে তোর্সা নদীর প্রশস্ত বুক। পাহাড়ের উপরে গোম্পার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা এই দৃশ্য দেখেছিলুম। এবার শহরে না ফিরে সোজা রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে গিয়েই যেন শহরের বাইরে পৌঁছে গেলুম। মনে হল, ছোট একটা পুল পেরিয়ে এলুম। তারপরে শহরের উপকণ্ঠে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ঘরবাড়ি।

ড্রাইভারের আগ্রহে আমরা কয়েক জায়গায় নামলুম। নানা রকমের কুটির শিল্পের ব্যবস্থা হয়েছে। ছোট ছোট শিল্প সংস্থা। কোথাও তাঁত বসেছে, কার্পেট তৈরি হচ্ছে, কোথাও বা লজেন্স তৈরি হচ্ছে, মেয়েরা মোড়কে মুড়ে বিক্রির জন্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করছে।

বুঝতে একটু অসুবিধা হয় না যে একেবারে সাম্প্রতিক কালে শিল্পের মর্যাদা উপলব্ধি করেছে এ দেশের মানুষ। নতুন উদ্যম দেখা দিয়েছে মানুষকে শিল্পকর্মে নিয়োজিত করবার জন্যে। কোন বড় কল কারখানার আমদানি এখনও হয় নি। শিল্পের উদ্যোগ এখনও কুটির শিল্পেই সীমাবদ্ধ আছে। কিন্তু এই জাগরণ নিশ্চিতভাবেই একটি নূতন যুগের সূচনা করছে। এই প্রয়াসই এক দিন সার্থক হয়ে উঠবে। যে দেশে ধর্মই এক দিন জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেই দেশের মানুষ শিল্পের প্রয়োজনীয়তাও মেনে নিয়েছে। কৃষিকর্ম তো জীবনধারণের সঙ্গে যুক্ত, শিল্পও জীবনে অপরিহার্য। ধর্মের মতো শিল্পকেও আমাদের ভালবাসতে হবে। শিল্পের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি।

ফেরার পথে ট্যাক্সির ড্রাইভার একটা সিনেমা হল দেখিয়ে বলল: বিকেলে কি সিনেমা দেখবেন?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: কেন বলতো?

লোকটি বলল: আপনাদের হোটেল থেকে এই জায়গা তো দূরে, হেঁটে আসতে আপনাদের কষ্ট হবে। তাই—

বললুম: বুঝেছি।

স্বাতি বলল : আজ আমাদের অন্য কাজ আছে।

আমরা হোটেলে ফিরলুম না। হাতে অনেক সময় ছিল বলে শহরের শেষ প্রান্তে পৌঁছেই নেমে পড়লুম। স্বাতি ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল। তারপর পায়ে হেঁটে আমরা বাজার দেখতে দেখতে এগোলুম। বাজার অঞ্চলে পাশাপাশি দুটি পথ আছে সমান্তরাল। নানা পণ্যে সাজানো দোকান। শহর জীবনে যা কিছু প্রয়োজন হয়, তার সবই পাওয়া যায় এই সব দোকানে। ভারতীয় টাকাতেই সব কিছু পাওয়া যায়। ভুটানের সর্বত্রই ভারতীয় টাকা চলে। নেপালের মতো টাকা বদল করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য নেপালেও দেখেছি যে ভারতীয় টাকায় কোন অসুবিধা হয় না। ভারতীয় টাকার মূল্যই বেশি। হোটেলে, বড় দোকানে, ব্যাঙ্কে ভারতীয় টাকাতেই কাজ চলে। তবে পোস্ট অফিসে ভুটানের ডাকটিকিট ও পোস্ট কার্ড পাওয়া যায়।

পথে ভিড় নেই। লোকজন কম। দু একটা দোকানে ক্রেতা আছে। বেশ নির্জন শান্ত পরিবেশ। লোক এখানে ছুটছে না। ছুটে চলার প্রয়োজন নেই। এখানকার মানুষ এখনও ধীরে হাঁটতে অভ্যস্ত। আর কত দিন তারা এই ভাবে চলতে পারবে তা জানা নেই।

সরল মানুষের মধ্যে সভ্যতা তার বিষ ছড়ায় অল্প অল্প করে। সেই বিষে মানুষের মৃত্যু হয় না, হয় নেশা—রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলার অভ্যাস। কোনখানে স্থির হয়ে থাকতে দেয় না, গভীর ভাবে ভাবনার অবকাশ নেয় কেড়ে। চোখ কান বন্ধ করে মানুষ ছুটতে আরম্ভ করে। কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, হারিয়ে যায় পথে। কেউ এগিয়ে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু কেন ছোটে, কিসের জন্যে ছোটে, ছুটে কী পাবে—তা জানে না, জানবার চেষ্টাও করে না। শুধু জানে যে তাকে ছুটতে হবে, বেঁচে থাকবার জন্যেই এই ছোটা।

অতীত ? এ যুগের মানুষের কাছে অতীত বলে কিছু নেই। অতীত মুছে গেছে অন্ধকারে। সামনে পড়ে আছে ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎ গড়তে হলেই মানুষকে ছুটতে হবে, ছোটা শিখতে হবে। সভ্যতার এই মন্ত্র, এই মন্ত্রই সভ্যতা।

হোটেলের কাছাকাছি এসে স্বাতি বলল : এই ভাবে ধীরে ধীরে হাঁটতে বেশ লাগছে। তাই না ?

আমি বললুম : এমনি করে হাঁটার কথা আমরা ভুলে গেছি।

স্বাতি বলল : কিছু দিন আগেও তো এ দেশের সর্বত্র হাঁটতে হত !

বললুম : তাই এরা আরও কিছু দিন হাঁটবে। তারপরেই ছুটতে শিখবে আমাদের মতন। রুদ্ধশ্বাসে ছুটবে। ছুটতে না পারলে পিছিয়ে পড়বে।

কোন কথা না বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। তার দৃষ্টিতে আমি বিস্ময় দেখলুম।

১৫

দুপুর বেলায় আমি ভুটানের ইতিহাস পড়ছিলুম। এই ইতিহাস বিশ্বের অন্য দেশের মতো নয়। এ দেশের ইতিহাস লেখার চেষ্টা আগে কখনও হয় নি। তাই এর অতীতের কথা কারও জানা নেই। ভুটানের ইতিহাস জানতে হলে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে তার সম্বন্ধের কথা জানতে হবে। অন্য দেশের ইতিহাস থেকেই খুঁজে পেতে হবে ভুটানের প্রাচীন ইতিহাস।

যে বইখানি আমরা পেয়েছি, তা বোধহয় স্কুলে পড়ানো হয়। এই বইয়েও অনেক কথা অনুমান করা হয়েছে। ভুটান নাম নিয়েই এতে কিছু আলোচনা আছে। আমরা জেনে গেছি যে ভুটানবাসীকে ভুটিয়া বা ভোটিয়া বলে না। বলে ভুটানী বা ভুটানীজ, স্থানীয় উচ্চারণে বুটনিজ। এর কারণ ভোটদেশ বলতে তিব্বত বোঝায় এবং তিব্বতের অধিবাসীকেই বলে ভুটিয়া বা ভোটিয়া। ভোট শব্দটি কোথা থেকে এল, তা বোধহয় এখন আর অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে অনেকে মনে করেন যে ভোটের অন্ত বলে এই দেশের নাম ছিল ভোটান্ত। অর্থাৎ তিব্বতের সীমান্তে অবস্থিত এই দেশ ভোটান্ত নামে কোন সময়ে পরিচিত ছিল এবং কালক্রমে ভোটান্তই ভুটানে পরিণত হয়েছিল।

কিন্তু ভোট শব্দটি কোথা থেকে এল, এ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করা দরকার। পণ্ডিতরা সে চেষ্টা করেছেন কিনা জানি না। তবে এই বইয়ে দেখছি যে একজন নাকি বলেছেন যে ভুটানের প্রাচীন নাম ছিল ভূতস্থান। তাঁর মতে কশ্যপ ঋষির এক পত্নীর নাম ছিল ভূতি এবং তাঁরই সন্তানরা ভূত নামে পরিচিত হয়েছিল। আমি যতদূর জানি, দক্ষ প্রজাপতির তেরটি কন্যাকে কশ্যপ বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম অনেকেরই জানা। অদিতি, দিতি, দনু প্রভৃতি নামে কন্যারা আদিত্য দৈত্য দানব প্রভৃতি জাতির জননী হয়েছিলেন। গন্ধর্ব অপ্সরা প্রভৃতি জাতিও কশ্যপের সন্তান সন্ততি। কিন্তু ভূত জাতির নাম আমি আগে কখনও শুনি নি। কশ্যপের তেরোটি পত্নীর মধ্যে কারও নাম ভূতি ছিল বলেও জানি না। তবে এ কথা ঠিক যে তিব্বত অঞ্চলে যক্ষ রক্ষ প্রমথ বা ভূতদের বাস ছিল। ভূতেরা দেবযোনি বিশেষ। অর্থাৎ তারা সাধারণ মানুষ ছিল না। কুবের ছিলেন যক্ষদের রাজা এবং তিনি মানস সরোবর অঞ্চলে বাস করতেন। ভূতেরা শিবের অনুচর। কুবেরও শিবের আশ্রিত ছিলেন বলে পুরাণে পাওয়া যায়।

আমারহাতেরবইখানা আমি কখন নামিয়ে রেখেছিলুম জানি নে। তা দেখতে পেয়ে স্বাতি বলল : কী ভাবছ বলতো ?

সহসা তার এই প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠে বললুম : কিছু ভাবছি বুঝি !

স্বাতি সহাস্যে বলল : এইবারে বল কী ভাবছিলে।

বললুম : শিব ঠাকুরকে আমরা ভূতনাথ ভূতেশ বা ভূতপতি বলি, তাই না ?

স্বাতি বলল : হ্যাঁ, ভূতেরা তাঁর অনুচর বলেই এই সব নাম দেওয়া হয়েছে।

বললুম : ভূতেরাও তো শিবের সঙ্গে কৈলাসে বাস করত, তাই না ?

শুধু ভূতপ্রেত নয়, যক্ষ রাক্ষস ডাকিনী যোগিনী এরাও ছিল শিব ও পার্বতীর অনুচর।

এরা সব কোথায় গেল বলতে পারো ?

স্বাতি বলল : দৈত্য দানব ও দেবতারাই বা কোথায় গেলেন !

বললুম : তাঁদের কথা আমি জানি।

জানো !

বলে স্বাতি প্রবল কৌতূহল নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। তাই দেখে আমি হেসে বললুম : দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ বিগ্রহ করেই তাঁরা নিঃশেষ হয়ে গেছেন। যাঁরা বেঁচে ছিলেন, তাঁরা মিশে গেছেন মানুষের সমাজে।

স্বাতি বলল : ভূতেরাও তাহলে মানুষের সমাজে মিশে গেছে।

বললুম : আমি বলব, তারা এখনও আছে, এখনও তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে।

কী রকম ?

এখন আমরা তাদের ভূত না বলে ভোট বলি। তিব্বতের ভোট জাতি। না না, ভয় পেওনা। এ কোন পণ্ডিতের মত নয়, এ আমার অনুমানের কথা।

স্বাতি স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল : এই জন্যেই কি তুমি এক দিন পুরাণের কথা বলছিলে—দেবতাদের বাসস্থানের কথা, ইলাবৃত বর্ষ আর কিম্পুরুষ বর্ষের কথা ? তুমি কি সত্যিই মনে কর যে হিমালয়ের উত্তরেই ছিল সে কালের স্বর্গ ?

তা মনে করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। আদি মানব মনু যখন তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর রাজ্য ভাগ করে দেন, তখন তাঁর বড় ছেলের ভাগে পড়েছিল হিমবর্ষ, ভরতের নামে যার নাম হয়েছিল ভারতবর্ষ। হিমবর্ষের সঙ্গে হিমালয়ের একটা সম্পর্ক আছে। যক্ষ রাক্ষস ও ভূতপ্রেত নিয়ে যে বর্ষ, তারই নাম কিম্পুরুষ বর্ষ। কিম্পুরুষ বর্ষই একালের তিব্বত।

স্বাতি বলল : তুমি কি ভুটানকেও কিম্পুরুষ বর্ষের অন্তর্গত বলতে চাও ?

না। তা বলব না।

কেন ?

ইতিহাস অন্য কথা বলে। তিব্বতের ভোট জাতি ভুটানের আদিবাসী নয়, তারা তিব্বত থেকে ভুটানে এসে আধিপত্য বিস্তার করে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : তার আগে ?

বললুম : তার আগে ভুটানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয় না। এ দেশ ভারতেরই অঙ্গ ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

কোন প্রমাণ আছে ?

প্রমাণের কথা ভাবতে গেলেই রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণের কথাই আগে মনে আসে। কিন্তু ভুটানের নাম কোথাও পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। হঠাৎ আমার হিউয়েন চাঙের কথা মনে পড়ে গেল। চীনের এই পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগে। যত দূর মনে পড়ে তিনি লিখেছিলেন যে কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মার রাজত্ব কালে ভুটানে তাঁরই আধিপত্য ছিল। ৬৫০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পরেই সেখানকার স্থানীয় নেতাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের আরম্ভ হয় এবং তিব্বত এর

সুযোগ নেবার চেষ্টা করে।

স্থানীয় লোকের সম্বন্ধে কি তিনি কিছু লেখেন নি ?

বললুম : মনে পড়ছে না। তবে ভুটান অঞ্চলে যে হিন্দু রাজাদেরই অধিকার চলে আসছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজ সরকার একখানা গেজেটিয়ার প্রকাশ করেছিল অক্সফোর্ড থেকে। তাতে দেখা যায় যে ভুটানে এক সময়ে ভোটিয়া তেলফু নামে এক জাতির অধিকার ছিল। এরা তিব্বতের ভোটিয়া নয়, এরা উত্তরবঙ্গের কোচ বা আসামের কাছারীদের মতো সমতল ভূমির মানুষ। তিব্বতীরা এসে এদের ওপরেই আধিপত্য বিস্তার করে। ভুটানের পূর্বাঞ্চলে এখনও কিছু আদিম অধিবাসী আছে। তাদের দেখে আসাম বা অরুণাচলের মানুষ বলেই মনে হবে। তারা এখন লোমন ও মন্‌পা নামে পরিচিত। তিব্বতীরাই তাদের এই নাম দিয়েছে, বলেছে দক্ষিণের মানুষ।

স্বাতি বলল : এতো ইতিহাসেরই কথা।

বললুম : এ কথা ইতিহাসেই আছে। এর সমর্থন পাওয়া যায় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায়। ভুটানের বিশ্বস্ত দলিল থেকে নাকি জানা যায় যে নবম শতাব্দীর শেষের দিকে তিব্বতী সেনা ভুটানে এসে ভারতীয় রাজা ও প্রজাদের তাড়িয়ে এই দেশে বসবাস করতে থাকে।

তাদেরও কি তাড়িয়ে দেবার লোক ছিল না ?

ইতিহাসে সে কথা পাওয়া যায় না। তবে অনেক দিন পরে, মানে একশো বছরের বেশি আগে সার অ্যাশ্‌লি ইডেন ভুটানে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে দ্রুক্‌পা নামে ভুটানের বর্তমান অধিবাসীরা তিব্বত থেকে এসে ভুটান জয় করেছিল চার পাঁচ শতাব্দী আগে। তাদের নেতা ছিলেন একজন লামা, তাঁর নাম দুগপনি শেপতুন। ভুটানের আদিবাসীরা পালিয়ে এসেছিল কুচবিহার অঞ্চলে।

স্বাতি বলল : এতো তাহলে পাঁচ ছশো বছর আগের ঘটনা। তার মানে ভুটানের ওপর আধিপত্য নিয়ে তিব্বতীদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ চলেছিল নবম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত।

এ কথার উত্তরে আমি বললুম : চেষ্টা করলে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

কীরকম ?

হেসে বললুম : লামাদের নিয়ে টানাটানি করতে হবে। তিব্বতে লামা ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন পদ্ম সম্ভব। তিনি যে ভারতীয় ছিলেন, তাতে কোন সংশয় নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমরা তাঁর জীবনের তথ্য আবিষ্কার করেছি তিব্বতী সূত্র ধরে। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, আবার তান্ত্রিকও ছিলেন। অর্থাৎ তিনি বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার্যরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

স্বাতি বলল : তা তিনি তিব্বতে গেলেনই বা কেন, আর বৌদ্ধ বা তান্ত্রিক মত প্রচার না করে লামা ধর্মেরই বা প্রবর্তন করলেন কেন ?

কতকটা বাধ্য হয়েই এই কাজ করেছিলেন বলে মনে হয়।

একটু বুঝিয়ে বল।

বললুম : ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে হলে গোড়া থেকেই আরম্ভ করতে হয়। তোমার মতে এও হবে ধান ভানতে শিতের গীত।

কেন ?

ভুটানের ইতিহাস বলতে আমাদের তিব্বতে যেতে হবে, বৌদ্ধ ধর্ম কী ভাবে লামা ধর্মে পরিণত হল সেই কথা জানতে।

স্বাতি বলল : কিন্তু তিব্বতীরাই যখন ভুটানে এসে দ্রুক্পা হয়েছে এবং তাদের পুরনো ধর্মই মেনে চলছে, তখন তিব্বতীদের ধর্মের কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে কেন! এখন তো আমাদের কোন কাজ নেই! তুমি গোড়া থেকেই শুরু কর।

বললুম : তাহলে আমাদের সপ্তম শতাব্দীতে যেতে হবে। ৬৩০ খ্রীস্টাব্দে আমরা তিব্বতে একজন শক্তিশালী রাজাকে পাই। তাঁর নাম সোঙ্গচান গম্পো। এই সব নামের উচ্চারণ ঠিক কী তা জানি নে। তবে আমি একটা নিয়ম অনুসরণ করি।

কি নিয়ম?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাতে বললুম : ইংরেজীতে এই নাম Song Tsen। বাঙলায় লেখা হয় সোঙ্গ ৎসান। ৎসান শব্দটা কি উচ্চারণ করা যায়? আমার মনে হয় যে উচ্চারণটা চ ও স-এর মাঝামাঝি। চান নয়, সান-ও নয়, চয় সয় মেশালে যা হয় তাই।

বলে আমি উচ্চারণটা বোঝাবার চেষ্টা করতেই স্বাতি বলল : পরশুরামের Zাস্তি পারনার মতো। তাই না? আর পেম লাও তো এইরকম উচ্চারণই করছিলেন!

বললুম : ঠিক বলেছ। জ নয়, ইংরেজী Z-এর মতো উচ্চারণ। অনেকে জ-এর নীচে একটা বিন্দু দিয়ে এই উচ্চারণ বোঝাবার চেষ্টা করেন। উর্দু ভাষায় এই রকম উচ্চারণ আছে।

স্বাতি বলল : ফুন্ছোলিঙের উচ্চারণও বোধহয় এই রকম। ছ-এর সঙ্গে স মেলানো আছে। তাই ইংরেজী বানানে Tsh লেখা হয়।

এই যুক্তিতেই আমি হিউয়েন সাঙ বলি না। বলি হিউয়েন চাঙ। তার কারণ স-এর আগে একটা T আছে এবং Ts-এর উচ্চারণ স মেলানো চ।

স্বাতি বলল : উচ্চারণের কথা ছেড়ে যা বলছিলে তাই বল।

বললুম : বলছিলুম তিব্বতের রাজা সোঙ্গচান গম্পোর কথা। তিনি চীনের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত জয় করে ৬৪৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছিলেন। বুঝতেই পারছ যে ইনি ছিলেন ভারতের হর্ষবর্ধন ও কামরূপের ভাস্কর বর্মার সমসাময়িক এবং এঁরই রাজত্বকালে হিউয়েন চাঙ ভারত ভ্রমণ করেছিলেন।

ইনি কি বৌদ্ধ ছিলেন?

কেউ বলেন তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, আবার কেউ বলেন যে তাঁর রানীদের চাপেই তিনি বৌদ্ধ হয়েছিলেন।

কী রকম ব্যাপার?

বলছি। তাঁর প্রতিপত্তি দেখে চীনের সম্রাট তৈচুঙ্গ তাঁর কন্যা বেনছেঙ্গের বিয়ে দিয়েছিলেন সোঙ্গচান গম্পোর সঙ্গে। চীনের ইতিহাসে নাকি এঁর নাম ছিৎসুঙ্গ পুঙসান। এই ঘটনার দু বছর আগেই তিনি নেপালের রাজা অংশুবর্মার কন্যা ভৃকুটি দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। শোনা যায় যে এই দুই রাজকন্যাই বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং বিয়ের পর রাজাকেও বৌদ্ধ ধর্মে আসক্ত করেন। সে যাই হোক, এ কথা সত্য যে এই রাজাই সর্ব প্রথমে নিজের রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের ব্যবস্থা করেন। তিনিই ভারত চীন ও নেপালে দূত পাঠিয়ে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও বৌদ্ধ আচার্য নিজের দেশে আনতে থাকেন। বৌদ্ধ ধর্মকে রাজধর্ম বলে মেনে নেবার পর তিনি তিব্বতে ও আশেপাশে একশো আটটি বিহার বা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

স্বাতি বলল : রাজার গম্পো নাম থেকেই গোম্পা শব্দটা আসে নি তো ?

বললুম : গোম্পা শব্দেরও তো একটা মানে আছে। নির্জন স্থানকে গোম্পা বলে। তবে রাজার নামে বিহার বা মন্দিরের নাম গোম্পা হয়ে থাকলেও আপত্তি করার কিছু নেই। তাই না!

স্বাতি হেসে বলল : আপত্তি করলেই বা শুনবে কে! রাজার নামে নাম, আপত্তি করলেই গর্দান যাবে।

বললুম : রাজার এক দূতের নাম আমরা জানি। তিনি যাঁকে ভারতে পাঠিয়ে ছিলেন তাঁর নাম তোন্‌মি সম্ভোট। তিনি এই দেশে এসে আঠারো বছর ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে কয়েক শো পুঁথি নিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি উত্তর ভারতেরই কুটিল বর্ণমালা মিশ্রিত যে অক্ষরে পুঁথিগুলি লিখে নিয়েছিলেন সেই অক্ষরেই তিব্বতী ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করে প্রচার করেন। এই সময়ে তিনি তিব্বতী উচ্চারণ অনুযায়ী কিছু চিহ্ন ব্যবহার করেন। পরবর্তী কালে এটাই নাকি তিব্বতী বর্ণমালায় পরিণত হয়েছে।

স্বাতি বলল : তুমি আজকাল কথার খেই হারিয়ে ফেলছ।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : কেন বলতো ?

পদ্ম সম্ভবের কথা বলতে গিয়ে তুমি তোন্‌মি সম্ভোটের কথায় এসে গেছ। হেসে বললুম : পদ্ম সম্ভব এর পরের মানুষ বলে তাঁর কথায় আসতে পারছি না। তোমাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে।

বেশ।

বলে স্বাতি নীরব হতেই আমি বললুম : সম্ভোট সম্বন্ধে আর শুধু একটি কথা বাকি আছে।

বল।

বৌদ্ধ ধর্মে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি ধর্ম প্রচার করেন নি। অথচ রাজা সোঙ্গচান গম্পো তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতের অবতার রূপে পুজো পাচ্ছেন। তাঁর দুই রানীও তারা হয়েছেন—চীনের রাজকন্যা বেনছেঙ্গ হয়েছেন শ্বেতাঙ্গিনী তারা আর নেপালের রাজকন্যা ভ্রূকুটি তারা। সপত্নীর সঙ্গে কলহ করতেন বলে ভ্রূকুটি তারার উগ্র মূর্তি নীল রঙের।

তারপর ?

এই রাজার মৃত্যুর পর থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হতে থাকে এবং সমগ্র তিব্বত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। দেশে তখন ভূতের উপাসনা চলছে। এমন সময়ে গম্পোর বংশেই রাজা হলেন তিস্রোঙ দেচাঙ। এঁর মা ছিলেন চীনের সম্রাটের পালিতা কন্যা এবং মায়ের কাছেই তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নেন। আর এই রাজাই ভারত থেকে পদ্ম সম্ভবকে তিব্বতে আনেন।

স্বাতি বলল : পদ্ম সম্ভবকে চিনলেন কী করে ?

বললুম : তাহলে আচার্য শান্ত রক্ষিতের নাম করতে হয়। প্রবাদ আছে যে পদ্ম সম্ভব শান্ত রক্ষিতের বোন মন্দারবাকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু এ কথা সত্য বা মিথ্যা যা-ই হোক, দুজনের মধ্যে যে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এঁরা বিহারের ওদন্তপুরী বা বিক্রমশিলা অথবা নালন্দায় আচার্য ছিলেন। তারপর শান্ত রক্ষিত নাকি তিব্বতের রাজার কুল পুরোহিত হয়েছিলেন এবং রাজাকে পরামর্শ দেন পদ্ম সম্ভবকে তিব্বতে আনার। পদ্ম সম্ভব তখন নেপালে ছিলেন এবং রাজার আমন্ত্রণ

পেয়ে তিব্বতে চলে আসেন।

স্বাতি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল : যাক পদ্ম সম্ভব তাহলে তিব্বতে এসে পৌছলেন ! এইবারে বৌদ্ধ বা তান্ত্রিক ধর্ম ছেড়ে লামা ধর্ম কেন প্রচার করলেন, সেই কথা বল। ব্যাপারটা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই।

বললুম : সত্যি ঘটনাই বলব। নেপাল থেকে তিব্বতের রাজধানীতে আসার পথে তিনি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তিব্বতবাসীর ধর্মচেতনা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করলেন। তারা ভয়ে ভূতের উপাসনা করছে, করছে প্রকৃতি ও সৃষ্টিনাশক প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা। ভয় ও কুসংস্কার থেকেই তাদের পোঙ্ ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। নিজের দেশের বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের কথা তাঁর মনে পড়ল—করাল বদন কালী, দশভুজা দুর্গা, শীতলা বারাহী বিরূপাক্ষর উগ্র মূর্তি যেমন মেনে নিতে হয়েছে, তেমনি করে তিব্বতের ভূত পিশাচ যক্ষ ডাকিনী যোগিনীকেও মেনে না নিলে তিব্বতের সরল অশিক্ষিত মানুষ বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে না। তাই তিনি রাজার দরবারে এসেই ঘোষনা করলেন যে পথে তিনি অপদেবতাদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং তারা বুদ্ধের প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে। পূজা ও বলি পেলে তারা আর জনসাধারণের কোন অপকার করবে না। খুব সহজে তারা বশ্যতা স্বীকার করে নি। তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে যক্ষ রক্ষদের পর্যুদস্ত করেছেন। তবেই তারা বৌদ্ধ ধর্মের বশংবদ হয়েছে। অর্থাৎ ভারতের তান্ত্রিক মহাযান বৌদ্ধধর্মে তিব্বতের প্রাচীন পোঙ ধর্মের স্থান নির্দিষ্ট হল। এরই নাম হল লামা ধর্ম।

স্বাতি বলল : লামা শব্দেরও একটা মানে নিশ্চয়ই আছে ?

শুনেছি তিব্বতী লা-ম শব্দের মানে পরমপুরুষ। পরমপুরুষের প্রভাবেই যক্ষ রক্ষ ও ভূতেরা বশীভূত হয়েছে বলেই যাঁরা এই ধর্ম রক্ষা করবেন, তাঁরাই লামা নামে অভিহিত হবেন। রাজা দেখলেন যে তাঁর প্রজারা পদ্ম সম্ভবের ধর্ম মত মেনে নিচ্ছে নির্বিবাদে, তাই তিনিও এই মত গ্রহণ করলেন। শান্ত রক্ষিত ও পদ্ম সম্ভবের চেষ্টায় ওদন্তপুরীর আদর্শে একটি বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত হল এবং লামা ধর্মের প্রতিষ্ঠা হল এই সাম-রাই বিহারে।

স্বাতি প্রশ্ন করল : পদ্ম সম্ভব কোথাকার মানুষ ছিলেন বলতে পার ?

বললুম : তা বলতে পারব না।

কেন ?

তিব্বতের ইতিহাসে তাঁর জন্মের কথা জানা যায়। তাঁকে পাওয়া গিয়েছিল একটি পবিত্র সরোবরে পদ্মের পাতার ওপরে। তাঁর বয়েস তখন আট বছর। সেই দেশের ইন্দ্রভূতি তাঁকে অলৌকিক উপায়ে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত তন্ত্রাচার্য। পদ্মসম্ভব তিব্বতে যে লামা ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন, পরে তার নাম হয় এীং মাপা। এই ধর্মাবলম্বীরা তাঁকে বুদ্ধের সমান পূজ্য মনে করেন।

স্বাতি বলল : এ কোন নতুন কথা নয়। এই ভাবেই মহাপুরুষদের জন্মের কাহিনী বলা হয়। কিন্তু তোমার একটা কাজ এখনও বাকি আছে।

কী কাজ ?

তুমি বলেছিলে, লামাদের নিয়ে টানাটানি করলেই ভুটানের ইতিহাস জানা যাবে।

বলেছিলুম বুঝি !

ভুলে গেছ ?

একটু ভেবে বললুম : বলছি। ভুটানের ইতিহাসে পেয়েছি যে নবম শতাব্দীর প্রথম

দিকে গুরু পদ্ম সম্ভব ভুটানে এসেছিলেন দুবার—প্রথমবার ৮০৭ খ্রীস্টাব্দে এবং তার দুবছর পরে আর একবার। ভুটানের রাজার আমন্ত্রণেই তিনি এসেছিলেন।

ভুটানের রাজা তখন কে ছিলেন ?

একজন ভারতীয় রাজার ছেলে, নাম তাঁর সিন্ধু রাজা বা নাগুছি। মধ্য ভুটানের বুমথাঙ্গে তিনি সিন্ধু নামে এক রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সিকিম ও তিব্বতের হোর অঞ্চলও তাঁর অধীন হয়েছিল। পদ্ম সম্ভব নাকি একবার এসেছিলেন এক ভারতীয় রাজার সঙ্গে বিবাদের মধ্যস্থতা করতে, আর একবার এসেছিলেন রাজার অসুখের খবর পেয়ে। কিংবদন্তী আছে যে তিনি অপদেবতাদের সঙ্গে এক সপ্তাহ ধরে যুদ্ধ করে রাজাকে আরোগ্য করেছিলেন।

তারপরেই বললুম : ভাল কথা। বলতে ভুলে গেছি যে তিব্বতের রাজা সোঙ্গচেন গাম্পো ভুটানের পারো ও বুমথাঙ্গ উপত্যকায় কিছু গোম্পা ও জাম্পে লাখাঙ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে।

ঠিক এই সময়েই হোটেলের বেয়ারা এসে খবর দিল যে নীচে এক ভদ্রলোক এসেছেন আমাদের খোঁজে।

১৬

আমরা আসছি।

বলে হোটেলের বেয়ারাকে স্বাতি বিদায় দিয়েছিল। এইবারে শাড়িটা ঠিক করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল : গ্যাংটকের মতো এখানেও তোমার পরিচিত কেউ আছে নাকি ?

বললুম : থাকলেও সে খবর পাবে কী করে ?

স্বাতি হেসে বলল : কস্তুরীমৃগের মতো নয় তো !

সে সৌরভ কি এত দূরেও ছড়িয়েছে ?

স্বাতি বলল : বলা যায় না। এখানেও হয়তো অনেক বাঙালীর বাস আছে।

বলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে সে দরজায় তালা দিল। তারপরে দুজনে এক সঙ্গে ওপর থেকে নীচে নামলুম। এই হোটেলে অলস ভাবে বসে আড্ডা দেবার মতো লাউঞ্জ বা কোন বসবার জায়গা নেই। যে ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি ডাইনিং হলেরই একখানা চেয়ার দখল করে বসেছিলেন। আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে ঘরে ঢুকতে দেখে লাফিয়ে উঠে নমস্কার করলেন। পরিষ্কার বাঙলায় বললেন : লুকিয়ে থাকবেন ভেবেছিলেন তো ! তা পারলেন না। ঠিক ধরে ফেলেছি।

স্বাতি একবাব আমার দিকে আড়চোখে চেযে বলল : দেখলে তো !

আর আমি বললুম : লুকিয়ে থাকব কেন !

ভদ্রলোক বললেন : তাই তো আছেন ! কাল সকালে এসেছেন, অথচ কাউকে একটা খবর দেন নি, নিজেরাও বেরিয়ে কারও সঙ্গে আলাপ করেন নি !

স্বাতি বলল : নতুন জায়গা তো !

জায়গাটা আপনাদের কাছে নতুন হতে পারে, কিন্তু আমরা তো নতুন নই। আমরাই এখানকার পুরনো অধিবাসী। এখানে ভুটানী আর ক জন আছে ! আমরা বাঙালীরা আছি, আর আছে নেপালীরা।

স্বাতি বলল : আমাদের কথা কার কাছে শুনলেন ?

অফিসে আজ পেম আপনাদের কথা বলছিল।

কিন্তু—

কিন্তু আবার কী !

স্বাতি একটু ইতস্তত করছে দেখে বললেন : সে তো আপনাদের সব কথাই জানে। আপনারা বাঙালী, কলকাতা থেকে এসেছেন—

স্বাতির দিকে চেয়ে আমি ইসারায় তাকে সতর্ক হতে বললুম। কোনও বেফাঁস কথা বলে ফেললে হয়তো লজ্জা পেতে হবে। তাই আমি নিজেই এবারে প্রশ্ন করলুম ; আর কী বলেছেন ?

ভদ্রলোক বললেন : সত্যি কথাটা আপনারা বোধহয় পেমকে বলেন নি, তাই না ?

কোন উত্তর না দিয়ে আমি একটুখানি হাসতেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন : ঠিক ধরেছি তো ! তা ওদের সত্যি কথা বলবেনই বা কেন !

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : উনি কী ভেবেছেন ?

স্বাতির দিকে চেয়ে ভদ্রলোক বললেন : আপনারা বোধহয় বলেছেন যে ভুটান দেখতে এসেছেন। এ কথা বিশ্বাস করে সে ভারি খুশী হয়েছে। ভাবছে, ওদের দেশও বাঙালীরা দেখতে আসে। আরে বোকা, ভুটানে আবার দেখবার কী আছে ! তোদের দেখতে এসেছে ভেবেছিস ! তোদের গন্ধে তো ভূত পালায় !

আমি স্বাতির মুখের দিকে তাকালুম, আর স্বাতি আমার মুখের দিকে। কিন্তু দুজনের কেউই ভদ্রলোকের কথার উত্তর দিতে পারলুম না।

ভদ্রলোক বললেন : শুধু একটা কথায় আমার ভারি আশ্চর্য লেগেছে।

কোন্ কথায় বলুন তো !

থিম্ফু যাচ্ছেন শুনলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে উঠছেন হোটেলে ! নিশ্চয়ই নিজেদের লোক কেউ আছে। তাই মনে হচ্ছে যে তাদের সাপ্রাইজ দিতে চাইছিলেন। ঠিক বলি নি ?

স্বাতি বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি একটু হাসবার চেষ্টা করে বললুম : আপনার সঙ্গে পরিচয়টা আগে হওয়া দরকার।

ভদ্রলোক বললেন : পরিচয় আবার কী ! আপনারা বাঙালী, আমিও বাঙালী। এটাই তো আমাদের সব চেয়ে বড পরিচয়।

বিকেলের চায়েব সময় হয়েছিল। বেয়ারা এসে কাছে দাঁড়াতেই স্বাতি চায়ের অর্ডার দিল। আর আমি বললুম : আমার নাম গোপাল। কিন্তু ভদ্রলোক তাঁর নিজের নামটা বললেন না দেখে আমিই বললুম . আপনার নামটা জানা থাকলে সুবিধে হত।

আমাকে সবাই দত্তবাবু বলে। অসীম দত্ত। এক সময়ে নাকি পূর্ববঙ্গে বাড়ি ছিল। এখন উত্তরবঙ্গে বাস। বাঙাল থেকে বাহে হয়েছি।

বলে হা-হা করে হাসতে লাগলেন।

চা এলে স্বাতি প্রথম পেয়ালাটি দত্তবাবুর দিকে এগিয়ে দিল। তিনি একটা চুমুক দিয়ে বললেন : আপনারা তো আজ সিনেমা দেখতে যাচ্ছেন !

তাই কি !

বলে আমি স্বাতির দিকে তাকাতেই ভদ্রলোক বললেন : জানি, জানি মশাই। সব জানি। নোরগে সিনেমায় ভাল ছবি আছে। অমিতাভ বচ্চনের হিট ছবি। না না, মিস করবেন না। দেখে আসুন ইভনিং শো।

বলে তাড়াতাড়ি চা শেষ করতে লাগলেন।

স্বাতি বুঝতে পেরেছিল যে গোপাল বা স্বাতি নামের সঙ্গে এঁর পরিচয় নেই। বাঙালী বলেই ইনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এঁর সঙ্গে আলাপ করে কোন লাভ নেই ভেবে স্বাতি কোন প্রতিবাদ করল না।

দত্তবাবু নিজেই বললেন : কাল সকালেই তো আপনারা চলে যাচ্ছেন, ফেরার সময় খবর দেবেন। সন্ধ্যেবেলায় আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব।

কতকটা এক পক্ষেই কথা হচ্ছিল। ভদ্রলোক বললেন : থিম্ফুতেও অনেক বাঙালী আছেন। সরকারী অফিসে অনেক বাঙালী দেখবেন। ভারত সরকার থেকে ডেপুটেশনে এসেছে। তারাই তো অফিস চালাচ্ছে।

তারপরেই বললেন : কিছু ভাববেন না আপনারা। সাড়ে এগারটার মিনি বাসে

যাচ্ছেন তো ! সকালের বাসেই আমি খবর পাঠিয়ে দেব । বাস স্ট্যাণ্ডেই বাঙালীরা আপনাদের রিসিভ করতে আসবে ।

স্বাতি বলল : কী করে খবর দেবেন ?

কী করে !

বলে ভদ্রলোক বেশ রসিয়ে রসিয়ে হাসলেন । তারপর বললেন : বাস ছাড়ার সময় এসে দেখবেন, কজন বাঙালী যাচ্ছে সেই বাসে ।

চা শেষ করে ভদ্রলোক আর আমাদের দিকে তাকালেন না । উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : আজ তাহলে উঠি । আপনাদেব আবার সিনেমায় যাবার তাড়া আছে ।

খানিকটা এগিয়ে গিয়েও ফিরে এসে বললেন : ফেরার সময় খবর দিতে যেন ভুলবেন না ।

বললুম না খবর দেব, তার বদলে জানিয়ে দিলুম : না । ভুলব না ।

ব্যস্ত ভাবে ভদ্রলোক হোটেল থেকে বেরিয়ে গেলেন ।

আমাদের চা তখনও শেষ হয় নি । স্বাতির বিষণ্ণ দৃষ্টির দিকে চেয়ে আমি বললুম : এই জন্যই বোধহয় আমরা সর্বত্র মার খাচ্ছি । এক সময় ভারতের সর্বত্র বাঙালীরা সম্মান পেত । আজকাল ঘৃণাব পাত্র হয়েছে । আমরা ভুলে গেছি যে বাঙালী বলে গৌরব করবার মতো আর আমাদের কিছুই নেই ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বাতি বলল : আমি অন্য কথা ভাবছি ।

কী কথা ?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকাতে সে বলল : আমি আশা করেছিলাম—

বাধা দিয়ে বললুম : আমি জানি কী আশা করেছিলে । তোমার অনেক আশার কথা আমি জানি । কিন্তু সে আশা পূর্ণ করতে যে ক্ষমতার দরকার, তা কি আমার আছে !

স্বাতি বলল : নেই ভেবে হাল ছেড়ে দিও না । শরীর চর্চায় যদি দেহের শক্তি বাড়ে তো অনুশীলনে মনের ক্ষমতা বাড়বে না কেন !

হেসে বললুম : বুদ্ধিতে নাকি শান দিতে হয় ।

কিন্তু স্বাতি গম্ভীর হয়ে বলল : এ হাসির কথা নয়, এ বিশ্বাসের কথা । বিশ্বাস হারালেই পরাজয় ।

হঠাৎ মনে হল যে দরজার কাছে ম্যানেজারের কাউণ্টারে একজন চেনা মানুষকে দেখতে পাচ্ছি । ম্যানেজারের হাতে ভদ্রলোক কিছু গছাবার চেষ্টা করছিলেন এবং তাঁর কথাতেই আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন । আমরাও আশ্চর্য হলুম পেম লাকে দেখে । ম্যানেজারের কাউণ্টার থেকে তাঁর কাগজপত্র সংগ্রহ করে তিনি সহাস্যে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন । নমস্কার করে বললেন : চা-এর কথা বলবেন না । আমি একটা ছোট্ট কাজে আপনাদের কাছে এসেছি ।

স্বাতি বলল : আগে বসুন, তারপর আপনার কথা শুনব ।

পেম লা বসে বললেন : অফিস থেকে ফেরার পথে আমি একবার টুরিস্ট অফিসে ঢুঁ মেরেছিলাম । শুনলাম যে আপনারা সেখানে যান নি । তাই ভাবলাম যে টুরিস্ট লিটারেচার কিছু পেলে আপনাদের হয়তো কাজে লাগতে পারে ।

বললুম : খুব ঠিক কথা ।

আর স্বাতি বলল : টুরিস্ট অফিসের কথা মনে পড়লে আমরা নিশ্চয়ই সেখানে যেতাম ।

খুশী হয়ে ভদ্রলোক বললেন : তাহলে দেখুন, আপনাদের উপকার করতে পেরেছি

কিনা !

বলে হাতের কাগজপত্র আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

সেই কাগজ হাতে নিয়ে দেখলুম যে একখানি সচিত্র ফোল্ডার, তার নাম ভুটান—দি ল্যাণ্ড অফ দি ড্র্যাগন। তাতে ভুটান দেশ সম্বন্ধে কিছু তথ্য এবং কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের পরিচয়। ফটোগ্রাফ আছে, ছোট একটি ম্যাপেও ভুটানের অবস্থান দেখানো আছে। এর সঙ্গে আর একটি ফোল্ডার, তার নাম ওয়েলকাম টু ভুটান। এটি আমি ডাকে পেয়েছিলুম থিম্ফু থেকে। কিন্তু সে কথা গোপন করে বললুম : অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি আমাদের খুব উপকার করলেন।

পেম লা বললেন : না না, লজ্জা দেবেন না, এ কোন সাহায্যই নয়। তবে একটা ঠিকানা এনেছি আপনাদের জন্যে।

বলে পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন : থিম্ফুতে তো আপনারা তাশিছো জং দেখতে নিশ্চয়ই যাবেন। একটু খোঁজ নিয়ে টুরিজ্‌ম্ ডিপার্টমেণ্টের ম্যানেজার মিস্টার স্যাঙ্গির সঙ্গে একবার দেখা করবেন। তাঁর কাছে আপনারা সব রকমের সাহায্য পাবেন।

আমি সেই কাগজের টুকরোয় চোখ বুলিয়ে দেখলুম একটা অফিসের ঠিকানা—ডিপার্টমেণ্ট অফ টুরিজ্‌ম, তাশিছো জং, থিম্ফু, ভুটান। ম্যানেজারের নাম স্যাঙ্গি, নামের আগে বা পরে আর কিছু নেই।

স্বাতি বলল : দেখা করতে পারলে আমাদেরই উপকার হবে।

পেম লা বললেন . থিম্ফু তো নতুন শহর ! পুরনো জিনিস দেখতে দুএক জায়গায় আপনাদের যেতে হবে। পারোতে নিশ্চয়ই যাবেন, আর পুনাখায়। মাঝে ওয়াংদি ফোদ্রংও আপনাদের দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু মনে রাখবেন, এ সব জায়গা দেখবার জন্যে আপনাদের অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াতেই স্বাতি বলল : আপনি উঠছেন কেন ?

আজ আপনাদের সিনেমা দেখতে যাবার কথা ছিল না !

বললুম : না তো !

ভদ্রলোক কিছু বিস্মিত হয়ে বললেন : আমি তো এই জন্যেই আপনাদের কথা জিজ্ঞেস না করে ম্যানেজারের কাছে এই কাগজপত্র রেখে চলে যাচ্ছিলাম !

স্বাতি বলল : নতুন দেশে এসে সিনেমা দেখে সময় নষ্ট করব কেন ! সিনেমা তো কলকাতাতেই দেখা যায়।

খুব ঠিক কথা।

বলে ভদ্রলোক বসে পড়লেন।

স্বাতি খুশী হয়ে বলল : একটা কথা আপনার কাছে জেনে নিতে ইচ্ছে করছে।

বলুন।

এই যে কাগজপত্র আমাদের দিলেন, এর মধ্যে একটির নাম ভুটান—দি ল্যাণ্ড অফ দি ড্র্যাগন। কাল বইয়ের দোকানে আমরা একখানা চটি ইতিহাসের বই পেয়েছি, তার নাম দি ড্র্যাগন কান্ট্রি। ভুটানের সঙ্গে ড্র্যাগনের কী সম্পর্ক ? ড্র্যাগন তো একটি কাল্পনিক জীব !

ভদ্রলোক বললেন : হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকেই আমরা এই জীবের কথা শুনে আসছি। রূপকথার জীব।

বললুম : এ তো শুধু ভুটানের রূপকথায় নয়, চীন জাপানের রূপকথাতে আছে,

আছে খ্রীস্টানদের রূপকথাতেও। তার বিরাট আকার পা চারটে, আবার পাখাও আছে আকাশে ওড়বার জন্যে। মুখ দিয়ে নাকি আগুন বেরোয়। অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে এর ব্যবহার আছে খ্রীস্টান শিল্প ও সাহিত্যে।

পেম লা বললেন : ড্র্যাগনের ছবি দেখেছি আমরা। আর একটা গল্প শুনেছি।

গল্প!

হ্যাঁ, অলৌকিক গল্প। এ গল্প আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না।

বললুম : গল্প জানবার জন্যে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জন্যে নয়। আপনি বলুন।

পেম লা বললেন : গুরু পদ্ম সম্ভব নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ইয়েশি দোর্জির এক শিষ্য ড্র্যাগনদের উপত্যকায় এসে একটি গোম্পা নির্মাণ করবে।

ইয়েশি দোর্জি কে?

রালুং-এর ইয়েশি দোর্জি পেমা দোর্জির শিষ্য। তাঁদের সম্প্রদায়ের নাম ছিল লিঙ্গপা কাজু সম্প্রদায়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইয়েশি দোর্জি যখন একটা গোম্পার প্রতিষ্ঠা করছিলেন, তখন তিনি আকাশে ড্র্যাগন দেখতে পান। এই ঘটনার পরেই তিনি সম্প্রদায়ের নাম রাখেন দ্রুক্‌পা কাজু। ইয়েশির শিষ্য এক তরুণ লামা, নাম স্যাঙ্গিয়ন, রালুং থেকে ভুটানে এসে বসবাস শুরু করেন। এই দ্রুক্‌পা সম্প্রদায়ের নামেই ভুটানবাসীর নাম দ্রুক্‌পা আর দেশের নাম দ্রুক্ হয়েছে।

স্বাতি বলল : বুঝেছি। এই দেশেই ড্র্যাগনদের বাস ছিল বলে তাঁরা মনে করেছিলেন।

পেম লা বললেন : এ সমস্তই সেকালের মানুষের কল্পনা।

বললুম : রূপকথাও তো এই রকম। আমরাও কত রকমের রাক্ষস খোক্কস ভূত কল্পনা করে শিশুদের গল্প শোনাই।

স্বাতি বলল : জাপানী ছবিতে নানা রকমের মন্‌স্টার দেখতে পাওয়া যায়। তাদের বিরাট আকার, বিরাট চেহারা, আর মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরোয়।

আমি বললুম : ইয়েতির কথাও বোধহয় শুনেছেন? তুষার মানব? বরফের ওপরে তাদের পায়ের ছাপ দেখেছেন বলে অনেকে দাবী করেছেন! কল্পনা ছাড়া সেও তো আর কিছু নয়!

পেম লা বললেন : আমাদের ইতিহাসের অনেকটাই তো কল্পনা!

বললুম : যা কল্পনা নয়, এবারে তাই বলুন।

অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে ভদ্রলোক বললেন : আমাকে আপনারা পণ্ডিত ভাববেন না। এ সব কথা আর কারও কাছে জেনে নেবেন।

স্বাতি বলল : সেই ভাল। আর সত্যি বলতে কি, ইতিহাস আমারও ভাল লাগে না।

পেম লা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন : বাঁচালেন আপনি।

তারপর আমাকে হাসতে দেখে বললেন : আপনি হাসছেন তো! আমার অবস্থা আপনি জানেন না বলেই হাসছেন।

স্বাতি বলল : কী রকম?

ভদ্রলোক বললেন : লেখাপড়ার জন্যে স্কুলে অনেক মার খেয়েছি, আর পালিয়ে এসেছি কলেজ থেকে। পাশ করতে পারলে এ দেশে একটা ভাল কাজ পেয়ে যেতাম।

সত্যি!

নিশ্চয়ই পেতাম। যে রাজার আমলে ভুটানের উন্নতি আরম্ভ হয়, তিনি সম্প্রতি মারা গেছেন।

স্বাতি বলে উঠল : তিনি মারা গেছেন!

হ্যাঁ, মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে। এই সেদিন, মানে ১৯৭২ সালের ২১শে জুলাই। তাঁর ছেলে যখন রাজা হলেন, তখন তাঁর বয়েস মাত্র আঠারো বছর এবং ক্যাবিনেটের সদস্যরা ছিলেন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে তরুণ। সে সময়ে আমার একটা ডিগ্রী থাকলে মন্ত্রী না হলেও একটা ভাল কাজ নিশ্চয়ই পেয়ে যেতাম।

ভদ্রলোককে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখে স্বাতি একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, বলল : ভুটানে মেয়েদের নাম কীরকম হয়?

পেম লা নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন : রাজার দুই বোনের নাম শুনেছি দেচেন ওয়াংচুক ও সোমাম ওয়াংচুক। মেয়েদের নাম হয় এই রকম— চিমি, কিংগা, আশি, ছেরিং—

আর ছেলেদের নাম?

রিনচেন, লেনদুপ, খাঁণ্ডু, গালচেন—

আমি বললুম : পেম, উগ্যেন।

পেম লা হাসতে লাগলেন আমার কথা শুনে। তারপরে বললেন : আমার বাবা বলতেন, লেখাপড়া শিখলে জীবনে উন্নতি করতে পারবি। তিনি নিজে তা পারেন নি বলে তাঁর মনে খুব দুঃখ ছিল। তাঁর কাছেই একটা গল্প শুনেছি।

স্বাতি বলল : গল্পটা বলুন না!

কিছুদিন আগেও ভুটানের প্রধানমন্ত্রীরা থাকতেন ভারতের কালিম্পঙে। সেই পরিবারের সঙ্গেই রাজবাড়ির বিয়ে সাদি হত। বর্তমান রাজার বাবা বিয়ে করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোনকে, আর সেই রাজার বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর মেজো ভাইয়ের। সেই বিয়ের সময়ে তাঁরা দেশের অনেকগুলো ছেলেকে পছন্দ করে ভারতে নিয়ে গিয়েছিলেন লেখাপড়া শেখানোর জন্যে। ফিরে এসে তারা সবাই বড় বড় চাকরি পেয়েছে। আর আমার বাবাকে যেতে দেয় নি বলে তাঁর খুব দুঃখ ছিল।

পেম লা একটু থেমে বললেন : এই তরুণ রাজা ও তাঁর প্রধানমন্ত্রীর আমলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এসেছিলেন ভুটানে। সে বোধহয় ১৯৫৮ সালের ঘটনা। ভারত থেকে ভুটানে আসার কোন পথ ছিল না বলে তাঁকে সিকিম থেকে তিব্বতের ওপর দিয়ে ভুটানে আসতে হয়েছিল। তিন বছর পর থেকে ভুটানের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভ হয়, আর তারপর থেকেই দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। শুনে আশ্চর্য হবেন যে এই দেশে দাস প্রথা চলে আসছিল ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। রাজা এই দাস প্রথা বে-আইনি বলে ঘোষণা করে পাঁচ হাজার দাসকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

তারপরেই লজ্জিত ভাবে বললেন : না না, ভারি অন্যায় করছি আমি। নিতান্ত বাজে কথায় আমি আপনাদের আটকে রেখেছি।

বলে উঠে দাঁড়াতেই স্বাতি বলল তবে আসুন, আমরা রাস্তায় বেরিয়েই কথা বলি।

১৭

সকাল সাড়ে এগারটার মিনি বাসে যে আমরা থিম্ফু যাত্রা করব, এ কথা হোটেলের ম্যানেজারকে বলা ছিল। তিনি আমাদের জন্যে একটু দেরিতে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করেছিলেন। বেশ পেটভরা আহার। বলেছিলেন : দুপুরে যাতে কষ্ট না হয়, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। দুপুরে তখ্‌তি চু ক্যান্টিনে সামান্য কিছু খেয়ে নেবেন। সন্ধ্যে বেলায় তো হোটেলে ভাল ডিনার পাবেন, কষ্ট হবে না।

স্বাতি বিল মিটিয়ে দেবার সময়ে বলল : ফেরার সময়েও যেন একটি ভাল ঘর পাই। আমরা এক রাত এই হোটেলেই থাকব।

ম্যানেজার খুশী হয়ে বললেন : একবার এই হোটেলে থেকে গেলে বার বার আসতে হবে।

আমি বললুম : তাই তো দেখছি।

ম্যানেজার বললেন : আর এই মিনি বাসের ব্যবস্থা করে ভাল করেছেন।

কেন বলুন তো!

ভোর বেলার বাসে গেলে আপনাদের চিমাকোটির হোটেলে খেতে হত। মানে নামেই হোটেল। তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় বলে শুনেছি।

স্বাতি বলল : খাবার নিশ্চয়ই ভাল!

ভদ্রলোক হেসে বললেন : ডাল ভাত আর আলুর তরকারি।

তারপরেই বললেন : এ সব অবশ্য আমার শোনা কথা। আমরা থিম্ফু গেলে শুকনো খাবার সঙ্গে নিয়ে যাই।

বাস স্ট্যাণ্ডে মালপত্র পৌঁছে দেবার জন্যে তিনিই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা সময় মতোই বিদায় নিলুম। আমাদের যাত্রা শুভ হোক বলে ভদ্রলোক প্রার্থনা জানালেন।

হোটেলের কাছেই বাস স্ট্যাণ্ড। সঙ্গে বাসের টিকিট ও রিজার্ভেশন স্লিপ ছিল। কাজেই নির্বিঘ্নে মালপত্র বাসের ছাদে তুলে দিয়ে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় উঠে বসলুম।

কিন্তু বাস ছাড়বার আগেই দেখলুম যে এক ভদ্রলোক হাত নাড়তে নাড়তে এই দিকে ছুটে এলেন। কাছে এলে দেখলুম যে তিনি গতকালের সেই দত্তবাবু। এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন : থিম্ফুতে খবর দিয়ে দিয়েছি।

তারপরে কী বললেন তা বাসের গর্জনে শুনতে পেলুম না।

স্বাতি জানালার ধারে বসেছিল। দুহাত জুড়ে নমস্কার করে ধন্যবাদ জানাল। বাস ঠিক সাড়ে এগারটার পরেই ছাড়ল।

স্বাতি আমার মুখের দিকে একবার তাকাল, কিন্তু কোন কথা হল না।

আমরা পরিচিত পথ ধরে শহরের শেষ প্রান্তে এলুম, তারপর পাহাড়ের পথ ধরে উপরে উঠতে লাগলুম। খারবন্দী পাহাড়ের পথ ধরেই এগোতে হয়। এই পথই সোজা

উত্তরে গেছে থিম্ফুর দিকে। এক সময়ে আমরা ফুনছোলিঙের ঘর বাড়ি ছাড়িয়ে নির্জন পাহাড়ে পৌঁছে গেলুম। অরণ্যে আবৃত অন্ধকার পাহাড়, মাঝে মাঝে খোলা আকাশে রৌদ্রের আলো ছায়া দেখা যাচ্ছে। একটু স্যাৎসেঁতে শীতার্ত আবহাওয়া। আরও খানিকটা পথ এগোবার পর একটা জায়গায় এসে বাস দাঁড়াল। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই নেমে পড়লেন। একজন বললেন : আপনারাও নামুন, চেক পোস্টে পার্মিট দেখাতে হবে।

স্বাতির ব্যাগেই আমাদের পার্মিট ছিল। তাই আমার সঙ্গে সেও নেমে পড়ল। যাত্রীরা একে একে পার্মিট দেখাচ্ছিল। আমরাও দেখালুম। ভারতীয় টুরিস্ট, দিন কয়েকের জন্যে থিম্ফু বেড়াতে যাচ্ছি। অনুমতি পেলে পারো বা পুনাখাও দেখব। আসছি কলকাতা থেকে। পেশা অধ্যাপনা। কাজেই আপত্তির কিছু নেই।

স্বাতি একজনকে জিজ্ঞাসা করল : এই পার্মিট দেখাতে না পারলে কী হত ?

পড়ে থাকতে হত এইখানে।

মানে !

বাস থেকে পথে নামিয়ে দিয়ে অন্য যাত্রীরা চলে যেত।

তারপর ?

এই দীর্ঘ পথ হেঁটে ফেরা তো সম্ভব নয়, তাই পথের ধারেই বসে থাকতে হত সাহায্যের জন্য।

আমি বললুম . এই চেকিং বাস স্ট্যাণ্ডে হয় না কেন ?

উত্তর একজন যাত্রীই দিলেন। বললেন : তাতে অবাঞ্ছিত যাত্রীর সুবিধা হত চেকিং এড়িয়ে যাবার। এই জন্যেই পথে আরও দুবার চেকিং হবে—একবার চুখায়, আর একবার কনফ্লুয়েন্সে। সেখান থেকেই হা পারো ও থিম্ফু যাবার পথ বেরিয়েছে।

আবাব আমরা বাসে উঠে বসলুম। সমস্ত যাত্রীর চেকিং শেষ হবার পরে বাস ছাড়ল। কিছুক্ষণের জন্যে আমরা নিশ্চিন্ত।

গত সন্ধ্যায় ফুনছোলিঙের পথে বেড়াবার সময় পেম লা আমাদের অনেক কথা বলেছিলেন থিম্পুর পথের সম্বন্ধে। একশো বারো মাইল পথে ওঠানামা করতে হবে। অনেকটা পথ এগিয়ে যাবার পর ভুটানের ছোট ছোট গ্রাম চোখে পড়বে, পাহাড়ের গায়ে জুম প্রথার চাষও দেখা যাবে মাঝে মাঝে। চিমাকোটি প্রায় মাঝ পথে, তার উচ্চতা ৭৩৮৫ ফুট। ছাপছা এই পথের সবচেয়ে উঁচু জায়গা। ৮৬০০ ফুট উঁচু। প্রথম দিকে এই পথ কোন নদীর উপত্যকা ধরে এগোয় নি। নদীর ধারে এসেছে পরে। এই নদী তোর্সা নয়। তোর্সাকে আমরা ফুনছোলিঙেই ফেলে এসেছি।

ভদ্রলোক বলেছিলেন যে চুখার কাছে কোনখানে আমরা রায়ডাক নদীর পশ্চিম পার থেকে পূর্ব পারে চলে যাব। চুখায় একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। বাস যখন চুখা প্রজেক্ট চেক পোস্টে দাঁড়াবে তখন একটু চেষ্টা করলেই এই নির্মীয়মান জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি দেখা যাবে পথের ধার থেকে নীচের দিকে। এই প্রজেক্টের কাজ শেষ হলে তিনশো চল্লিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। ভারতের সহায়তায় এই কাজ হচ্ছে বলে উত্তরবঙ্গও এই বিদ্যুতের ভাগ পাবে।

তিনি বলেছিলেন যে জলঢাকা নদীর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অনেক আগেই তৈরি হয়ে গেছে। এই নদীটি ভারত ও ভুটানের সীমান্ত দিয়ে বারো মাইল প্রবাহিত হয়েছে। তাই দুই দেশের যৌথ উদ্যোগে পরিকল্পনাটি আরম্ভ হয়েছিল ১৯৬১ সালে। শেষ হবার পর ভুটান পায় আড়াই শো কিলোওয়াট বিদ্যুৎ বিনে পয়সায়, আর ভারত বছরে

আট টাকা কিলোওয়াট দরে বাকি সাড়ে পনের শো কিলোওয়াট বিদ্যুৎ কেনে।

ভুটানের নদীগুলি খরস্রোতা বলেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী। তাই থিম্ফু শহরেও একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ হচ্ছে।

পেম লা নদীগুলির কথাও আমাদের বলেছিলেন। থিম্ফু শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে থিম্ফু চু। আর পারো চু পারো শহরের নদী। এই দুই নদীর সঙ্গম ছুজম নামে একটা জায়গায়। ইংরেজীতে একেই কনফ্লুয়েন্স বলে। হা উপত্যকার হা নদী কিছু দক্ষিণে এসে ওয়াং চু নামের এই মিলিত ধারার সঙ্গে মিলেছে। বাংলায় এই নদীর নামই রায়ডাক। মো চু ও ফো চু নামের দুটি নদী মিলেছে পুনাখা উপত্যকায়। ওয়াংদি চু নামের এই মিলিত ধারা ওয়াংদিফোদ্রঙের উপর দিয়ে দক্ষিণে নেমেছে। বাংলায় এই নদীর নাম সঙ্কোশ।

থিম্ফুর কতটা পথ আমরা অতিক্রম করেছিলুম তা বুঝতে পারি নি। এক সময়ে দেখলুম আমরা এক জায়গায় এসে দাঁড়াতেই যাত্রীরা হুড়মুড় করে নেমে পড়ছেন। তাই দেখে আমরাও নামলুম। জানতে পারলুম যে এখানে একটি ক্যাণ্টিন আছে, তার নাম তখ্তি চু ক্যাণ্টিন। ফুন্ছোলিঙ থেকে আমরা নাকি সত্তর কিলোমিটার পথ এসেছি। মাইলের হিসেবে প্রায় চারশো মাইল পথ, আর ৬৫৫০ ফুট উপরে উঠেছি। একটা বোর্ডের উপরে এই অঙ্ক লেখা আছে।

স্বাতি বলল : আমাদের হোটেলের ম্যানেজার বোধহয় এখানেই কিছু খেয়ে নেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন !

বললুম : তাই মনে পড়ছে।

বলতে না বলতেই স্বাতি এগিয়ে গিয়ে ক্যাণ্টিনে ঢুকে পড়ল এবং কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকল : চলে এসো।

আমি কাছে যেতেই বলল : কফির অর্ডার দিয়েছি, সঙ্গে গরম শিঙাড়া।

একনজরে চারিদিকে চেয়ে মনে হল যে সেনাবাহিনীর লোকেই এই ক্যাণ্টিন পরিচালনা করে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা, নিয়মানুবর্তিতাও আছে। আমরা শিঙাড়া হাতে নিয়ে খেতে আরম্ভ করতেই কফি পেয়ে গেলুম। সবাই তাড়াহুড়ো করছে দেখে আমরাও তাড়াতাড়ি খেয়ে পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এলুম।

অনেকক্ষণ একভাবে গাড়িতে বসে থাকার পর এইভাবে নেমে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করতে মন্দ লাগে না। তাতে দেহের আড়ষ্ট ভাব যায়, মনের প্রসন্নতাও বাড়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে। এ জায়গা তো আমাদের দেশের বড় পাহাড়ী শহরের সমান উঁচু। মেঘ উঠছে কুয়াশার মতো। একেবারে পাহাড়ী আবহাওয়া। বাস বোধহয় বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। তাই যাত্রীরা ব্যস্তসমস্ত ভাবে ছুটোছুটি করে নিজেদের কাজ সেরে নিচ্ছিলেন। বাসের হর্ন শুনে আমরাও উঠে পড়লুম।

খানিকটা এগিয়েই ঝর্নার মতো একটি নদীর জল পেরোলুম। চু মানে যে নদী তা জানি। তাই মনে হল যে এই নদীর নামই বোধহয় তখ্তি চু। কিন্তু আরও খানিকটা এগিয়ে একটা বাঁক ঘুরে, বাস আবার দাঁড়াল। বাসের যাত্রীদের আবার নামতে দেখে বুঝতে পারলুম যে এখানে আবার চেকিং হবে। এরই নাম চুখা প্রজেক্ট চেক পোস্ট। তবে কি এইখানেই আমরা রায়ডাক নদী পেরোচ্ছি ! চুখা বোধহয় এই জায়গার নাম।

এবারের এই যাত্রায় কোন যাত্রীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয় নি। পরিচয় করবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি কেউ। তাই আমরাও এগিয়ে যাই নি। চেকিং-এর সময়ের ফাঁকে আমরা চারিদিকের দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করলুম। স্বাতি আমার হাতে

পার্মিট দিয়ে চুখা প্রজেক্টের একখানা ছবি তোলার চেষ্টা করল। এই পথ থেকেই একটা মোটরের পথ ডান হাতে নীচে নেমে গেছে। তারই শেষে একটি গ্রামের মতো দেখা যাচ্ছে। অনেক ঘরবাড়ি, কিন্তু সবই পাকা। এতক্ষণ আমরা পথের পাশে যে রকম গ্রাম দেখেছি, এসব ঘরবাড়ি সেরকম নয়, বুঝতে পারা যাচ্ছে যে প্রজেক্টের জন্যেই এসব তৈরি হয়েছে।

এক সময়ে আমরা চিমাকোটিও পেরিয়ে গেলুম। ফুনছোলিঙ থেকে চিমাকোটির দূরত্ব ষাট মাইল এবং এর উচ্চতাও জেনেছি দার্জিলিঙের চেয়ে বেশি। এরপর ছাপছা আরও বেশি উঁচুতে। পাহাড়ের পথে এই রকমই হয়। দার্জিলিঙে পৌঁছবার আগে ঘুমের উচ্চতা বেশি, তারপর গড়িয়ে নামা। কাশ্মীরেও এই রকম। বানিহালে পাহাড় না ডিঙিয়ে আমরা সুড়ঙ্গ পথে ওপারে গিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় নেমে এসেছি। এখানেও কিন্তু ছাপছার পরেই থিম্ফু নয়। আমাদের ছুজমে নেমে আসতে হল। পশ্চিম থেকে বয়ে এসেছে পারো চু, আর উত্তর থেকে থিম্ফু চু। এই দুই নদীর সঙ্গমের উপরেই ছুজম বা কনফ্লুয়েন্স। এখানেও চেকিং আছে।

এখন আমরা চেকিং-এর ব্যাপারে খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। একজন যখন অপেক্ষা করছি, তখন আর একজন ঘুরে ফিরে দেখছি চারি ধার। স্বাতি ছবিও তুলে নিচ্ছে। ভাল হলে কাজে লাগবে।

এই কনফ্লুয়েন্স জায়গাটি আমার ভাল লাগল। এখানকার পুল পেরিয়ে ওপারে গেলেই পারো নদীর তীরে তীরে পারো যাবার পথ মনে হল সমতল উপত্যকা দিয়ে। হা যাবার পথ কোথা থেকে বেরিয়েছে বুঝতে পারলুম না। ছাপছা থেকে নেমে আসবার পথেই এক জায়গায় নাকি হা নদী এসে রায়ডাকের সঙ্গে মিলেছে। সে জায়গাটাও লক্ষ্য করি নি। এই নদীর তীরে তীরেই কি হা উপত্যকায় পৌঁছনো যায়!

ফুনছোলিঙের পথ যখন ছিল না, তখন ভুটানে আসতে হত সিকিমের নাথু লা পেরিয়ে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকার উপর দিয়ে এই হা নদীর উপত্যকায়। সেখান থেকে পারো হয়ে থিম্ফু আসতে হত।

শুনেছি, হা উপত্যকার গুরুত্ব অনেক। ভারতের সেনাবাহিনী যেমন নাথু লায় প্রহরা দিচ্ছে, হা উপত্যকাতেও সে রকম ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না। সিকিম ও ভুটানের মাঝখানে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা এমন ভাবে অবস্থিত যে তা ভারতের কাছে উদ্বেগজনক। কে একজন বলেছিলেন যে হা উপত্যকায় নাকি এখন চীনের অনেক অধিবাসী দেখতে পাওয়া যায়। একজন ভুটানবাসী দুঃখ করে বলেছিলেন যে তিব্বতীরাই ভুটানে এসে দ্রুক্‌পা হয়েছে, নেপালীরাও আছে এ দেশে। তারা নিজেদের ভুটিয়া বা নেপালী ভাবে, কিন্তু ভুটানবাসী ভাবে না। ভুটানে জাতীয়তা বোধ এখনও পুরোপুরি জাগে নি।

চেকিং-এর পর ছোর্তেনের নদীর ধারে এসে আমি দেখলুম যে স্বাতি এই দুই নদীর সঙ্গমের ধারে একটি ছোর্তেনের ছবি নিচ্ছে। এই ছোর্তেনটি একটি হিন্দু মন্দিরের মতো মনে হচ্ছে। সাদা চুনকাম করা মন্দির। দু পাশে দুটি পতাকা উড়ছে। কিন্তু সেখানে যাবার পথ দেখতে পাচ্ছি না।

বাস ছেড়ে যাবার ভয়ে আমরা তাড়াতাড়ি চলে এলুম বাসের কাছে। তারপরে উঠে বসলুম। তখনও অন্ধকার হয় নি। কিন্তু আকাশের আলো কমে এসেছে। যাত্রীরা বলছেন যে থিম্ফু পৌঁছতে হবে অন্ধকারে, আলো থাকতে সেখানে আমরা পৌঁছতে পারব না। আমরা নাকি ফুনছোলিঙ থেকে প্রায় আটাশি মাইল পথ এসেছি,

আরও চব্বিশ মাইল পথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে। এও শুনলুম যে পারো এখান থেকে মাত্র পনের মাইল দূরে।

একজন স্থানীয় যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে এই কনফ্লুয়েন্সে পৌঁছবার আগেই হা উপত্যকার পথ পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে। এখান থেকে পিছিয়ে গিয়ে সেই পথ ধরতে হয়। হা উপত্যকা পশ্চিমের দিকে। কনফ্লুয়েন্স থেকে তার দূরত্ব বাহান্ন মাইল হবে। আজকাল যাতায়াতের অসুবিধে নেই। ইচ্ছে করলে পারোর মতো হা উপত্যকায় গিয়ে হা জঙ্গ দেখে আসা যায়।

এখন আমরা থিম্ফুর দিকে যাচ্ছি। স্বাতি বলল : এবারে আমাদের পথের ডান দিকে চোখ রাখতে হবে।

কেন ?

কোথা থেকে পুনাখার পথ বেরিয়েছে তা দেখে রাখতে হবে।

কিন্তু বেলা পড়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল যে অন্ধকার নামতে আর দেরি নেই। আমাদের কৌতূহল দেখে একজন যাত্রী বললেন : সেমটোকা জং দেখতে চাইছেন তো ? পথের ধারে একটা টিলার ওপরে দেখতে পাবেন।

সেমটোকার নাম আমরা শুনি নি। তাই আশ্চর্য হয়ে বললুম : থিম্ফুর জং বুঝি এই পথেই পড়বে ?

ভদ্রলোক বললেন : না। থিম্ফুর জং থিম্ফু শহরেই। এ হল সেমটোকা জং। এ জায়গার নাম সিম্মোদোখাং। শহব থেকে এর দূরত্ব মাইল পাঁচেক।

অকপটে স্বীকার করলুম যে এ নাম আমরা শুনি নি। স্বাতি বল : কী দেখবার আছে সেখানে ?

ভদ্রলোক বললেন : এ দেশের একটা পুরনো জং। খুব বড় না হলেও দেখবার মতো। এখন এই জং অন্য ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে—ভুটানের সরকারি ভাষা জংখা শিখবার স্কুল হয়েছে এই জঙে।

লক্ষ্য করছিলুম যে ইনি জং শব্দের উচ্চারণ Z দিয়ে করছিলেন। ইংরেজীতে যে এই শব্দটি লেখা হয় Dzong এবং ভাষার নাম Dzongkha, তা আগেই শুনেছি।

এর পরেই ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন : এখানে বেড়াতে আসছেন বুঝি ?

মাথা নেড়ে বললুম : হ্যাঁ।

আত্মীয় স্বজন কেউ আছে তো ?

না।

উত্তর শুনে ভদ্রলোক একটু আশ্চর্য হলেন মনে হল। বললেন : থিম্ফুতে থাকবেন কোথায় ?

বললুম : হোটেলে।

হ্যাঁ, থিম্ফুতে হোটেল অবশ্য আছে। কিন্তু থাকবার জায়গা বেশি নেই। খবর দিয়ে আসছেন তো ?

স্বাতি বলল : রিগিয়া হোটেলে খবর দেওয়া আছে।

অবিলম্বে ভদ্রলোক বললেন : ভাল করেছেন। এ দেশে তো কেউ বেড়াতে আসে না ! বিদেশীরা আসে সরকারি প্যাকেজ টুরে, থাকে সরকারি হোটেলে। সাধারণ মানুষ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের বাড়িতে ওঠে। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যারা আসে, তাদের জন্যেই হোটেলের ব্যবস্থা।

তারপরেই আশ্বাস দিয়ে বললেন : রিগিয়া হোটেল বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই। একটুখানি ওপরে উঠলেই হোটেলে পৌঁছে যাবেন।

এতক্ষণ পরে আমরা একজন যাত্রীকে সঙ্গী পেয়ে খুশী হলুম। স্বাতি বলল : থিম্ফুতে কী দেখবার আছে ?

ভদ্রলোক বললেন : দার্জিলিঙের চেয়েও উঁচু শহর। প্রায় আট হাজার ফুট, শ দেড়েক ফুট কম হতে পারে। কিন্তু দার্জিলিঙের মতো বরফের পাহাড় দেখতে পাবেন না। শহরের চারিদিকে যে পাহাড় আছে, বরফ না পড়লে তাকে নীল দেখবেন।

মাঝে মাঝে বরফ পড়ে বুঝি ?

ভদ্রলোক সহাস্যে বললেন : আগের দিন বিকেলে নীল পাহাড় দেখেছেন। পর দিন সকালে উঠে হয়তো দেখবেন বরফের পাহাড়।

ভারি মজার তো !

বৃষ্টির কণাই অনেক সময়ে বরফ হয়ে যায়। তবে বরফের পাহাড় যে দেখা সম্ভব নয়, তা বলব না। বরফ দেখার শখ থাকলে পশ্চিমে ফাজোডিং চলে যাবেন। সেখানেও একটা পুরনো বিহার আছে—মনাস্টারি। দশ হাজার ফুট উঁচু থেকে থিম্ফু শহরটাও দেখতে পাবেন, আর ইয়াকের পিঠে চেপে ডংছো লা পর্যন্ত গেলে হিমালয়ের বরফ দেখবেন চোখের সামনে।

এবারেও দেখলুম যে ভদ্রলোক ছ-এর উচ্চারণ করছেন স মেশানো। অর্থাৎ Tsho ছো।

বললুম : ডংছো লা কি কোন গিরিপথ ?

ভদ্রলোক বললেন : ঠিকই ধরেছেন, লা মানেই পাস। তাই আপনাদের হাঁটতে না বলে ঝব্বুর পিঠে ওঠার পরামর্শ দিয়েছি। ঘোড়ার চেয়ে ঝব্বুতে চেপেই আরাম বেশি। পড়ে যাবার ভয় তো নেইই, ওঠা-নামা দুদিকেই নির্ভয়ে চলতে পারবেন। আর শুধু বরফের পাহাড় নয়, স্বচ্ছ জলের লেক ও ঝর্নার মতো নদীও দেখতে পাবেন। ফুলে-ফুলে ভরা আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য। এখানকার ফুল জানেন তো ? রডোডেনড্রন আর প্রাইমিউলা—লাল আর সাদা ফুলের সঙ্গে নীল ফুলের গোছা। ভাগ্য ভাল হলে নীল রঙের ভেড়া ও রূপোলি ফিসাণ্টও দেখতে পাবেন।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকালে বললুম : এক জাতের পাখি। রঙ বেরঙের পালক হয়।

বাঙলায় কী বলে ?

মনে পড়ছে না।

ভদ্রলোক বললেন : ভুটানে তো বিদেশী টুরিস্টরা আজকাল দলে দলে আসছে। কিন্তু এ সব সুন্দর জায়গায় তাদের নিয়ে যাওয়া হয় না। থিম্ফু থেকে পারো আর পুনাখা ঘুরিয়ে তাদের বিদায় দেওয়া হয়। আপনারা যেন এ সব মিস করবেন না।

অন্ধকার হয়ে আসছিল বলে বাস উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল। ঘড়িতে তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে.গেছে। সূর্য পাহাড়ের আড়ালে গেছেন অনেকক্ষণ আগেই। হঠাৎ ভদ্রলোক সচকিত হয়ে বললেন : এইবারে একটু নজর দিন। ঐ যে ডান দিকের ঐ পাহাড়, ওর ওপরে সেমটোকার জং দেখতে পাবেন খানিকটা দূরে।

আমি জানালার ধারে বসি নি বলে দেখার আশা কবি নি। কিন্তু স্বাতিও ভাল দেখতে পেল না। তাকে নীরব থাকতে দেখেই আমার এই ধারণা হল। কিন্তু ভদ্রলোক বললেন : দূর থেকে আর দেখবেন কী ! এ সব দেখতে হয় কাছে গিয়ে,

আর ভেতরে ঢুকে। আর সব কিছু বুঝিয়ে দেবার মতো সঙ্গে কেউ না থাকলে দেখেও কোন আনন্দ পাবেন না। থিম্ফু থেকে কাউকে ধরে নিয়ে যাবেন, কিংবা জং-এর কাউকে চেপে ধরবেন। ভেতরের ব্যাপার সব বুঝিয়ে দেবে।

এখান থেকে অল্প দূর এগিয়েই ঘরবাড়ি দেখতে পাওয়া গেল। বোঝা গেল যে আমরা থিম্ফু শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছি। কিন্তু অন্ধকারে পুনাখার পথ দেখা গেল না। তার বদলে সেনাবাহিনীর একটা ছাউনি চোখে পড়ল, আর পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরে থিম্ফু শহরে প্রবেশের পথ। অন্ধকারেই আমরা একটা নদীর পুল পেরোলুম। এই নদীই বোধহয় থিম্ফু চু। ওপারেই শহর আরম্ভ। থিম্ফু ভুটানের নতুন রাজধানী। প্রশস্ত পথের ধারে বড় বড় দোকানে বাতি জ্বলছে। সে সব পেরিয়ে যখন বাস স্ট্যাণ্ডে এসে নামলুম, ঘড়িতে তখন সাড়ে ছটা বেজেছে। স্বাতি হিসেব করে বলল : সাত ঘণ্টা সময় লাগল একশো বারো মাইল পথ পেরোতে।

বললুম : তার মানে, ঘণ্টায় আমরা ষোল মাইল পথ চলেছি!

১৮

বাস থেকে নেমে আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। শিলিগুড়ির সেই ভদ্রলোক বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের নামতে দেখে দুহাত জুড়ে বললেন : নমস্কার।

তাঁর মাথায় সেই পাহাড়ী টুপি। পোশাক একই রকম। কিন্তু বাঙলা উচ্চারণ অত্যন্ত পরিষ্কার। স্বাতি আমার চেয়েও বেশি আশ্চর্য হয়েছিল। বলল : আপনি বাঙালী!

ভদ্রলোক হেসে বললেন : হ্যাঁ স্বাতিদি, আপনাদের চিনতে আমার একটুও ভুল হয় নি।

আমি বেশ হকচকিয়ে গেলুম। কিন্তু কিছু বলবার আগেই দেখলুম যে ভদ্রলোক বাসের ছাদ থেকে আমাদের মালপত্র নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। একজন লোক ছাদে উঠেছিল। তাকে হিন্দীতে অনুনয় করে বললেন : হ্যাঁ ভাই, ঐ সুটকেশ আর ঐ বিছানাটা!

বড় ব্যাগটা আমার হাতেই ছিল। ভদ্রলোক নিজেই নীচে থেকে ধরে সুটকেশ আর বিছানা নামিয়ে নিলেন। বললেন : কুলির অসুবিধে বলে একটা জীপের ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমাদের অফিসের জীপ একজনকে নিতে এসেছে। আসুন এই দিকে।

আমাদের ব্যাগটা স্বাতির হাতে দিয়ে বিছানাটা ভদ্রলোকের হাত থেকে কেড়ে নিলুম। ভদ্রলোক তাঁর সহকর্মীকে ইংরেজীতে বললেন · কিছু মনে করবেন না। যাবার পথে হোটেল রিগিয়ায় এঁদের নামিয়ে দেবেন। উঠে পড়ুন।

বলে ভদ্রলোক আমাদের জীপের পেছনে ঠেলে তুলে দিলেন মালপত্রের সঙ্গে। কিন্তু নিজে উঠলেন না দেখে স্বাতি বলল : আপনি?

এই তো, ওপরেই হোটেল রিগিযা। আপনারা নেমে গেটেই আমাকে দেখতে পাবেন।

বলতে না বলতেই জীপ ছেড়ে দিল এবং নীচের পথ থেকে উঠে এল ওপরের পথে। তারপরেই একটা রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াল। এইখানেই নামতে হবে বুঝতে পেরে আমরা নেমে পড়লুম এবং ধন্যবাদ দিলুম সামনের ভদ্রলোককে। শিলিগুড়ির সেই ভদ্রলোকও তখন এসে গেছেন। জিনিসপত্র আমরা নিজেরাই টেনে তুলছিলুম হোটেলে। কিন্তু হোটেলের ম্যানেজার এগিয়ে এসে বললেন : আপনারা এসে গেছেন!

বলে হাঁক ডাক করে একজন বেয়ারাকে ডেকে জিনিসপত্র ওপরে পাঠিয়ে দিলেন।

শিলিগুড়ির ভদ্রলোক বিদায় নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্বাতি আপত্তি জানিয়ে বলল : তা হয় না ভাই। আপনি যখন আমাকে চিনেছেন, তখন আপনার পরিচয় না পেলে তো ছাড়ব না।

ভদ্রলোক বললেন · বেশ, আমি নীচেই অপেক্ষা করছি। আপনারা নিজেদের ঘরে

গিয়ে একটু বিশ্রাম করে আসুন।

স্বাতি বলল : আমরা নীচেই বিশ্রাম করব।

ঘরটা পছন্দ হয় কিনা দেখে আসবেন না ? আমি কথা দিচ্ছি, কোথাও যাব না, অপেক্ষা করব আপনাদের জন্যে।

স্বাতি ম্যানেজারকে বলল : এখন আমরা একটু চা কিংবা কফি খাব। আমরা তিনজন।

বলে একটা চেয়ারে ভদ্রলোককে বসিয়ে আমাকে ডাকল : এসো, ঘরটা দেখে আসি।

আমি এখুনি আসছি।

বলে স্বাতিকে অনুসরণ করে আমি দোতলায় উঠে গেলুম। বেয়ারা একটা ঘর খুলে আমাদের জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখছিল। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম আছে দেখে স্বাতি বলল : মুখ হাত ধুয়ে এসে তুমি নীচে যাও। আমি তোমার পরেই নামছি।

স্বাতি তার ব্যাগ থেকে তোয়ালে বার করে আমার হাতে দিল। বেশিক্ষণ নয়, কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি নীচে নামলুম। স্বাতি আমার পরে নামল। কিন্তু তার হাতে একটা প্লেটে কয়েকটা সন্দেশ ও ডালমুট। টেবলের উপরে রেখে ভদ্রলোককে বলল : এ সব ঘরে তৈরি জিনিস, নিশ্চিন্ত মনে আপনি খেতে পারেন।

এক মুঠো ডালমুট মুখে পুরে ভদ্রলোক বললেন : এটাও ?

স্বাতি হেসে বলল : এ রকম ডালমুট কি বাজারে পাবেন ? খেয়ে দেখ তো !

বলে আমার দিকে এগিয়ে দিতেই আমি সেই ডালমুট দেখে আশ্চর্য হলুম। শুধু ডালমুট নয়। সঙ্গে চিঁড়ে ভাজা আছে, পাঁপড় আছে, আলু ভাজা ও কাজুর টুকরো।

স্বাতি বলল : এইবারে বলুন তো, আমাকে আপনি চিনলেন কী করে ?

আমি বললুম : তার আগে নিজের নামটা বলুন।

নিরাপদ।

কিন্তু নামটা কালীপদ বা তারাপদর মতো নয়তো, তাই নিরাপদ মনে হচ্ছে না।

ভদ্রলোক বললেন : বাবা এই নাম রেখেছিলেন, তাই নিরাপদোই বলি। নিরাপদ্ বলি না। বিশ্বাস করতে পারেন, নিতান্তই ভাল মানুষ, ভয় পাবার মতো বিপজ্জনক নই।

স্বাতি বলল : গোয়েন্দাগিরি জানেন বলেই ভয় পাচ্ছি।

নিরাপদ বললেন : না, গোয়েন্দাগিরি করি নি। নিরুদ্দেশের কলমে আপনার নাম দেখেছিলাম।

সে কি !

বলে স্বাতি বিস্ময় প্রকাশ করতেই নিরাপদ বললেন : গোপালদার হিমালয় পর্বে কেদারনাথের মন্দিরের সামনে যাঁকে দেখেছিলাম, এক নজরে মনে হয়েছিল যে শিলিগুড়ির বাস স্ট্যাণ্ডে তাঁকেই দেখলাম। দাঁড়াবার ভঙ্গীটি ঠিক এক রকম। কিন্তু সাহস করে কিছুই বলি নি, জিজ্ঞেসও করি নি কিছু। এখানে ফিরে এসে মিলিয়ে দেখলাম। হ্যাঁ, ঠিক চিনেছি, চিনতে আমার একটুও ভুল হয় নি।

আমাদের চা এসে গিয়েছিল। চা-এ চুমুক দিয়ে নিরাপদ বললেন : কিন্তু আশঙ্কা হয়েছিল হিসেবের ভুলে।

কী রকম ?

গোপালদার কথায় ছবি তোলেন স্বাতিদি, কিন্তু কাজের বেলায় উল্টো দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এখানে এসে ভাবলাম, দেখিই না একটা ঢিল ছুঁড়ে, ঠিক জায়গায় লাগে কিনা।

কী দেখলেন ?

লেগে গেল ঠিক জায়গায়। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে কী জন্যে জানেন ? যাঁর বই, তিনি এখন এখানে নেই। অর্থাৎ আপনাদের যে গরিবের কুটিরে নিয়ে যাব, তার উপায় নেই। গৃহে গৃহিণী নেই, তাঁকেই কলকাতায় রেখে আসতে গিয়েছিলাম। অথচ আপনাদের দেখে তিনিই বেশি খুশী হতেন। আর এই হোটেলে এনে তুলতে দিতেন না।

বললুম : তার মানে শ্রীমতী নিরাপদ আপনাকে নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করে গেছেন। তাই তো ! আমরা তাঁর এই দূরদর্শিতার প্রশংসা করছি।

নিরাপদ বললেন : কিন্তু পরে পাঁচজনের মুখে আপনাদের কথা শুনে তিনিই আপশোস করলেন সবচেয়ে বেশি।

স্বাতি বলল : তাহলে এক কাজ করবেন। পাঁচ জন যাতে জানতে না পারে তার জন্যে সমস্ত ব্যাপারটাই গোপন রাখবেন।

তা সম্ভব হবে কিনা বলতে পারি না।

কেন ?

ফুনছোলিঙে বোধহয় এক বাঙালী প্রেমীর সঙ্গে আপনাদের আলাপ হয়েছিল ! তার চর এখানে আপনাদের আগমন বার্তা সোৎসাহে ঘোষণা করেছেন। আপনাদের রিসিভ করার ভারটা আমি নিয়েছি বলেই আজ আপনারা রক্ষা পেয়েছেন। কাল থেকে থিম্পুর বাঙালী জনতা আপনাদেব ভার নেবে।

বললুম : সর্বনাশ !

সর্বনাশ কেন ?

অপরের কাঁধে নিজেদের ভার চাপাবার অভ্যেস আমাদের নেই। খুব বিব্রত বোধ করব।

নিরাপদ বললেন : দু চার দিনেই অভ্যেস হয়ে যাবে, কিছু ভাববেন না।

আরও কিছু হাল্কা কথা হল, তারপর নিরাপদ বিদায় নিলেন। বলে গেলেন : আজ আপনারা ক্লান্ত, বিশ্রাম করুন আজ।

হোটেলের খাতায় নাম ধাম লিখে দেবার পর স্বাতি রাতের খাবারের অর্ডার দিল। কলকাতার হোটেলের মতো সব খাবারই পাওয়া যাবে। কিন্তু এ দেশের কোন খাবার তৈরি থাকে না। অর্থাৎ এ দেশবাসীর জন্য এ হোটেল নয়, এ ভারতীয় বা নেপালীদের জন্যই।

অন্ধকার নামবার পর থেকেই আমাদের শীতবোধ বেড়েছিল। হাল্কা সোয়েটারে এখন বেশ শীত করছে। দরজা জানালা সব বন্ধ, কিন্তু তাতেও শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাইরে বেরোতে হলে মোটা গরম জামা পরতে হবে। ম্যানেজার বললেন : মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, তারপর আকাশ পরিষ্কার হলেই শীতবোধ বাড়ে। মেঘলা আকাশের নীচেই শীত কম।

স্বাতি বলল : আজ তাহলে বাইরে বেরিয়ে কাজ নেই। কাল সকালেই আমরা শহর দেখতে বেরোব।

বলে নিজেদের ঘরের দিকে পা বাড়াল। আমি তাকে অনুসরণ করে উপরে উঠে

এলুম।

ঘরে এসে স্বাতি বলল : একটা কথা তোমাকে আজই বলে রাখি।

কী কথা ?

এ দেশে ভ্রমণ যেন নিজের ইচ্ছেয় হয়, অপরের ব্যবস্থায় নয়। মানে, কেউ প্ল্যান করে আমাদের যা দেখাবে, শুধু তাই আমরা দেখব না।

তবে ?

আমরা যা দেখা দরকার ভাবব, তাও দেখব।

তা তো দেখবই।

আর তা দেখবার জন্যে নিজেরাই ব্যবস্থা করব। সাহায্য নেব না অপরের।

বললুম : সে তো খুব ভাল কথা।

স্বাতি বলল : এ কথা কেন বলছি জানো ?

কেন ?

ভ্রমণের বই আমি নিয়মিত পড়ি—পুরনো আর নতুন লেখকদের বইও। যাঁরা কণ্ডাক্টেড টুরে, বা প্যাকেজ টুরে, কিংবা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশ ভ্রমণ করে বই লেখেন, তাঁদের লেখার আকর্ষণ আমার কাছে কম।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার কারণ জানতে চাইলে স্বাতি বলল : তাতে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের রস নেই। অন্যের ব্যবস্থায় ভ্রমণ করছি ভাবলে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন নিরস লাগে। এ যাত্রায় আমাদের অবস্থাও কতকটা এই রকম হচ্ছে। নিরাপদবাবু আমাদের হোটেলের ব্যবস্থা করে দিলেন। আর কেউ এসে হয়তো গাড়িতে করে শহর দেখিয়ে দিলেন, এতে রোমাঞ্চ নেই।

হেসে বললুম : তবে কি হোটেলে জায়গা না পেয়ে গাছতলায় রাত কাটাতে হলে তা রোমাঞ্চকর হত ?

স্বাতি বলল : ঠিক তা নয়। হোটেলের ব্যবস্থা না করে এসে যদি রাতের আশ্রয়ের জন্যে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হত, তাহলে তার মধ্যে একটা রোমাঞ্চের আস্বাদ থাকত। নিশ্চিন্ত জীবনের মতো ভ্রমণটাও নিশ্চিন্ত হলে ভাল লাগে না।

বললুম : জীবনেও তাই।

মানে ?

জীবনের সঙ্গীকে পছন্দ হলেই যদি পাওয়া যেত, তাহলে তার দাম যেত কমে। অসাধ্য সাধন করে তাকে পেলেই পরিপূর্ণ আনন্দ।

স্বাতি বলল : এ ধারণা মধ্য যুগের, যখন দ্বৈত যুদ্ধ করে প্রণয়িনীকে পেতে হত।

বললুম : এখন সেই দ্বৈত যুদ্ধ অস্ত্র দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে।

হৃদয় দিয়ে হলে আরও ভাল নয় কি ?

প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তো হৃদয় দিয়ে যুদ্ধ হয় না, হৃদয় বিনিময় হয় প্রণয়িনীর সঙ্গে।

স্বাতি সকৌতুকে বলল . মাঝে একটি ভিলেন চাই, একটি খল নায়ক। তা না থাকলে নাটক জমে না।

আমি এ কথার কী উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিলুম না। তাই দেখে স্বাতিই বলল : একটা ভিলেনের অভাবে তোমার লেখাও আজকাল পান্‌শে মনে হচ্ছে।

কিন্তু এখন আর কি ভিলেন আমদানি করার সুযোগ আছে ?

স্বাতি বলল : ভেবে দেখতে হবে।

ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে আজকাল নানা মন্তব্য শুনতে পাই। তার মধ্যে একটি গুরুতর

অভিযোগ হল, ভ্রমণ কাহিনীতে যাত্রীদের কথা আমদানি করে নাকি ভ্রমণের শুচিতা নষ্ট করা হচ্ছে। একদিন স্বাতি আমাকে এই ধরনের একটা অভিযোগ পড়ে শুনিয়েছিল। উত্তরে আমি বলেছিলুম, তার আগে ভ্রমণের উদ্দেশ্যটা ভেবে দেখতে হবে নাকি ? কেউ যদি তীর্থ ভ্রমণে বের হন, তাহলে সেই ভ্রমণের শুচিতা নিশ্চয়ই রাখতে হবে। কিন্তু দল বেঁধে পিকনিকে বেরোলে, কিংবা বিয়ের পর হানিমুনে বেরোলেও কি সেই শুচিতা রক্ষার প্রশ্ন উঠবে ? আর যাত্রীদের কথা বাদ দিয়ে তো ভ্রমণ নয়, যাত্রীরাই ভ্রমণ করে। তাই তাদের কথা বাদ দিয়ে কি ভ্রমণ হয় ? তবে যাত্রীদের কথা যদি ভ্রমণের ধারাকে ব্যাহত করে, কিংবা আচ্ছন্ন করে ভ্রমণের কথা, তবে তা আপত্তিকর বলতেই হবে। ভ্রমণও তো কাহিনী, তার একটা ধারাবাহিকতা আছে। এ কথা অস্বীকার করলেও অন্যায় হবে। তাই ভ্রমণ কাহিনীতে পরিমিতি জ্ঞানটাই বড়, শুচিতা নয়। শুচিতা বড় হয়ে উঠলে পঞ্জিকা বা পুরোহিত দর্পণ হতে পারে, বেদ বা মনুসংহিতা হবে না। বেদে ঋষিরা মানুষকে কল্পনার পাখায় ভর করে উড়তে দিয়েছেন।

স্বাতি বলল : কী ভাবছ ?

বললুম : তোমার কথাই ভাবছি।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : আমার কথা !

বললুম : তুমি আর একদিন আমাকে ভ্রমণ কাহিনী লেখার ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছিলে। আজকের কথার সঙ্গে সেদিনের উপদেশ মিলছে না।

একটু বুঝিয়ে বল।

সেদিন তুমি শুচিতা রক্ষার কথা বলেছিলে, আজ বলছ ভিলেন আমদানির কথা। ভিলেন এলে কি শুচিতা রক্ষা হবে ?

স্বাতি হেসে বলল : ভুল হল তোমার।

কেন ?

আমি অন্য কথা বলেছি। জীবনে যেমন ভিলেনের দরকার রোমাঞ্চের জন্যে, তেমনি ভ্রমণ কাহিনীতে দরকার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের। অ্যাডভেঞ্চার এলে শুচিতা নষ্ট হবে না, সেটা ভ্রমণ কাহিনীরই অঙ্গ।

বললুম : বুঝেছি।

কী বুঝেছ ?

ভ্রমণ কাহিনীতে রোমাঞ্চ আমদানি করতে হবে। তার জন্যে পথে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, ডাকাত পড়তে পারে, কারও প্রাণ সংশয় হতে পারে—

কিন্তু এ সব উপন্যাসের মতো কল্পিত হলে চলবে না। তাতেই নষ্ট হবে ভ্রমণের শুচিতা।

বললুম : এ সব ঘটনা তো সচরাচর ঘটে না ! সে ক্ষেত্রে কী উপায় করতে হবে ?

উপায় নেই। তাই ভ্রমণ কাহিনী লেখা চলবে না। লেখবার জন্যে হাত সুড়সুড় করলে ভ্রমণ উপন্যাস লিখতে পারো, ভ্রমণ কাহিনী নয়। ভ্রমণের পটভূমিতে একটা কল্পিত কাহিনী। কিন্তু দোহাই তোমার, তাকে ভ্রমণ কাহিনী বলে চালাবার চেষ্টা কোরো না।

হেসে বললুম : আর যদি উল্টো কাজ করি ?

কী কাজ ?

ভ্রমণ না করেও যদি ভ্রমণ কাহিনী লিখি ?

তা কেমন করে লিখবে ?

কেন, টুরিস্ট লিটারেচারের সঙ্গে অন্যের লেখা ভ্রমণ কাহিনী মিলিয়ে !

স্বাতি বলল : সে রকম ঘটনাও বোধহয় এখন বিরল নয়। অনেক পাঠকই মনে করেন যে না গিয়েও ভ্রমণ কাহিনী লেখা হয়।

কী রকম ?

আমার বন্ধুদের অনেকেই জিজ্ঞেস করেছে যে সব জায়গায় আমরা গিয়েছি কিনা ! তারা এ রকম সন্দেহ করে কেন বুঝি না ! নিশ্চয়ই তাদের জানাশুনো কেউ এ রকম কাজ করেছে !

আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম : যাক, এ তাহলে তোমার অনুমানের কথা। সত্যিই আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।

স্বাতি বলল : তোমার ভয়ের কী আছে ?

ভয়ের কিছু নেই ! গল্প উপন্যাসের লেখকেরা যদি ভ্রমণ কাহিনী লিখতে আরম্ভ করে, তবে আমাদের মতো লেখকের লেখা পড়বে কে !

সত্যের মার নেই, এই বিশ্বাস রেখো।

এর পরেই আমরা আগামী কয়েক দিনের প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেললুম। আগামী কাল আমাদের সরকারি দপ্তরে গিয়ে পারো ও পুনাখা দেখার জন্য অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হবে। পরের দুদিনে দেখে আসতে হবে এই দুটো জায়গা। পারো কাছে এবং এক দিনেই দেখে ফিরে আসা যাবে। পুনাখা দূরে বলে হয়তো এক রাত্রি বাইরে কাটাতে হবে। মাঝপথে আর একটি দর্শনীয় স্থান আছে ওয়াংদিফোদ্রং। তারপরের দিনই আমাদের ফুনছোলিঙে ফিরতে হবে। শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে আমাদের রিজার্ভেসন আছে, এটা এখন ধরে নিতে হবে। সেই ভাবেই ফিরতে হবে আমাদের।

স্বাতি বলল : হাতে আমাদের সময় খুব অল্প।

বললুম : বেশি সময় থাকলেও বেশি কিছু দেখা যায় না।

কেন ?

মধ্য বা পূর্ব ভুটানে যাওয়া তো সম্ভব হবে না ! এখান থেকেই ফিরতে হবে। সে সব জায়গায় যেতে হলে বঙ্গাইগাঁও বা রঙ্গিয়া যাওয়াই সুবিধের।

স্বাতি বলল : এ যাত্রায় তাহলে এখান থেকেই ফিরতে হবে।

হোটেলের বেয়ারা আমাদের খবর দিতে এল যে ডিনার তৈরি আছে। স্বাতি বলল : আমরাও তৈরি। খেয়ে এসে একটা লম্বা ঘুম দিতে হবে।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

১৯

ঘুম থেকে উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে প্রসন্ন প্রভাতকে স্বাগত জানাল স্বাতি। আমি জেগে আছি দেখে বলল : বন্ধ ঘরে শুয়ে বসে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। হাতে আমাদের সময় কম, সে কথা সারাক্ষণ মনে রাখতে হবে।

বললুম : কী করতে হবে হুকুম কর।

স্বাতি বলল : চারি দিকটা দেখে আসতে হবে।

বলে ঘরের বাতি জ্বেলে আমার হাতে ভুটানের ইতিহাস দিয়ে বাথরুমে চলে গেল। ফুনছোলিঙে কেনা দি ড্রাগন কান্ট্রি। ভাবলুম, এ ভালই হল রাজধানীর পথে পা বাড়াবার আগে দেশের ইতিহাসের পাতায় একটু চোখ বুলিয়ে নিই। প্রথমেই মনে পড়ল এই দেশের যৌথ শাসন পদ্ধতির কথা। আমি জানতুম যে গত শতাব্দীতেও এই দেশে এক অদ্ভুত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ধর্ম রাজারা ধর্ম রক্ষা করতেন, আর দেশ শাসন করতেন দেব রাজারা। এই দেব রাজারা নির্বাচিত হতেন। দীর্ঘদিন এই ব্যবস্থা চলে আসবার পর রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে। এই সম্বন্ধেই কিছু জানবার জন্যে আমি একটি পরিচ্ছেদ পড়তে লাগলুম।

দেখলুম যে ষোড়শ শতাব্দীতে তিব্বতের লামারা ভুটানে আসতেন বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। ভুটানের পশ্চিম দিকে আসা সুবিধাজনক ছিল বলে পারো উপত্যকাতেই তাঁরা আগে এসেছিলেন, তারপরে গিয়েছিলেন পূর্ব ভুটানে। লামা নওয়াং চেওকি গিয়ালপো ও তাঁর অনুচরেরা ১৫০৬ সালে পারো উপত্যকায় অনেকগুলি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু তিব্বতে তখন বৌদ্ধদের পাঁচটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলছিল। এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের নাম নিঙ্গমা, লাপা কার্গিন, কামচান কার্গিন, সাক্যপা ও গেইলুপা। সবগুলি সম্প্রদায়ের লামারা এসে ভুটানে জুটেছিলেন এবং এক একজনের প্রতিপত্তি হয়েছিল এক এক জায়গায়। সমগ্র ভুটানে কোন সম্প্রদায়ই তেমন সুবিধা করতে পারে নি। এই অবস্থায় ভুটানে এসে উপস্থিত হলেন রালুং-এর নওয়াং নামগিয়েল। এঁর জন্ম দ্রুক্পা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ইয়েশি দোর্জির ভাই-এর বংশে এবং ভুটানে এসেছিলেন তেইশ বছর বয়সে ১৬১৬ সালে। তিনি লেখা পড়া শিখেছিলেন রালুং-এ দ্রুক্পা লামার কাছে। তাঁর আশা ছিল এই সম্প্রদায়ের প্রধান হবার, কিন্তু এক প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে গিয়ে মনের দুঃখে তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন। কিংবদন্তী আছে যে তিনি স্বপ্নে ভুটানের রক্ষক এক দেবতাকে দেখেছিলেন। সেই দেবতাই তাঁকে ভুটানে আসতে বলেন। তিনি এই আদেশ পালন করেছিলেন এবং পঁয়ত্রিশ বছর ভুটানে বাস করে ভুটানের ইতিহাসে তাঁর অবিস্মরণীয় নাম রেখে গেছেন। সারা জীবন যুদ্ধ বিগ্রহ করে আটান্ন বছর বয়সে তিনি এই দেশেই দেহ রক্ষা করেন। ভুটানে ইনিই শবদ্রুং রিমপোছে নামে পরিচিত এবং তাঁর আমল থেকে ভুটানবাসীরা দ্রুক্পা নামে অভিহিত হচ্ছে। দ্রুক্পা মানে

বজ্রের মানুষ।

তিব্বতের রাজা দেব চাঙ্গপা তাঁকে জয় করবার জন্যে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ভুটানের সেই রক্ষক দেবতা তাঁকে নাকি স্বপ্নে বলেছিলেন যে তাঁরই জয় হবে। জয় হয়েছিল তাঁরই এবং এক তান্ত্রিক ক্রিয়া করে তিনি দেব চাঙ্গপা ও তাঁর পরিবারের ধ্বংস সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর পরেই তিনি জোর ছাম নামে যে নৃত্যের পরিকল্পনা করেন, লামারা আজও সেই নৃত্যের অনুষ্ঠান করে থাকেন।

নওয়াং নামগিয়েলের খ্যাতি চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনিই দেশ শাসনের যৌথ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। শোনা যায় যে তিনি এই ব্যাপারেও একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর পিতা নাকি স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন যে দেশে সুখ ও শান্তি আনতে হলে শুধু লামাদের নয়, জনসাধারণের হাতেও দেশ শাসনের ভার দিতে হবে। এই আদেশ পেয়ে তিনি তিরিশ জনের একটি কাউন্সিল গঠন করেন, তাতে তাঁর তিব্বতী অনুচরদের সঙ্গে এ দেশের ভক্তরাও সামিল হয়। এঁরাই তাকে শাসন ও ধর্ম প্রচারে সাহায্য করতেন।

১৬২৯-এ তিনি থিম্ফু উপত্যকায় সেমটোকা জং তৈরি করেন। দু বছর পর এই জং-এই তাঁর ছেলে জমফল দোর্জির জন্ম। তিনি পুনাখার জং নির্মাণ করেন আরও পাঁচ বছর পরে। এই জং থেকে তিনি রাজ্য শাসনের যৌথ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। পুনাখা এখন আর দেশের রাজধানী নয়। তবু তাঁর প্রবর্তিত পুরনো প্রথা আজও চলে আসছে। এখনও নতুন রাজার অভিষেক হয় পুনাখা জং-এ এবং জেয় খেনপো বা প্রধান লামাও এইখানেই গদিতে বসেন। নওয়াং নামগিয়েল এখানে একজন লামাকে জেয় খেনপোর পদে বসিয়ে তাঁর ওপরে সমস্ত লামাদের এবং ধর্ম কর্মেব দায়িত্ব ভার দিয়েছিলেন এবং আর একজন লামাব ওপরে দেশ শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তাঁর নাম হয়েছিল দুগ দেসি বা দেব রাজা। তিনি বিদেশনীতি অর্থনীতি এমন কি লামাদের প্রয়োজনও দেখতেন।

তাঁর শাসন কালে তিব্বতের সঙ্গেও শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। তাঁব শত্রুরা এসে তাঁকে সম্মান জানিয়েছিলেন পুনাখায়। প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গেও তাঁর সদ্ভাব ছিল। কুচবিহারের রাজা প্রাণ নারায়ণ তাঁকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। নেপাল ও লাদাখ থেকেও দূত এসেছিল তাঁর কাছে। দুজন পর্তুগিজ পাদ্রীও তাঁর সভায় এসেছিলেন সাহায্য করতে।

এই সময়েই তিব্বতে লাল টুপিধারী ও হলদে টুপিধারী এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাধান্য নিয়ে বিবাদ চরমে উঠেছিল। মোঙ্গল সেনানায়ক গুশি খান ছিলেন হলদে টুপির পক্ষে, আর লাল টুপির পক্ষে ছিলেন তাতার সেনানায়ক কোকোনয়ের খান। অন্য দিকে বন ধর্মের ধ্বজাধারী ছিলেন খামের রাজা। গুশি খান প্রথমে তাতার সেনা বিধ্বস্ত করলেন, তারপর জয় করলেন খামের রাজাকে। তিব্বতের উপরে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করেই তিনি পঞ্চম দলাই লামাকে বসালেন তিব্বতের গদিতে। জয় হল হলদে টুপির। এর পরেই গুশি খান মোঙ্গল ও তিব্বতী সেনা পাঠালেন ভুটান জয় করতে। এই সেনাবাহিনীর সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হল নওয়াং নামগিয়েলের। জয় হল ভুটানেরই। নওয়াং নামগিয়েলের খ্যাতি উঠল চরমে।

দলাই লামা আর একবার ভুটানে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। কয়েক মাস ধরে যুদ্ধ হয়েছিল। নামগিয়েল চার দিকে চারটি থোস অর্থাৎ পাথরেব স্তম্ভ সাজিয়েছিলেন তিব্বতী সেনার অগ্রগতি রুখতে। তিব্বতী সেনা পরাজিত হয়েছিল। সেই থেকে

ভুটানের সমস্ত বিহারের চারদিকে চারটি দিকপাল নির্মাণ করা হয়। পুনাখার জং-এ গেলে তিব্বতী ও মোঙ্গল সেনার ব্যবহৃত অনেক অস্ত্র দেখতে পাওয়া যাবে। তিব্বতীদের সঙ্গে যুদ্ধ জয়ের পরে নামগিয়েল নির্মাণ করেছিলেন ওয়াংদিফোদ্রঙের জং। তার মধ্যে যুদ্ধের দেবতার এক মূর্তি আছে। ভুটানের সেনা যুদ্ধে যাবার আগে এই মূর্তির কাছেই যুদ্ধ জয়ের প্রার্থনা জানিয়ে যায়।

স্বাতি ফিরে এসেই আমাকে তাড়া দিল। বলল : বই রেখে এবারে মুখ হাত ধুয়ে নাও। একটু পরেই রোদ উঠবে বলে মনে হচ্ছে।

বইখানা মুড়ে রেখে বললুম : রোদ না উঠলেও ক্ষতি নেই। পরিচ্ছন্ন আলোতেই মন ভরে উঠবে।

বলে আমিও তাড়াতাড়ি বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে নিলুম। কিন্তু আশ্চর্য হলুম স্বাতির তৎপরতা দেখে। এরই মধ্যে সে চা-এর ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। আমাকে আশ্চর্য হতে দেখে বলল : কাল রাতেই ম্যানেজারকে বলে রেখে ছিলুম।

চা-এ চুমুক দিয়ে বল্লুলুম : পুরনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই সব বাউণ্ডুলে দিনের কথা।

স্বাতি সহাস্যে বলল : বল।

বললুম : উতোরপাড়ার ঘরে ঘুমিয়ে থাকতুম বেলা পর্যন্ত। হারানিধি তার দোকান থেকে চা পাঠাত। একটা ছেলে এসে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে চা-এর ভাঁড় রেখে যেত। কিছু বলে যেত কিনা মনে নেই, কিন্তু অনেক সময়েই চা জুড়িয়ে যেত। পেয়ালা নিতে এসে ঠাণ্ডা চা দেখলে সেটা ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে গরম চা এনে হল্লা করে জাগিয়ে দিত আমাকে।

সকালে উঠতে না কেন ?

হাতে ভাল বই থাকলে হুঁস থাকত না রাতের।

স্বাতি বলল : বুঝেছি। এখনও তোমাকে জাগাবার জন্যে লোক চাই। তাই তো !

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি নীরবে তা মেনে নিলুম। তারপর চা শেষ করে বেরিয়ে পড়লুম ঘর থেকে।

আকাশে আজ মেঘ নেই। দূরের পাহাড় দেখা যাচ্ছে কাছে। এ পাহাড় তুষারে চির আবৃত নয়। এ পাহাড় নীল, কিন্তু আকাশের মতো নীল নয়, কাংড়া উপত্যকায় ধবলাধারকে যেমন দেখেছি, এ যেন সেই রকম পাহাড়। বরফ পড়ে সাদা হয়, উত্তাপে তার রঙ বদলায়—ধূসর শ্যামল নীল। শীতল বাতাস বইছে অল্প অল্প, ভাল লাগছে। সারা দিনের মধ্যে এই সকালটাকেই সবচেয়ে ভাল বলে মনে হচ্ছে।

স্বাতি বলল : কোন্ দিকে যাবে ?

যাবার দুটো দিক দেখতে পাচ্ছি। এক দিকে ধাপে ধাপে কয়েকটা সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে, পথও আছে। অন্য দিক উপরের দিকে উঠেছে। বললুম : নীচে নামব না, ওপরের দিকেই উঠব।

স্বাতি হেসে বলল . তুমি যে এই রকমের উত্তর দেবে তা জানি।

কেমন করে ?

এ তোমার চিরকালের ইচ্ছে। তুমি ওপরেই উঠতে চাও, নীচে নামতে চাও না। কিন্তু ওঠা-নামা নিয়েই তো জীবন !

জীবনের পথটা সমতল নয় বলেই ওঠা-নামা করতে হয়। তাই নামার সময়ে সতর্ক হতে হয়, পা বাড়াবার আগে বুঝে নিতে হয় যে কতটা নামার পর আবার চড়াই পাওয়া

যাবে, শিখরে পৌঁছানো যাবে কিনা।

আমরা একটু একটু করে উপরের দিকে উঠতে লাগলুম। কিন্তু দেখবার মতো কিছু দেখতে পেলুম না। কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা বড় বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে ব্যারাকের মতো বাড়ি, ছোট গেটে গৃহস্বামীর পরিচয় লেখা, পথের ধারে বুনো গোলাপের লতা, আর মাঝে মাঝে দু একজন প্রহরী।

স্বাতি বলল: তুমি কী পড়ছিলে?

বললুম: ভুটানের ইতিহাস।

কিন্তু এ দেশের ইতিহাসে কি রোমাঞ্চকর কিছু আছে কৌতূহল জাগাবার মতো?

সে রকম ঘটনা না থাকলেও ইতিহাসের একটা মূল্য আছে। কী ভাবে একটা অন্ধকার দেশ আলোর দিকে পদক্ষেপ করেছিল, সে কথাও জানা দরকার। বিশ্বের অগ্রগতিতে প্রত্যেকটি পদক্ষেপেরই মূল্য আছে। আর ভুটানের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে, যা এ যুগের সমস্ত ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী।

কী রকম?

বলে স্বাতি আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল।

বললুম: অনেকদিন আগে মিশরের গদিচ্যুত রাজা বিদেশে নির্বাসনে এসে বলেছিলেন যে পৃথিবীতে পাঁচটি রাজা বেঁচে থাকবেন, তাসের চারটি রাজা আর ইংলণ্ডের।

স্বাতি বলল: "তাসের রাজাকে তো আমরা সাহেব বলি!

ইংরেজিতে কিং।

এর সঙ্গে ভুটানের কী সম্পর্ক?

বললুম: সেই কথাই বলছি। নওয়াং নামগিয়েল ভুটানে শবদুং রিমপোছে নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনিই তিব্বত থেকে এসে সমগ্র ভুটানকে দ্রুক রাজ্যে পরিণত করেন। নিজে ছিলেন দ্রুকপা সম্প্রদায়ের প্রধান এবং একজন অসাধারণ যোদ্ধা। আর স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেশ শাসনের একটা অভিনব ব্যবস্থা করেছিলেন।

কী রকম?

তিনি একজন ধর্মরাজা নিয়োগ করেছিলেন দেশে ধর্ম রক্ষার জন্যে। এঁর হাতে ছিল সমস্ত বিহার পরিচালনা, লামাদের শিক্ষার ব্যবস্থা। এমনকি দেশ শাসনের জন্য দেবরাজা নির্বাচনের দায়িত্ব পর্যন্ত। দেবরাজারা ছিলেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। প্রশাসনের সুবিধার জন্য তিনি দেশটাকে বিভক্ত করেছিলেন কয়েকটি ভাগে। প্রত্যেকটি বিভাগের শাসনকর্তাকে বলা হত পেন্‌লপ, এক একটি জঙে তাঁর কেন্দ্র। এই সব বিভাগ বা প্রদেশকে ছোট ছোট জেলায় বিভক্ত করে তার ভার দেওয়া হয়েছিল জংপনদের ওপরে।

স্বাতি বলল: এতো খুব ভাল ব্যবস্থা?

খুব ঠিক কথা। কিন্তু এ ঘটনা ঘটেছিল রাজা ফারুকের প্রায় শ তিনেক বছর আগে। তখন সব দেশেই ছিল প্রতিপত্তিশালী রাজা। আর শবদুং রিমপোছে যে একজন ব্রহ্মচারী লামা ছিলেন তা নয়, সেমটোকা জঙে তাঁর একটি ছেলেও জন্মেছিল। ইচ্ছে করলে তিনি নিজে ভুটানের সর্বময় কর্তা হয়ে নিজের ছেলেকে রাজ্য শাসনের ভার দিয়ে যেতে পারতেন। তা না করে তিনি একজন ধর্মরাজার হাতে ধর্ম রক্ষা ও দেবরাজার হাতে দেশ রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। ধর্মাধ্যক্ষ হবার একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। তাই দেবরাজার ব্যাপারে তিনি নির্বাচনের ব্যবস্থা

করেছিলেন। দেশের অগ্রগতির ব্যাপারে এ একটা নতুন পদক্ষেপ নয় কি ?

স্বাতি বলল : এতে কোন সন্দেহ নেই।

বললুম : এখন আমরা ভুটানে রাজা দেখছি—এক রাজার মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে রাজা হয়েছেন। শুনেছি এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে এই শতাব্দীরই গোড়ার দিকে, বোধহয় ১৯০৭ সাল থেকে। অর্থাৎ পৃথিবীর অন্য দেশের রাজাদের যখন গদিচ্যুত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তার কিছু দিন আগে ভুটানে বংশানুক্রমে রাজার পদ সৃষ্টি হয়েছে। এতে আশ্চর্য হতে হয় নাকি ?

কিন্তু কেন এমন হল বলতে পার ?

অনুমান করতে পারি।

কী ?

ক্ষমতার জন্যে লড়াই। একজন দেবরাজার পর কে নির্বাচিত হবেন দেবরাজা, এই নিয়েই বিবাদ। ১৬৫১য় শবদুং রিমপোছে বানপ্রস্থে যাবার জন্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করেই মারা গেলেন। এই মৃত্যুর খবর পাঁচ বছর চাপা রইল। ১৯০৭-এ শেষ হয়ে গেল দেবরাজাদের যুগ। মাঝখানে আড়াইশো বছরে ভুটানে দেবরাজা হয়েছিলেন ছাপ্পান্ন জন। এর মানে এক এক জন দেবরাজা পাঁচ বছরও রাজ্য শাসন করতে পারেন নি। তার ফল তো অনিবার্য। দেশের উন্নতি হবে, না ক্ষমতার জন্য লড়াই করতেই ফুরিয়ে যাবে সমস্ত শক্তি !

স্বাতি বলল : বুঝেছি। দেশের মানুষও বুঝতে পেরেছিল যে এর চেয়ে যে কোন ব্যবস্থাই ভাল হবে।

কথা বলতে বলতে আমরা অনেক দূরে চলে গিয়েছিলুম। তার পরেও কোন আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে না পেয়ে স্বাতি বলল : আর নয়, এইবারে ফেরা যাক।

বলে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়তেই আমি ফেরার জন্যে পা বাড়ালুম। স্বাতি বলল : নতুন জায়গায় এলে দর্শনীয় স্থানের কথা আগে জেনে নেওয়া দরকার। তা না হলে অকারণে পরিশ্রম করতে হয়।

বললুম : আমরা তো কিছু দেখবাব জন্যে পথে বেরোই নি, আমরা বেরিয়েছি প্রাতঃভ্রমণে। সুন্দর সকালে বুক ভরে একটু নিঃশ্বাস নেব।

স্বাতি বলল : কিছু দেখতে পেলে আরও ভাল লাগত।

সে রকম ইচ্ছে থাকলে বেরোবার আগে কারও কাছে জেনে নিতে হত। শহরে কী দেখবার আছে জানতে চাইলেই জানা যেত।

ভয় নেই। তার জন্যে আমি আপশোস করছি না। তোমাকেও আপশোস করতে হবে না। বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ না থেকে এই সুন্দর পরিবেশে হাঁটতে আমার ভাল লাগছে। তোমারও খারাপ লাগছে বলে মনে হয় না।

তার পরেই বলল : একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা জং দেখতে বেরোব। সেই সময়েই শহরটাও দেখে নেব। কী বল ?

বললুম : তোমার সব ব্যবস্থাই তো আমি মেনে নিচ্ছি।

আমরা ওপর থেকে নেমে আসছিলুম। মনে পড়ে গেল যে এক সময়ে পুনাখায় ছিল ভুটানের রাজধানী। অনেকেই ভূগোলের বই-এ এই কথা পড়েছেন। আমি কী পড়েছিলুম, মনে করতে পারলুম না। কিন্তু পুনাখা থেকে রাজধানী সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল অনেক দিন আগেই। রাজধানীর জন্যে এই জায়গাটি নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজন ছিল রাজধানীর মতো করে একটি শহর নির্মাণের। বড় জং ছিল

সরকারি দপ্তরের উপযোগী। কিন্তু শুধু দপ্তর হলেই তো চলে না। একটা শহরও চাই। তাই পারো শহরে অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করে থিম্ফু শহর নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। প্রশস্ত পথ ঘাট, দোকান পাট, ঘর বাড়ি, হোটেল বাজার। এখানে দর্শনীয় বলতে যদি কিছু থাকে তো সে এখানকার জং, বিহার বা ঐ ধরনেরই কিছু প্রাচীন স্থান। সে সব কাছে না হওয়াই স্বাভাবিক। তাই আমি তার কোন খবর নেবার চেষ্টা করি নি।

আমাকে নীরবে পথ চলতে দেখে স্বাতি বলল : কী ভাবছ ?

বললুম : এখানে জেনে নেবার মতো বিষয় কী আছে, সেই কথাই ভাবছি। তোমার কিছু মনে আসছে না ?

এই মুহূর্তে যা মনে আসছে, তার উত্তর আমি অনুমান করতে পারি।

বল।

বলে স্বাতি আমার দিকে ফিরে তাকাল।

বললুম : গৌতম বুদ্ধের আড়াই হাজার বছর পূর্ণ হবার উৎসব হয়েছিল ভারতে। ভারতের নিমন্ত্রণে তিব্বতের দলাই লামা ও পাঞ্চেন লামা ভারতে এসেছিলেন চুম্বি উপত্যকা ও সিকিমের মধ্য দিয়ে। সিকিমের রাজা তাঁকে সম্বর্ধনা করে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ভুটানে পদার্পণ করেন নি। তারপর তাঁকে যখন তিব্বত ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেবার জন্যে পালিয়ে আসতে হয়েছিল, তিনি এসেছিলেন অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং অঞ্চল দিয়ে। সেবারেও তিনি ভুটানে আসেন নি। ভুটানের জনগণও তাঁকে দেখবার জন্যে সিকিমবাসীর মতো উন্মত্ত হয়ে ওঠে নি।

স্বাতি বলল : সত্যিই তো ! কেন এমন হয়েছিল বলতে পার ?

অনুমান করতে পারি।

তাই বল।

বললুম : তিব্বতী বৌদ্ধদের মধ্যে নানা সম্প্রদায় আছে। তার মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ের কথা আমি জানি—লাল টুপি ও হলদে টুপি। ভুটানে লাল টুপির প্রাধান্য এবং দলাই লামা হলদে টুপির প্রধান। তাঁদের কাছে তিনি বুদ্ধেরই অবতার। কিন্তু লাল টুপি সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা বোধহয় তাঁকে মানেন না। অন্তত আমার এই রকমের একটা ধারণা হয়েছে।

স্বাতি বলল : অসম্ভব নয়।

কারও সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ পেলে আমরা এই কথাটা সঠিক ভাবে জেনে নেব।

আমরা আমাদের হোটেলের কাছাকাছি এসে গিয়েছিলুম। তাই দেখে স্বাতি বলল : আর সে সুযোগ না পেলে তোমার কাছেই জেনে নেব এই বিবাদের কারণ।

হোটেলের সামনেও দেখলুম বুনো গোলাপের লতা। সবুজ গাছ, কিন্তু ফুল নেই কোন। গোলাপ এখানে শীতের সময়ে বোধহয় ফোটে না, ফোটে গ্রীষ্মকালে। শীতের শেষে বসন্ত কালে গোলাপের পরিচর্যা করে ফুল পাওয়া যায় গ্রীষ্মে। পরে জেনেছিলুম যে মে মাসে এলে গোলাপের বাহার দেখে নাকি যাত্রীরা পাগল হয়ে যায়।

হোটেলের ভিতরে আমরা ঢুকে পড়লুম।

২০

হোটেলের ম্যানেজার তখনও কাউণ্টারে এসে বসেন নি। একজন বেয়ারা এগিয়ে এসে এক টুকরো কাগজ আমার হাতে দিল। দেখলুম, নিরাপদ দু লাইন লিখে পাঠিয়েছে। আমরা যেন দশটার আগেই বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে থাকি। অফিসে যাবার পথে দেবুদা আমাদের তুলে নিয়ে যাবে। কেন, কী জন্যে, সে সব কথা লেখে নি। স্বাতি বলল : কোথায় নিয়ে যাবে, তাও তো লেখে নি !

বললুম : বোধহয় তাঁর নিজের অফিসে।

কেন ?

নিজের অফিস মানে যে অফিসে সে কাজ করে। আর সেটা যদি কোন বড় অফিস হয় তো সেখানেই আমরা পারো-পুনাখা যাবার পার্মিট পেতে পারব।

স্বাতি বলল : আমাদের যদি প্রয়োজন না থাকে, তবে আমরা তাঁর সাহায্য নেব কেন !

তাঁকেই সে কথা জিজ্ঞেস করব।

বলে আমি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। স্বাতি বেয়ারাকে ডেকে বলল : স্নানের জন্যে গরম জল পাওয়া যাবে ?

বেয়ারা বলল : এখুনি চাই ?

স্বাতি বলল : হ্যাঁ এখুনি। স্নান করে আমরা ব্রেকফাস্ট করব।

বেয়ারা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

এ আমাদের পুরনো অভ্যেস। গরম জলের দরকার না থাকলে আমরা আগেই স্নান করে নিতুম। ভোর বেলায় স্নান করে বেরোতে পারলে সারা দিনের জন্যে আর কোন ভাবনা থাকে না। আহারটা বড় নয়, বড় শরীর ও মনের প্রসন্নতা। স্নানে শুধু শরীরই পরিষ্কার হয় না, মনও প্রসন্ন হয়। সেই জন্যেই বোধহয় পুরাকালে সূর্যোদয়ের আগে উঠে অবগাহন স্নানের বিধি ছিল। ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্রোতস্বতীতে স্নান। অঘমর্ষণ ঋষি এই স্নানের মন্ত্র রচনা করেছিলেন। সেই মন্ত্র পাঠ দ্বিজের কর্তব্য। কিন্তু ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে স্নানের বিধি এখন আর কেউ মানে না। আমরা আজকাল নিজেদের সুবিধা মতো ঘরের মধ্যে কলের জলে স্নান করি। সে সুবিধা না থাকলেই পুকুরে বা নদীতে স্নান করি। আজও যাঁরা ভোরবেলায় গঙ্গায় স্নান করতে যান, তাঁদের মনের প্রসন্নতা আমি অনুভব করি।

যথাসময়ে তৈরি হয়ে আমরা দেবুদার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। স্বাতি বলল : কাল নিরাপদ আমাদের দেবুদার কথা কিছু বলে নি, তাই না ?

বললুম : এই নামটি তার চিঠিতেই প্রথম জানলুম।

স্বাতি বলল : মনে হচ্ছে কোন বাঙালী ভদ্রলোক, বয়সে নিরাপদর চেয়ে বড়।

সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

ঠিক এই সময়েই বাইরে একটি জীপের শব্দ পাওয়া গেল। পরক্ষণেই এক ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন। আমাদের দেখতে পেয়েই এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন।

আমরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে নমস্কার জানাতেই বললেন : নিরাপদ আপনাদের খবর দিয়েছিল তো ! আমি দেবদত্ত বিশ্বাস, তাশিচো জঙে আপনাদের পৌঁছে দেবার হুকুম হয়েছে।

স্বাতি বলল : কিন্তু এর জন্যে আপনাকে কষ্ট করতে হবে কেন !

দেবদত্তবাবু বললেন : আমার কষ্ট কিসের ! আমাকে তো অফিসে যেতে হচ্ছে, আপনাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছি। ফেরার সময়ে বুঝতে পারবেন কী উপকার করলাম।

মানে ?

আগে আসুন, গাড়িতে উঠুন, তারপর বলছি।

বলে আমাদের বাইরে টেনে এনে আগে আমাকে তুলে দিলেন ড্রাইভারের পাশে, তারপর স্বাতিকে।

বললেন : এই হাতলটা চেপে ধরে বসবেন।

বলে নিজে লাফিয়ে উঠলেন পিছনে।

ড্রাইভার জীপে স্টার্ট দিতেই বললেন : মাঝ পথে একবার আপনাদের কষ্ট দেব।

উত্তর স্বাতি দিল, বলল : আরামের লোভ থাকলে বাড়ি ছেড়ে আমরা বেরোতাম না।

ভদ্রলোক পিছন থেকে বললেন : ঠিকই তো ! কষ্ট করে যখন পথে বেরিয়েছেন, তখন—

কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না দেখে বললুম : এই কষ্টকেই আনন্দ বলে ভাবছি।

ঠিক বলেছেন। এইটেই হল খাঁটি কথা। কষ্টকে কষ্ট ভাবলেই কষ্ট।

আর তার মধ্যে যদি আনন্দের রস পাওয়া যায়, তাহলে আর তা কষ্ট নয়।

স্বাতি বলল : এইবারে বলুন তো, মাঝপথে কি আমাদের কোন পাহাড়ে উঠতে বলবেন ?

পিছন থেকে ভদ্রলোক বললেন : না না, সে রকম কোন বদ মতলব নেই।

তবে ?

নিরাপদর হুকুম হয়েছে যে প্রয়াত রাজার সমাধিটা দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শহরের মাঝখানে এই সমাধি নতুন তৈরি হয়েছে। অবশ্য ইচ্ছে করলে আপনারা হেঁটে এসেও দেখতে পারতেন।

স্বাতি বলল না যে সকালে আমরা হাঁটতে বেরিয়েছিলুম, জানা থাকলে দেখে আসতে পারতুম। জীপের ড্রাইভারকে বলা ছিল। অল্পক্ষণ পরেই সে একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম।

জানা না থাকলে আমরা একে একটা ছোর্তেন ভাবতুম। স্বাতি দেবদত্তবাবুকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করে বসল : একে এ দেশে ছোর্তেন বলে না ?

ভদ্রলোক তৎপর ভাবে উত্তর দিলেন : অনুগ্রহ করে আপনারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।

বলেই এক রকমের ছদ্ম গাম্ভীর্য ধারণ করলেন।

স্বাতি বলল : বেশ, তাহলে, একটা ছবি তুলে নিই, আর কারও কাছে জেনে

নেওয়া যাবে।

কিন্তু ছবি তোলায় বিপত্তি বাধালেন আকাশের সূর্য। কখন যে মেঘ করেছিল তা দেখতে পাই নি। হঠাৎ সেই মেঘ সূর্যকে ঢেকে ফেলল। স্বাতি তবু ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরা খুলতে না খুলতেই ঝির ঝির করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। আমরা ছুটে গিয়ে কোনখানে আশ্রয় নেবার আগেই থেমে গেল বৃষ্টি। কিন্তু অন্ধকার হয়ে রইল এমন ভাবে যে হতাশ হল স্বাতি। তবু একটা এক্সপোজার দিয়ে বলল : তোমার কাজে না লাগলেও ছবিটা রইল জ্ঞান-বিজ্ঞানের রিসার্চের জন্যে।

আমরা আবার গাড়িতে উঠে যাত্রা করলুম। এবারে আর শহরের দ্রষ্টব্য নয়। প্রশস্ত পথ ধরে শহর ছাড়িয়ে সোজা তাশিচো জঙে। শহর ছাড়িয়ে বলা ঠিক হবে না, শহরেরই উপকণ্ঠে এই জং। জীপে কতটা পথ অতিক্রম করে এসেছি তা জানি নে বলেই এই রকম মনে হচ্ছে। কিন্তু জীপ থেকে নেমে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। আমরা জঙে এসে নামি নি, জঙের সামনে কিছু ঘরবাড়ির কাছে এসে নেমেছি। জং পাহাড়ের উপরে নয়। একটা খোলামেলা উপত্যকায়। পাহাড় দূরে। কিন্তু চারি দিকটা ভাল করে দেখবার আগেই দেবদত্তবাবু বললেন : আসুন আমার সঙ্গে।

বলে তিনি আমাদের নিয়ে একটা ঘরে ঢুকলেন। অফিস ঘর। অনেকেই নিজেদের চেয়ার দখল করে বসেছে,কিন্তু অফিসের কাজ এখনও আরম্ভ হয় নি। কেউ কথা বলছে নিজেদের মধ্যে, কেউ কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছে। দেবদত্তবাবু আমাদের নিয়ে একটি ছোট ঘরে ঢুকে বললেন : বসুন আপনারা।

বলে তাঁর সামনের দুখানা চেয়ারে বসিয়ে নিজের ব্রীফ কেসটি লুকিয়ে রাখলেন। তারপরে সহাস্যে বললেন : এইবারে যদি বলি যে আমার কাজ ফুরিয়েছে, এবারে আপনারা নিজেদের পথ দেখুন—

বললুম : সে কথা বললেই আমরা আরাম পাব।

ভদ্রলোক চমকে উঠে বললেন : কেন বলুন তো!

হেসে বললুম : নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে পড়ে যাবার ভয় নেই। নিজের পা দুখানাই বোধহয় সবচেয়ে বিশ্বস্ত বাহন।

ভদ্রলোকও হেসে বললেন : আপনাদের ঐ পা হোটেলে ফেরার পথে বিদ্রোহ করবে, বসে থাকতে চাইবে পথের ধারে।

কেন?

গাড়িতে এসেছেন বলে দূরত্বটা কম নয়। আর যা ভাবছেন তা নয়। অফিসের বাইরে ফেরার কোন যানবাহন পাবেন না।

স্বাতি বলল : ফেরার কথা ভেবে তো ঘর ছেড়ে বেরোই নি, ভেবেছি শুধু এগিয়ে যাবার কথাই।

দেবদত্তবাবু বললেন : পেটের আগুনই আপনাদের ফেরার কথা মনে করিয়ে দেবে।

স্বাতি বলল : তাহলে আপনাকে হতাশ হতে হবে।

কেন?

এক সময়ে এ সব ভাবনা আমার ছিল, এখন আর নেই। এই ভবঘুরে ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘুরে নিজের সব অভ্যেস বদলে ফেলেছি।

বলে আমার দিকে চেয়ে স্বাতি হাসল।

ভদ্রলোক একখানা চিঠির কাগজ আর একটা ডট পেন আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে

বললেন : তবে আপনাদের নাম আর ঠিকানাটা এই কাগজে লিখে দিন নীচের দিকে।

আমি খসখস করে নিজেদের নাম আর ঠিকানা লিখে তাঁর হাতে দিতেই তিনি উপরের দিকে কিছু লিখে টেবলের ঘণ্টা বাজালেন। একজন পিওন ঘরে আসতেই তার হাতে দিয়ে বললেন : পারো আর পুনাখার পার্মিট আনতে হবে।

পিওনটি মাথা নেড়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু দেবদত্তবাবু কাকে আবার ডেকে বললেন : রিনচেনকে পাঠিয়ে দিয়ে যেও। আর সে না এসে থাকলে তার পাশের কাউকে বলে য়েও।

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললেন : আর একটা কথা এই সময়েই বলে রাখি। নিরাপদর আদেশ, জং দেখা হয়ে গেলে এইখানেই অপেক্ষা করতে হবে।

স্বাতি বলল : কতক্ষণ ?

তা জানি নে।

কী জন্যে তা জানেন কি ?

না। তবে এইটুকু জানি যে লাঞ্চের সময় পার হয়ে যেতে দেখলে পিত্তি না পড়ার কোন ব্যবস্থা করতে হবে।

বললুম : বুঝেছি।

কিন্তু ভদ্রলোক বললেন : সবটা বোঝেন নি। রাতে আপনাদের কোন প্রোগ্রাম রাখা চলবে না।

বললুম : রাতে আমাদের ঘুমোবার প্রোগ্রাম।

সেটা রাখতে পারেন। তবে কিছু বিলম্ব হতে পারে। অর্থাৎ সন্ধ্যেবেলায় হোটেলে হাজির থাকবেন।

এই সময়ে যে ছেলেটি এসে দেবদত্তবাবুকে নমস্কার করে দাঁড়াল, তিনি তাকেই বললেন : রিনচেন, এই জং সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল কাউকে খুঁজে বার করে এঁদের নিয়ে যাও। এঁরা অনেক দূর থেকে এসেছেন, সবকিছু ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ছেলেটি ফিরে এসে বলল : আসুন আমার সঙ্গে।

দেবদত্তবাবু বললেন : পেয়ে গেছ কাউকে !

রিনবেন বলল : হ্যাঁ, তিনি এই জঙের ইতিহাসও জানেন।

খুশী হয়ে দেবদত্তবাবু বললেন : তবে আর কী ! জঙের ভূগোল ইতিহাস দুইই আপনাদের জানা হয়ে যাবে।

অফিসের বাইরেই একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর কাছে আমাদের পৌঁছে দিয়েই রিনচেন বিদায় নিল। আর আমরা সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে অগ্রসর হলুম।

যে পথে আমরা এসেছিলুম, সেই পথই জঙের প্রবেশ পথে এসে শেষ হয়েছে। আকাশের দিকে চেয়ে অনুমান করলুম যে এটি দক্ষিণ দিক। মন্দিরের মতো জমকালো প্রবেশ পথ। অনেকগুলি চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে দরজা পর্যন্ত। কিন্তু আমরা ডান দিকের পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে ফিরে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। জঙের এ দিকটা দ্বিগুণ লম্বা বলে মনে হল। আর এই দিকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত গোলাপের বাগান। বাগান বললে ভুল হবে, ক্ষেত বলা উচিত। কত হাজার গাছ আছে গোনা সম্ভব নয়। মাঝে মাঝেই ফুল ফুটে আছে নানা রঙের। কিন্তু ভদ্রলোক অন্য দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন : থিম্ফু চু দেখুন।

স্বাতি থমকে দাঁড়িয়ে বলল : এযে দেখছি নদীর ধারেই এই জং।

ভদ্রলোক বললেন : হ্যাঁ, একেবারে সমান্তরাল ভাবে এই জং তৈরি হয়েছে। আগে এই জঙের নামেই জায়গার নামও ছিল, এখন থিম্ফু নাম হয়েছে। থিম্ফু শব্দের মানে গৌরবময় ধর্মের দুর্গ, fortress of the glorious religion.

থিম্ফু শব্দেরও যে একটা মানে আছে তা জেনে আমি বিস্মিত হলুম। কিন্তু ভদ্রলোক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন : নদীর ধারে ঐ বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন ?

বললুম : হ্যাঁ।

আমাদের রাজা থাকেন কটেজের মতো ছোট ঐ বাড়িতে। আর নদীর ওপরে আর একটি বাড়িতে সরকারী ব্যাঙ্কোয়েট হল, অতিথিদের সেখানে এণ্টারটেইন করা হয়।

তারপর এগোতে এগোতে বললেন : ভাববেন না যে এই জং খুব প্রাচীন। আবার নতুনও ভাববেন না একে।

স্বাতি বলল : এতো বেশ মজার কথা হল !

মজার কথাই।

বলুন না সে কথা।

ভদ্রলোক বললেন : ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিব্বত থেকে এক লামা এসে এখানে একটি বিহার নির্মাণ করেন। তার নাম ছিল দো-হন, মানে নীল পাথর। নওয়াং নামগিয়েল এই বিহারকেই একটা জঙে পরিণত করে নাম দেন তাশিচো। এই ঘটনা ১৬৪১ সালের। পঞ্চাশ বছর পর এখানকার শাসনকর্তা এটিকে বড় করেন। ১৭৩০ সালে ভুটানের সঙ্গে তিব্বতের সন্ধি হয় এই জঙেই। তারপর এই জং আরও বড় করা হয়েছিল। কিন্তু আগুন লেগে এই জং দুবার পুড়ে যায় ১৭৭১ ও ১৮৬৯ সালে। পরের বছর এই রাজ বংশের একজন জং মেরামত করে নতুন একটি মন্দির নির্মাণ করেন।

তারপর ?

ক্লড হোয়াইট সাহেব এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে দুবার এখানে এসেছিলেন। তিনি এই জঙের বর্ণনা লিখে রেখে গেছেন।

বললুম : সংক্ষেপে বলুন না সেই বর্ণনা।

ভদ্রলোক বললেন : থিম্ফু ভুটানের রাজধানী হবে বলে আমাদের প্রয়াত রাজা একে একেবারে নতুন করে গড়েছেন। এই কাজ শেষ হয়েছে ১৯৬৯ সালে তাঁর মৃত্যুর বছর তিনেক আগে। রাজা নিজে এর নির্মাণের কাজ তদারক করেছিলেন এবং হোয়াইট সাহেবের বর্ণনার সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল এখনও আছে। জঙের মাঝখানে যে বিহারে জেয়খেন্‌পো বাস করেন, সেটা পুরনো বাড়ি। এখন এই জঙে শতাধিক ঘর। শুনে আশ্চর্য হবেন যে এই বিরাট বাড়িটি তৈরির আগে কোন নক্সা তৈরি করা হয় নি, আর কাঠের কোনখানে একটি পেরেকও ব্যবহার করা হয় নি। অথচ এই জঙের মধ্যে রাজার একটি দরবার ঘর আছে। সেখানে তিনি অতিথিদের সঙ্গে দেখা করেন। রাজার মন্ত্রীদেরও স্থান আছে এখানে। চংদুর মানে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন বসে উত্তর-পশ্চিম দিকের অঙ্গনের একটি বিরাট হলে। মূল অঙ্গনে হয় ডোম-চু নামে নাচের এক উৎসব।

স্বাতি বলল : হোয়াইট সাহেব কি এই সব কথাই লিখে গেছেন ?

না। এতো হাল আমলের কথা। হোয়াইট সাহেব লিখেছেন তাঁর আমলের কথা। তিনি দুটো বড় গেট দেখেছিলেন, একটা দক্ষিণ দিকে, আর একটা নদীর দিকে।

এখনও তো তাই দেখছি।

আর এই জঙের উত্তর ও পশ্চিম দিকটা দেখেছিলেন প্রশস্ত পরিখায় ঘেরা। অঙ্গনের দক্ষিণ পূর্বে ছিল ধর্মরাজার বাসস্থান এবং পশ্চিমে সামনের দিকে ছিলেন থিম্ফুর জংপেন। তা-ছাং বা সরকারী লামারা থাকতেন উত্তর দিকের ছোট অংশে। মাঝখানের দেওয়ালে এক সারি সাদা ছোর্তেন ছিল, তার ওপরে জোড়া ছাদ। ভিতরের অঙ্গনে উপাসনার জন্যে একটা বিরাট হল ঘর ছিল—এক এক দিকে একশো কুড়ি ফুট আর উঁচু পঞ্চাশ ফুট। আর দেওয়ালে ছিল চমৎকার ফ্রেস্কো পেন্টিং। পশ্চিম দিকে কয়েকটি মন্দির ছিল পাশাপাশি। তার মধ্যে একটি ছিল ভুটানী শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই মন্দিরে বুদ্ধের মূর্তি ছিল এক হাজার। হোয়াইট সাহেব ছশো মূর্তি গোনবার পরে বলেছিলেন যে মূর্তির সংখ্যা এক হাজারই হবে।

ততক্ষণে আমরা বিরাট লম্বা গোলাপের ক্ষেতের অনেকটা পেরিয়ে পূর্ব দিকের গেটে পৌঁছে গিয়েছিলুম ধীরে ধীরে হেঁটে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই দেখলুম যে এক বৃদ্ধা মাটিতে বসে মালা জপ করছেন একাগ্র চিত্তে। মালা তাঁর বাঁ হাতে, ডান হাতটি কোলের উপরে ন্যস্ত। স্বাতি চট করে তাঁর একটা ছবি তুলে নিল।

সে ফিরে এলে ভদ্রলোক বললেন : এখন দিন বলেই এঁকে এই ভাবে বসে থাকতে দেখলেন। সূর্যাস্তের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এখানকার কোন জঙে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার নেই।

একটুখানি এগিয়েই বললেন : তবে একটু নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছিল আপনাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বেলায়।

কী রকম ?

বলে স্বাতি তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন : রাজার অতিথি হিসেবে তাঁকে এই জঙে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। জেয় খেন্‌পো বিশেষ অনুমতি দিয়েছিলেন এই বলে যে কোন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে স্ত্রীলোক না ভাবলেও চলবে।

ভদ্রলোক আমাদের সরকারী দপ্তর না দেখিয়ে বিহার অংশটি দেখালেন এবং ধর্মের সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। বৌদ্ধ দর্শনে নাকি পৃথিবীর আকার গোল নয় এবং পৃথিবীর মধ্যস্থলে সুমেরু পর্বত। দেবরাজ ইন্দ্র এই পর্বতে বাস করেন এবং চারজন দিকপাল এই পর্বতটি রক্ষা করেন। এই ধারণার জন্য এই জঙের অঙ্গনের চারি ধার ঘিরে চারটি দেবতার মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। পূর্ব দিকে সাদা রঙের ইয়ুলখোরসুং, পশ্চিমে লাল রঙের চেন মিজাং, উত্তরে সোনালী রঙের নমথোসে এবং দক্ষিণ দিকে নীলরঙের ফাগচেপো। জঙের মন্দিরে স্থানীয় লামাদের অনেক মূর্তি আছে, তাঁরা নাকি বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন। বৈরোচানা নামের ধ্যানী বুদ্ধের সঙ্গে আছেন তাঁর শক্তি। বেদীর উপরে আছেন বুদ্ধ, গুরু পদ্মসম্ভব, প্রথম শবদুং রিমপোছে ও লামা করমাপার সুন্দর মূর্তি। লামা করমাপাই লাল টুপি সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন এবং তিনি দলাই লামার চেয়েও প্রাচীন। গুরু পদ্মসম্ভবের হাতে চক্র। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মে এই চক্রই সত্যের প্রতীক। উচির প্রবেশ পথও তান্ত্রিক চিহ্নে অলঙ্কৃত।

সব কিছু দেখতে হলে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরের তলায় উঠতে হয়। মইয়ের মতো খাড়া সিঁড়ি। উচ্চতাও অনেক। প্রথমে বারান্দা, তারপর উপাসনার ঘর। ভিতরে সোনার বুদ্ধ মূর্তি আছে পাথরের বেদীতে। উপরের তলায় যে সব ঘর আছে তাতে লামাদের বাস। কিন্তু কাঠের সিঁড়ির অবস্থা দেখে উপরে ওঠার সাহস আমাদের হল না। উপরে উঠলে দেওয়ালের ফ্রেস্কো ও সোনার বুদ্ধ মূর্তি দেখা যেত।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোক আমাদের চংদু বা ন্যাশনাল আসেম্বলি ভবন

দেখালেন। প্রাচীন জঙের সঙ্গে বেশ মানানসই হয়েছে এই নূতন ভবন।

ফেরার পথে ভদ্রলোক আমাদের আরও অনেক কথা বললেন। এই জং থেকে খানিকটা দূরে উপরে উঠলে দেচেন ফোদ্রং নামে একটি ছোট বিহার দেখা যাবে। পুরনো আমলে থিম্ফুর পেনলপের এটি গ্রীষ্মাবাস ছিল। এই বিহারটি এখনও ভাল অবস্থায় আছে এবং এই জঙ থেকেই একজন লামা সেখানে প্রতি দিন উপাসনার জন্য যান।

স্বাতি বলল: সেখানে কী দেখবার আছে?

প্রথম শবদুং নওয়াং নামগিয়েলের একটি মূর্তি। এই মূর্তিটি নাকি তাঁর রাজত্বকালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পুরনো পথ ধরেই আমরা ফিরে আসছিলুম। থিম্ফু নদীর ধারা দেখা গেল চোখের সামনে। আমাদের কৌতূহল লক্ষ্য করে তিনি বললেন: এই নদীর ধারে আরও অনেক কিছু দেখবার আছে।

বলুন।

বলে স্বাতি তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

ভদ্রলোক বললেন: খানিকটা দূরে একটা খোলা ময়দান দেখতে পাবেন। তার নাম চাঙ্গলি মিথান। লোকে বলবে, খেলার মাঠ। কিংবা বলবে, থিম্ফুর হেলিপ্যাড, হেলিকপ্টার নামে ঐ মাঠে। কিন্তু এরও একটা ইতিহাস আছে।

কী রকম?

এই মাঠের একটা যুদ্ধে ভুটানের ভবিষ্যৎ ও বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তংসা পেনলপের নেতৃত্বে ওয়াংচুকরা যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে। যুদ্ধ জয় করেই তাঁরা ভুটানের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছেন। ওয়াংচুকরা এখন বংশানুক্রমে রাজত্ব করছেন। দেশে আর ধর্মরাজা ও দেবরাজার শাসন নেই। ধর্ম রাজা হয়েছেন জেয় খেন্‌পো।

আমি আর একটা কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম: দলাই লামা তো তিব্বতে হলদে টুপির সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন। তিনি সেখান থেকে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। লাল টুপি সম্প্রদায়ের করমাপা লামা এখন কোথায়?

ভদ্রলোক বললেন: দলাই লামার মতো তাঁরও অবতার চলে আসছে। বর্তমান করমাপা লামা সিকিমে আছেন বলে শুনেছি।

সিকিমে আছেন শুনে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম। সিকিমের বৌদ্ধরা দলাই লামার ভক্ত বলেই জানি। তাই তিনি ভুটানে আসেন নি। ভুটানে সবাই করমাপা লামার ভক্ত। অথচ ভুটানে আশ্রয় না নিয়ে তিনি সিকিমে বাস করছেন কেন, তা জানবার প্রবল আগ্রহ হয়েছিল আমার। কিন্তু সে অবকাশ পেলুম না। রিনচেন দ্রুতপদে এসে উপস্থিত হল। আমার দিকে চেয়ে বলল: এক ভদ্রলোক আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছেন।

আমাদের?

হ্যাঁ। সাহেব আমাকে পাঠালেন আপনাদের ডেকে আনতে।

বললুম: চল।

২১

দেবদত্তবাবুর দপ্তরে এসে এক নতুন ভদ্রলোককে দেখলুম। তিনি উঠে দাঁড়িয়েই আমাদের নমস্কার করে বললেন : আমার নাম ইন্দু। নিরাপদ আপনাদের হোটেলে পৌঁছে দিতে বলেছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললুম : এবই জন্যে আপনি কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন !

ইন্দুবাবু বললেন : এরই জন্যে বললে মিথ্যে বলা হবে। আমি নিজের কাজেই এখানে এসেছিলাম। কিন্তু নিরাপদ আমার কাছে এই জন্যেই এসেছিল। মানে, সে জানে যে মাঝে মাঝেই আমাকে এখানে আসতে হয়। আমি না এলে সে অন্য ব্যবস্থা করত।

দেবদত্তবাবু বললেন : নিরাপদ যখন আপনাদের ভার নিয়েছে, তখন আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ইন্দুবাবু বললেন : আপনাদের জং দেখা হয়েছে তো, তাহলে চলুন। সময় মতোই পৌঁছতে পারবেন।

দেবদত্তবাবু বললেন : সন্ধ্যেবেলায আপনাদের পার্মিট পেয়ে যাবেন।

বলে তিনি আমাদের এগিয়ে দেবার জন্যে বেরিয়ে এলেন।

ইন্দুবাবু একখানা নতুন অ্যামবাসাডার গাড়িতে এসেছিলেন। আমাদেব দুজনকে ভিতরে তুলে দিয়ে নিজে বসলেন ড্রাইভারের পাশে। গাড়িতেই তাঁর সঙ্গে পরিচয হল। বাড়ি তাঁর বেহালায়, এখানে ব্যবসা আছে। বেহালায় তাঁর বাড়িতে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানালেন। তারপব স্বাতির কাঁধে ক্যামেরা দেখে বললেন : জঙের ছবি তুলেছেন ?

স্বাতি বলল : না তো !

ইস ! এর একটা ছবি তুললে হত ! আচ্ছা দাঁড়ান, একটা বুদ্ধি করছি।

বলেই ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন একটা বিশেষ জায়গায় যেতে।

সেখানে পৌঁছে মনে হল যে আমরা যেন নদীর পরপার থেকেই জং দেখছি। গাড়ি থেকে নেমে খানিকটা পথ আমাদের হেঁটে আসতে হয়েছিল। স্বাতি একটা সুবিধাজনক জায়গা থেকে ছবি তুলে ইন্দুবাবুকে বলল : অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এ জায়গায় না এলে এ রকম ভিউ পেতাম না।

ইন্দুবাবু কৃতার্থ হয়েছেন-এই ভাবে বললেন : দেখলেন তো, স্থানীয় লোক সঙ্গে থাকলে এইটেই সুবিধে। এ জায়গাটা আপনারা খুঁজেই পেতেন না।

আবার আমরা গাড়িতে উঠে যাত্রা করলুম। অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এলুম সদর রাস্তায়। তারপর সোজা চলে এলুম বাজারের শেষ প্রান্তে। কাল সন্ধ্যেবেলায় এই খানেই আমরা বাস থেকে নেমেছিলুম। ইন্দুবাবু আমাদের নামিয়ে দিয়ে বললেন : এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেই আপনাদের হোটেল। আমার আবার একটু তাড়া আছে।

পরে দেখা হবে।

বলে বিদায় নিলেন।

প্রসন্ন রৌদ্রে চারি দিক এখন ঝলমল করছে। আকাশে মেঘ নেই। সকালে যে খানিকটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল, তা এখন বোঝাও যাচ্ছে না। স্বাতি বলল : আমাদের তো কোন তাড়া নেই, বিকেলে কোথায় যাব তা ভেবেছ কি ? বিকেলের জন্যে একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে গেলে মন্দ হত না।

বললুম : সেমটোকা জং মাইল পাঁচেক দূরে। যদি যেতে চাও তো যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার জন্যে ট্যাক্সি ঠিক করে রাখার দরকার নেই।

কেন ?

অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—ট্যাক্সি ও জীপ। একটা না একটা পাওয়া যাবেই। এখন ব্যবস্থা করে গেলে ভাড়া বেশি দিতে হতে পারে।

স্বাতি বলল : তবে চল, হোটেল থেকে খেয়েই আসা যাক।

কিন্তু খেতে বসে স্বাতি বলল : সেমটোকা জং দেখতে যাবার আগে তোমার কাছে একটা বিষয়ে কিছু জেনে যাব।

কোন্ বিষয়ে ?

বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। আমার মনে হয় যে যাঁরা মুক্তির সন্ধানে গৃহত্যাগ করে ভিক্ষুর জীবন যাপন করছেন, তাঁরাই বৌদ্ধ। বুদ্ধ তো বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড অস্বীকার করেছিলেন, তাঁর মতে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। কিন্তু এখানে বোধহয় বুদ্ধকে ঈশ্বর ও লামাদের অবতার বলে মনে করা হচ্ছে।

বললুম : এটা বুঝতে হলে গোড়া থেকেই জানতে হবে।

স্বাতি বলল : খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করে বেরোবে তো, এই সময়টায় তুমি আজ বৌদ্ধ ধর্মের কথাই বুঝিয়ে বল।

এর পর আমি সংক্ষেপে বৌদ্ধ ধর্মের কথা বললুম। লুম্বিনীতে জাত গৌতম গয়ার নিকটে তপস্যা করে যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, সারনাথে এসে তিনি তা প্রচার করেন তাঁর জীবনের পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ বছর। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে মুক্তির পথের কথাই বলেছিলেন, কোন জাতির বা সমাজের উন্নতির কথা বলেন নি। তাঁর মতে এই জগৎ ও মানুষের জীবন দুঃখময়, জাগতিক বস্তু বা অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী বলে ক্লেশদায়ক, আর তার জন্মই এই দুঃখের কারণ। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, প্রিয় বিপ্রয়োগ, অপ্রিয় সম্প্রয়োগ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি ও পঞ্চ উপাদান বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বস্তু—জীব এই আট রকম দুঃখ ভোগ করে। এদের একটির অস্তিত্ব থাকলে অন্যটিও থাকে, একটি উৎপন্ন হলে অন্যটিও উৎপন্ন হয়।

একটু ভেবে বললুম : ইমস্মিং যতি ইদং হোতি, ইমস্‌সুপ্‌পাদ্য ইদং উপ্‌পজ্‌জতি।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : তুমি পালি-প্রাকৃতও পড়েছ নাকি ?

হেসে বললুম : না। পণ্ডিতরা এই সব কথা তাঁদের প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছেন। নিজে পণ্ডিতি দেখাবার জন্যে এই রকম কিছু কথা মুখস্থ করেছিলুম। ধম্মপদের কয়েকটি শ্লোকও মনে রেখেছি। সময় মতো ব্যবহার করে পণ্ডিতি দেখাই।

স্বাতি বলল : আমার কাছেও তুমি পণ্ডিতি দেখাও নাকি ?

বললুম : অনেকেই তো তাই করে।

স্বাতি বলল : তার পরে বল।

বললুম : বুদ্ধ বললেন যে দুঃখের এই কারণ নিরোধের একমাত্র উপায় হল নির্বাণ।

নির্বাণ মানে মৃত্যু নয়, নির্বাণ হল প্রবৃত্তির বিনাশে সমভাব ও শান্তির অবস্থা লাভ। এতে সাধকের পুনর্জন্ম হয় না, জন্ম না হলেই আর দুঃখ নেই। তাই নির্বাণ লাভই বৌদ্ধের সাধনা।

স্বাতি বলল : বুদ্ধ তো পরমাত্মা বা জীবাত্মার অস্তিত্ব মানতেন না, তাহলে পুনর্জন্ম মানতেন কেন ? আত্মা না থাকলে কার পুনর্জন্ম হয় ?

বললুম : এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না। তবে বুদ্ধ বলতেন, জীব পাঁচটি স্কন্দের সমষ্টি, তাদের সংমিশ্রণেই আত্মবোধের উৎপত্তি। তিনি পুনর্জন্ম ও কর্মের ওপরে খুবই গুরুত্ব দিতেন। বলতেন, এক জন্মের কর্ম তার অতীত ও ভবিষ্যৎ জন্মের সঙ্গে জড়িত। কর্ম তার গতি, তার বন্ধু, তার আশ্রয়।

তিনি নিজেও তো বার বার জন্মেছিলেন! জাতকে তার বিবরণ আছে।

তবে আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে নিজে কিছু লিখে রেখে যান নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা রাজগিরের সপ্তপর্ণী গুহায় সমবেত হয়ে তাঁর উপদেশ আবৃত্তি করেন। এরই নাম প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি। তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির পর অশোক বহির্ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় কণিষ্কের আমলে। অশোকের আমলেই বৌদ্ধ সংঘে আঠারোটি শাখা হয়েছিল। প্রাচীন বৌদ্ধাচার্যরাই বৌদ্ধ মতকে হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে ভাগ করেন। আদি থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মকে মহাযানীরা হীনযান বলেন। যান মানে পথ, যে পথ নির্বাণের দিকে নিয়ে যায়। হীনযান নাকি অপূর্ণ সত্য, মহাযানের পথই একমাত্র পথ। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে মহাযানে শাক্য মুনির ভূমিকা গৌণ। গুরুত্ব বেশি ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয়, অমিতাভ, অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, বৈরোচন, বজ্রপানি প্রভৃতির। মহাযানে বুদ্ধ ঈশ্বর, শাক্য মুনি তাঁর অবতার। মহাযানে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পূজা আছে। নাগার্জুন,শান্তরক্ষিত, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি মহাযানের প্রধান আচার্য।

আহার শেষ করে আমরা নিজেদের ঘরে চলে এসেছিলুম। স্বাতি বলল : একটু গড়িয়ে নাও, আরাম পাবে।

বললুম : তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মে তো এখনও পৌঁছতে পারি নি। এখন পর্যন্ত তান্ত্রিক মতটাই বৌদ্ধ ধর্মে ঢোকে নি।

স্বাতি বিছানার এক ধারে আরাম করে বসে বলল : শুয়ে শুয়েই সে কথা বল।

আমি তার আদেশ পালন করে বললুম : আচার্যদের ফেলে আমাদের অষ্টম-নবম শতকে যেতে হবে। এই সময় থেকেই বৌদ্ধ ধর্মে মন্ত্র মুদ্রা মণ্ডল ও অনেক তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম ঢুকে পড়ে। ব্যাপারটা এত দূর গড়ায় যে বুদ্ধের বাণী বদলাতে বদলাতে বিচিত্র আকার ধারণ করে। বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ কিছু নেই দেখে এই যানের এক নতুন নামকরণ হয় বজ্রযান। এও আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের কারও নাম সহজযান, কারও নাম কালচক্রযান।

স্বাতি বলল : এত সব যানের কথা মনে রাখতে পারব না।

বললুম : তার দরকার নেই। শান্তরক্ষিত আর পদ্মসম্ভবের নাম মনে আছে তো ? এই তো সেদিন তাঁদের কথা বললে, এঁরাই তিব্বতে এসে লামা ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

তাহলেই বুঝতে পারছ যে এঁরা যখন তিব্বতে এসেছিলেন, তখন মহাযানে তন্ত্রমত বেশ জোরালো ভাবেই ঢুকে পড়েছে। বুদ্ধের বাণীর চেয়ে তন্ত্রের ক্রিয়াকর্মই বড় হয়ে উঠেছে। তার ওপর পদ্মসম্ভব তিব্বতের মানুষকে দেখলেন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।

ভূত-প্রেতে তাদের অগাধ বিশ্বাস। তাই এদের জন্যে এক অভিনব ধর্ম প্রচার করলেন। তাতে ভূত-প্রেতও রইল, আবার বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বরও আছেন।

স্বাতি বলল : ভূত-প্রেত না থাকলে তারা বুদ্ধকে মানবে কেন!

ঠিক বলেছ। আর লামারা সংখ্যায় বাড়লে সম্প্রদায়ই বা বাড়বে না কেন!

স্বাতি বলল : সব সম্প্রদায়ের কথা জানতে চাই নে। শুধু লাল টুপি আর হলদে টুপির কথা বল।

বললুম : লাল টুপির সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়, তার কারণ একটাই। এই লালটুপির প্রধান হলেন করমাপা লামা। তাঁর সম্বন্ধে কোন বইয়ে কিছু খুঁজে পাই নি। অথচ হলদে টুপির দুই প্রধান দলাই লামা ও পাঞ্চেন লামার নাম আমাদের ভারতকোষেও আছে।

স্বাতি বলল : যা জানো, তাই বল।

বললুম : গুরু পদ্মসম্ভবের কথা মনে আছে তো! অষ্টম শতকে তিনি তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে সেই দেশে গিয়ে লামাধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তিব্বতে এখন তিনি বুদ্ধের সমপর্যায়ের মানুষ। এঁর পরেই নাম করতে হয় অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের। বিশ্বাস করা হয় যে তিনি বিক্রমপুরের রাজা কল্যাণশ্রীর পুত্র।

তার মানে বাঙালী!

এই জন্যেই কথাটা আমরা মেনে নিয়েছি। তিনি ছিলেন একাদশ শতাব্দীর মানুষ। প্রথমে মায়ের কাছে শিক্ষা পেয়ে তিনি ভারতের নানা স্থানে ও পরে সিংহলে ও সুবর্ণ দ্বীপে অধ্যয়ন করে বিক্রমশীলায় একজন আচার্য ও একশো আট মন্দিরের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তিব্বতের রাজা জ্ঞানপ্রভ তাঁকে আমন্ত্রণ করে তিব্বতে নিয়ে যান ১০৪০ খ্রীস্টাব্দে। তাঁরই চেষ্টায় সে দেশে আদিম ধর্মের জায়গায় বৌদ্ধ আচার গৃহীত হয়। তিনি যে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন, তার নাম হয়েছিল ক-দম্। পরে তাঁর শিষ্যদের সময়ে এরই নাম হয়েছিল গে-লুগ পা। দলাই লামা এই সম্প্রদায়েরই প্রধান। হলদে টুপি তাঁরই সম্প্রদায়ের।

স্বাতি বলল : অতীশ নিশ্চয়ই বুদ্ধ হলেন!

বললুম : না, তিব্বতে তিনি বুদ্ধের অবতার। লাসার নিকটে তাঁর সমাধি একটি পবিত্র তীর্থ।

এইবারে দলাই লামা ও পাঞ্চেন লামার সম্বন্ধের কথা বল।

বললুম : দলাই শব্দটি নাকি মঙ্গোলীয় ভাষার তা-লই শব্দ, তার মানে সাগর। অনেকে দলাই লামাকে বলেন তালে লামা। লা-মা শব্দেরও একটা মানে আছে, তিব্বতী ভাষায় এর অর্থ গুরু। অর্থাৎ দলাই লামা হলেন সাগরের মতো বিরাট ধর্ম গুরু। বুঝতেই পারছ, এটা তাঁর নাম নয়, এটা উপাধি। এই উপাধি দিয়েছিলেন মোঙ্গল সম্রাট আলতাই খান। বোধহয় ষোড়শ শতকে কুবলাই খানের মৃত্যুর পরে তিব্বতের ওপরে অধিকার প্রতিষ্ঠার আশায় গেলুগ পা সম্প্রদায়ের এক প্রধান লামাকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছিল। এঁরা বংশানুক্রমে লামা হন না, একজনের মৃত্যুর পরে মৃত লামার অবতারকে খুঁজে বার করা হয়। পরের শতাব্দী থেকে এঁরাই তিব্বতে রাজত্ব করতেন।

আর পাঞ্চেন লামা?

তিব্বতে নাকি পাঞ্চেনকে পেনছেন বলা হয়। চেন্‌পো শব্দের মানে মহৎ। সংস্কৃত পণ্ডিত আর তিব্বতী চেনপো এই দুটি শব্দ মিলে হয়েছে পেনছেন। ইনিও হলদে টুপি

সম্প্রদায়ের এবং দলাই লামার পরেই তাঁর স্থান। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তিনি দলাই লামার উপদেষ্টা। দলাই লামার রাজধানী লাসা এবং পাঞ্চেন লামা থাকেন শিগাচেয়। তাশি লুমপো মঠে থাকতেন বলে তিনি তাশি লামা নামেই এ দিকে পরিচিত।

স্বাতি বলল : এই বারে করমাপা লামা সম্বন্ধে কিছু বললেই সমস্ত ব্যাপারটা আমি ধারণা করতে পারব।

বললুম : এখন যিনি করমাপা লামা, তিনি আদি গুরুর অবতার। এই আদি গুরুর সম্বন্ধে আমি কোথাও কিছু পড়ি নি। কখন্ কোন্ অবস্থায় তিনি লাল টুপি সম্প্রদায় গড়েছিলেন তা জানি না। তবে একটা মজার কথা পড়েছিলুম নরি রুস্তমজীর বই এন্ চ্যান্টেড ফ্রন্টিয়ার্স-এ। দলাই লামার মতো তিনিও তিব্বত থেকে পালিয়ে এসেছেন। দলাই লামা তো হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছেন, ইনি আছেন সিকিমে। অথচ সিকিমে হল্‌দে টুপিব প্রতিপত্তিই বেশি।

আশ্চর্যের কথা!

নরি রুস্তমজী এরই উত্তর দিয়েছেন। করমাপা লামা হলেন কর্ম কাগিয়ুপা সম্প্রদায়ের প্রধান। সিকিমে এঁর ভক্তের সংখ্যা কম হলেও ভক্তি পান অনেক বেশি! সিকিমের রাজধর্ম তো তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্ম, সেখানে সব সম্প্রদায়েরই মানুষ আছে। কর্ম কাগিয়ুপার আগের সম্প্রদায়গুলির ভক্তই বেশি, এমন কি হলদে টুপির ভক্তও অনেক। কিন্তু ভুটানে শুধুই লাল টুপি। তাই দলাই লামা একবার সিকিম হয়ে আব দ্বিতীয় বার অরুণাচল প্রদেশের মধ্য দিয়ে ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু সিকিমে সব সম্প্রদায়ের লোক আছে বলে তিনি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর করমাপা লামা এসেছিলেন ভুটানে, কিন্তু সেখানে সবাই তাঁর ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সিকিমে আশ্রয় নিতে হয়েছে।

কেন?

রুস্তমজী লিখেছেন, ভুটানের রাজারা অনেক কষ্টে ধর্মরাজ আর দেবরাজদের হঠিয়ে সিংহাসন লাভ করেছিলেন। তখনকার রাজা ছিলেন প্রগতিশীল, দেশের উন্নতি ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি ভয় পেলেন যে করমাপা লামার মতো একজন শ্রদ্ধার পাত্র দেশে থাকলে দেশের রাজনীতিতে ধর্ম আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে তিব্বতের মতো। রাজা বোধহয় ভয় পেয়েছিলেন যে ইচ্ছে করলে করমাপা লামা ভুটানের দলাই লামা হয়ে বসতে পারেন। তাই তাঁকে আশ্রয় দিতে চান নি।

তারপর?

সিকিম তখন স্বাধীন দেশ। রাজা ভাবলেন, তাঁর দেশে করমাপা লামার অনেক একনিষ্ঠ ভক্ত আছে। তাঁকে আশ্রয় দিলে দেশের কোন ক্ষতি হবার ভয় নেই। ধার্মিক রাজা তাঁর রাজধানী গ্যাংটকে ইনস্টিটিউট অফ টিবেটোলজি স্থাপন করেছিলেন। রাজধানীর অদূরে রুমটেক গোম্পায় তিনি করমাপা লামাকে জমি ও নানা সুবিধা দিয়ে থাকতে দিলেন।

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করল : পাঞ্চেন লামা এখন কোথায়?

হেসে বললুম : বিপদে ফেললে।

কেন?

ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। মানে রাজনীতির ব্যাপার। এতে নিজের কোন আগ্রহ নেই বলে তাঁকে নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামাই নি।

স্বাতি বলল : এই সব কথা বলে ব্যাপারটা তুমি রহস্যজনক করে তুলছ।

একটু রহস্যজনক বৈকি। তুমি তো জানো, তিব্বত এখন চীনের অধীন, দলাই লামার বদলে চীন এই অঞ্চল শাসন করছে। বিবাদ যখন চলছিল তখন পাঞ্চেন লামা নাকি চীনের সঙ্গেই সহযোগিতা করেছিলেন, আর দলাই লামা পালিয়ে এসেছিলেন ভারতে।

স্বাতি বলল : আমিও এ কথা শুনেছি।

তাহলে বুঝতেই পারছ যে পাঞ্চেন লামার দেশ ছাড়বার কোন দায় নেই। নতুন ব্যবস্থায় তিনি কোথায় কেমন আছেন, তা জানবার কোন চেষ্টা করি নি।

স্বাতি আকাশের দিকে চেয়ে চমকে উঠল। বলল : দেখ কাণ্ড!

আমি জানালার কাচের ভেতর দিয়ে দেখলুম ঘন মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ। স্বাতি উঠে জানালার ধারে গেল, নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলল : চারিদিক থমথম করছে। এ বোধহয় বৃষ্টির পূর্ব লক্ষণ!

আমরা কি তাহলে বেরোব না?

স্বাতি বলল : একটু অপেক্ষা করব।

বৃষ্টি নামলে অপেক্ষা করতেই হবে। কাল আমরা পারো যাব, পরশু পুনাখায়। তার পরের দিন ফুনছোলিঙে ফিরতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

২২

কিছুক্ষণ পরেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। অসময়ে বৃষ্টি। এই বৃষ্টির কথা কেউ ভাবতেও পারে না। মহাকাশে উপগ্রহ রাখা হয়েছে এই বৃষ্টির খবর দেবার জন্যে। দিচ্ছে। কিন্তু সব খবর মিলছে না। মিলবে না। আকাশের রোদ আর বৃষ্টি চিরকাল আমাদের সঙ্গে পরিহাস করেছে, করবেও চিরকাল। এই তার খেলা।এই খেলা খেলেই তারা আনন্দ পায়।

স্বাতি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিপাত দেখছিল। একসময়ে বলল : বৃষ্টির চেয়ে শব্দ হচ্ছে বেশি। বৃষ্টি পড়ার শব্দ। কিন্তু কতক্ষণে থামবে তা বোঝা যাচ্ছে না।

বললুম : নিজের মর্জিমতো বৃষ্টি থামবে। কারও সুবিধা-অসুবিধার কথা ভেবে নয়।

ঠিক কথা।

বলে স্বাতি জানালার কাছ থেকে ফিরে এসে আমার গায়ে একখানা কম্বল চাপা দিয়ে বলল : একটু ঘুমিয়ে নাও।

বললুম : দুপুরে ঘুমোবার তো অভ্যেস নেই, ঘুম আসবে না।

কিন্তু স্বাতি আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে বিছানার অন্য ধারে নিজেও শুয়ে পড়ে আর একখানা কম্বল টেনে নিল।

কেন জানি না আমার মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের গানের একটি কলি—

এমন দিনে তারে বলা যায়।

গুণ গুণ করে এই কলিটি গাইবার চেষ্টা করতেই স্বাতি হেসে উঠল। আমি লজ্জিত ভাবে বললুম : হাসলে যে! সুর কি ঠিক হয় নি?

স্বাতি বলল : হঠাৎ তোমার গান গাইবার শখ হল কেন?

এর উত্তর বোধহয় তুমি নিজেই দিতে পারবে।

না। দরকার নেই উত্তরের।

আমি তার দিকে পাশ ফিরে বললুম : আমার একটা প্রশ্ন আছে।

বল।

তোমার সঙ্গে আমার কত দিনের পরিচয়?

স্বাতিও আমার দিকে ফিরে বলল : একটু ভেবে বলছি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

কবে বলতো?

স্বাতি বলল : সাত বছর, আটও হতে পারে। কলকাতায় এক কন্‌ভোকেশন উৎসবে তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম। প্রথম দিকেই তুমি এম-এর ডিগ্রি নিয়েছিলে।

তুমি গিয়েছিলে কেন?

আমি তখন বি-এ পড়ি কিনা, মজা দেখতে গিয়েছিলাম।

বললুম : তারপর?

স্বাতি একটু ভেবে বলল : তারপর তোমাকে দেখেছিলাম আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে। মুখ দেখে মনে হয়েছিল, তুমি খুব অপমানিত বোধ করেছিলে।

তুমি কোথা থেকে দেখেছিলে ?

দোতলার ব্যালকনি থেকে। বোধহয় কোন শব্দ পেয়ে আমি বাইরে এসেছিলাম। নীচের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম তোমাকে। তুমি বাবার নীচের বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলে।

তারপর ?

স্বাতি বলল : বাবার কাছে আমি তোমার পরিচয় জানতে চেয়েছিলাম।

কী উত্তর দিয়েছিলেন তিনি ?

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে গেল। সেদিন তিনি আমাকে চিনতে পারেন নি। না পারবারই কথা। মাকেই ভাল করে চিনতেন না। নিজের বোনকেই লোকে আজকাল ভুলে যাচ্ছে, তায় পাতানো বোন। আর গরিবকে চেনাও তো বিপদের কথা। চাই ছাড়া তো অন্য রব নেই এই পোড়া দেশে। আমি সংক্ষেপে নিজের পরিচয় তাঁকে দিয়েছিলুম, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিতেই তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন। সেদিন পথে নেমে নিজেকে আমি হাল্কা বোধ করেছিলুম। সংসারে আত্মীয় বলতে আর আমার কেউ রইল না, কারও কাছে আর জবাবদিহি করতে হবে না নিজের জয়পরাজয়ের।

আমাকে নীরব দেখে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : কী ভাবছ ?

বললুম : তুমি সেদিন ভুল দেখেছিলে। তিনি আমাকে অপমান করেন নি। কোন অপরিচিত বেকারকে চিনতে না পারাকে অপমান করা বলে না।

স্বাতি হেসে বলল : এই 'অপরিচিত বেকার' শব্দ দুটি ব্যবহার করেই তুমি বুঝিয়ে দিচ্ছ যে সেদিন তোমার আত্মাভিমানে আঘাত লেগেছিল। সেদিনই তুমি তোমার বেদনা দিয়ে আমাকে বুঝতে দিয়েছিলে যে মনে মনে এমন একটা সঙ্কল্প করেছ যে এই অপমানেই তুমি সবার সমান হবে, কিংবা সবার চেয়ে বড়।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : এ তোমার কল্পনা !

না, কল্পনা নয়। তোমাকে চিনতে আমি একটুও ভুল করি নি। পরে তোমার স্পর্শকাতর মনেরও পরিচয় পেয়েছিলাম।

কখন ?

দক্ষিণ ভারতে যাবার জন্যে আমরা ম্যাড্রাস মেল ধরতে এসেছিলাম হাওড়া স্টেশনে। আমাদের সঙ্গের লোক রামখেলাওনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বাবা তাঁকে খুঁজছিলেন, আর আমি দাঁড়িয়েছিলাম দরজার হাতল ধরে। ভিড়ের মধ্যে তোমাকে দেখতে পেয়েই বাবা তোমার কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলেছিলেন, গোপাল কোথায় যাচ্ছ ? তুমি চমকে উঠে তাঁকে দেখেই খুশী হয়েছিলে, তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছিলে, বাড়ি ফিরছি।

বললুম : হ্যাঁ, অত ভিড়ের মধ্যেও তিনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন বলে খুব আনন্দ হয়েছিল সেদিন। তাই তোমাদেব বিপদ আমার নিজেরই বিপদ বলে মনে হয়েছিল।

মা তোমাকে বলেছিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পার না বাবা ? আর বাবা তোমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, তুমি রাজী হয়ে যাও গোপাল, তোমার

সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি রাজী হতে পারছিলে না।

কিন্তু সেদিন আমি ছিলুম জাত বাউণ্ডুলে। কাজের দিনে অফিস পালাই। আর ছুটির দিনে বাড়ি ফিরি নে। বাইরের আকাশ আমাকে টানে। সেই টানে ঘরে আমার মন বসে না। পরদিন থেকেই আমার অফিসের ছুটি, আর ঘরেও এমন কেউ নেই যার অনুমতি নেবার প্রয়োজন ছিল। তবু—

তবু ইতস্তত করছিলে।

বড় অসহায় মনে হয়েছিল তোমার বাবাকে, আর জানালা দিয়ে তোমার মায়ের চোখও দেখেছিলুম বেদনায় ছলছল করছে। আর—

তুমি আমার মুখের দিকেও চেয়েছিলে।

তোমার চোখে কী দেখেছিলুম মনে নেই, কিন্তু আমার চোখে সেদিন রঙ লেগেছিল। তোমার বাবাকে দরজা দিয়ে ঠেলে তুলে দিয়ে চল্‌তি ট্রেনে আমি উঠে পড়েছিলুম।

স্বাতি বলল: গাড়িতে উঠে মাকে তুমি প্রণাম করতেই তিনি প্রায় কেঁদে বলেছিলেন, দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাকো বাবা। তারপরেই বলেছিলেন, তোমার বোন স্বাতিকে বুঝি তুমি আগে দেখ নি গোপাল?

হেসে বললুম: তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, মানে প্রেমে পড়তে বারণ করেছিলেন।

স্বাতিও হেসে বলল: বাবা কী বলেছিলেন মনে আছে?

আছে। তিনি গম্ভীর স্বরে তোমাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, বেশি লাই দিও না এদের। খরচা করে নিয়ে যাচ্ছি, সেই যথেষ্ট।

স্বাতি উঠে বসে বলল: তুমি শুনেছিলে এই কথা?

শুনেছি বৈকি। আমার হাতের খবরের কাগজখানা তোমাদের গাড়িতে ফেলে রেখে আমি খড়্গপুরে নেমে পড়েছিলুম। সেখানা আনবার জন্যে ফিরে গিয়ে এই কথা শুনেই ফিরে এসেছিলুম।

তুমি বোধহয় আগেই কিছু অনুমান করেছিলে। তাই মা যখন তোমাকে একটা বালিশ আর চাদর দিয়েছিলেন, তুমি তা দরকার হবে না বলে নাও নি।

বললুম: সেদিনের থার্ড ক্লাসেও বিছানা বিছিয়ে শোবার জায়গা হত না।

স্বাতি বলল: আমি অন্য কথা ভেবেছিলাম।

কী কথা?

বাবা যখন তোমার হাতে থার্ড ক্লাসের টিকিট দিতে সঙ্কোচ করছিলেন তখন তুমি বলেছিলে, মহাত্মাজী যে গাড়িতে চড়ে তাঁর জীবন কাটিয়ে গেলেন সে গাড়িতে আমার কোন কষ্ট হবে না।

বললুম: ঠিক কথাই তো।

বাবাও তাই বলেছিলেন, সে তোমার খদ্দরের বহর দেখেই বুঝেছি। কিন্তু সঙ্কোচ করেছিলেন থার্ড ক্লাসের সেই হলদে টিকিটের ওপরে সেকালের নিয়মে সার্ভেণ্টের আদ্যক্ষর একটা 'এস' লেখা ছিল বলে। আর তোমাকে সেই অক্ষরটা দেখাতেই তুমি আঘাত করেছিলে তাঁকে, ও দাগ তো আমাদের সবার পিঠে মামাবাবু। কেউ পয়সার জন্যে গোলামি করে, আর কেউ পয়সা দিয়ে গোলামি করে স্বভাবের দোষে।

আমি লজ্জিত ভাবে বললুম: কিন্তু তোমার বাবাকে লক্ষ্য করে আমি এ কথা বলি নি। আমি তাঁর কতটুকু জানতুম!

কিন্তু তিনি এটা তোমার রসিকতা মনে করেন নি, তোমার মনের কথা ভেবে অনেকদিন তোমাকে অহঙ্কারী ভেবেছিলেন।

এইজন্যেই বোধহয় বলেছিলেন, বেশি লাই দিও না এদের।

স্বাতি বলল : হতে পারে। এটা তাঁর রাগের কথা, মনের কথা নয়।

বললুম : জানি। পরে তাঁর কাছেই আমি বেশি প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, সাহসও পেতুম তাঁরই কাছে।

স্বাতি সংক্ষেপে বলল : জানি।

সে আর শুয়ে পড়ে নি, বসে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। বললুম : এ কত দিন আগের কথা মনে আছে?

পাঁচ-ছ বছরের বেশি পুরনো নয়।

মাত্র!

কেন, আমরা কি বুড়ো হয়ে গেছি?

বললুম : অনেক দিনের পুরনো কথা বলে মনে হচ্ছে।

তাতো হবেই। এই ক বছরে যে আমাদের অনেক বেড়ানো হল। গোটা দেশটাই দেখে ফেললাম আমরা।

আমার মন তখন অতীতে চলে গিয়েছিল। মনে পড়ছিল স্বাতির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপের কথা। ওয়ালটেয়ারের সেই সন্ধ্যায় আমার মন টেনেছিল দুরন্ত সমুদ্র। তার আগে আমি সমুদ্র দেখি নি। খানিকক্ষণ আগে আমরা যে সমুদ্র দেখে ফিরেছিলুম, তাকে ঠিক দেখা বলে না। আমার ধারণা যে সমুদ্র দেখতে হলে সারাদিন বসে থাকতে হয় বালির ওপরে। শেষ রাত থেকে শুরু করে অনেক রাত অবধি। একটু একটু করে অন্ধকার ফিকে হবে, পুব আকাশে আলো ফুটবে একটু একটু করে। চাঁদ ডুববে, তারা নিববে। সূর্য উঠবে লাল থালার মতো। সমুদ্রের কালো জল নীল হবে, আকাশ আর জলে কোন প্রভেদ থাকবে না। তারপর রুপোলি রোদে ঝিকমিক করে উঠবে সমুদ্রের বুক। তখন সাদা মনে হবে জলের রঙ। তরঙ্গের ভাঁজে ভাঁজে সবুজের আভা দেখতে পাওয়া যাবে। রাতের সমুদ্র নিশ্চয়ই অন্য রকম। রাক্ষসীর মতো ভীষণ, না মোহিনীর মতো মায়াবী তা জানি নে। অন্ধকারে কি তার রূপ দেখতে পাওয়া যাবে না? আমি তাই সবার অনুমতি নিয়ে সমুদ্রের ধারে চলেছিলুম। হঠাৎ একখানা রিক্‌শা আমার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়াল। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে স্বাতি নেমে পড়ল সেই রিক্‌শা থেকে। তারপর তাকে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বলল, চলুন।

হঠাৎ তার কথা শুনে আমি চমকে উঠলুম। স্বাতি বলল : কী ভাবছ?

বললুম : তোমার কথা।

মানে?

হাওড়া থেকে যাত্রা করে আমরা ওয়ালটেয়ারে এসে নেমেছিলুম। তুমি নিজে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলে—ট্রেনে নয়, হোটেলে নয়, সমুদ্রের ধারে একা। সন্ধ্যেবেলায় আমি সমুদ্রের ধারে যাচ্ছি শুনেও তুমি এক সঙ্গে বেরোও নি, পরে তুমি একা বেরিয়ে আমার কাছে এসে রিক্‌শা থেকে নেমেছিলে।

স্বাতি সকৌতুকে বলল : কাজ নিয়ে বেরিয়েছিলাম যে।

বললুম : হ্যাঁ, সেই জন্যেই একেবারে নির্বিকার ভাব, যেন একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমি আশ্চর্য হয়েছি দেখে বলেছিলে, আপনাদের জন্যে আমার দুঃখ হয়।

পুরনো যুগটাকে এখনও আঁকড়ে থাকতে চাইছেন। মেয়েরা কি এখনও আপনাদের কৃপার পাত্র!

আমি বলেছিলুম, কিছুমাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথ তো প্রাচীন কবি, কিন্তু আধুনিকাদের কথা তিনি জানতেন। তাই বলেছিলেন—

শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল
পথের মাঝেই করেছিল ফেল,
তবু তুমি গাড়ি ধরেছ দৌড়ে—
হেন বীর নারী আছে কি গৌড়ে!
নারী প্রগতির মহাদিনে আজি
নারী পদগতি জিনিল এ বাজি।

স্বাতি বলল: আমার উত্তর বোধহয় ভুলে গেছ।

না। এত ভাল লেগেছিল তোমার উত্তর যে তা কোন দিনই ভুলব না। তুমি বাধা দিয়ে বলেছিলে, আধুনিকাদের উত্তর পেয়ে কবি কী বলেছিলেন তা বুঝি ভুলে গেছ? বলে সুর করে বলেছিলে—

কবি গিরি ফলাবার উৎসাহ বন্যায়
আধুনিকাদের 'পরে করিয়াছি অন্যায়।

স্বাতি বলল: হ্যাঁ, তুমি চেঁচিয়ে উঠেছিলে চমৎকার বলে।

আর তুমি অপরিমিত খুশী হয়ে হেসে বলেছিলে, একটা কথা বলব গোপালদা? আজ কম করেও হাজার আটবার 'আপনি' বলেছি তোমাকে। পবকে এমন আপন এতদিন বলি নি।

আমিও হেসে তোমাকে জবাব দিয়েছিলুম, দেবতাকেও লোকে আপনি বলে না। ও তো মান নয়, ও দূরে ঠেলে রাখার ফন্দি। আমারও তা সইবে না। আর আমার উত্তর শুনে তুমি আবার হেসেছিলে, হেসে উঠেছিল দুরন্ত সমুদ্র। পথের ধারে পাথরের ওপর একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে কলকল করে উঠেছিল। তখন আমরা সমুদ্রের ধারে পৌঁছে গিয়েছিলুম।

তারপর?

সমুদ্রের ধারে ধারে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে ফেরার পথে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, বসবে কোথাও? তুমি বলেছিলে, না সময়ের কথা তাহলে আমরা ভুলে যাব। আমি এই কথা মেনে নিতেই তুমি আপত্তি করে বলেছিলে, ফিরলেও তো আমাদের চলবে না! কাজ নিয়ে বেরিয়েছি যে!

স্বাতি বলল: সত্যিই তো আমি কাজ নিয়ে বেরিয়েছিলাম। স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে রিজার্ভেসনের জন্যে।

বললুম: সে তো তোমার ছল। তুমি একটা রিক্শায় উঠে আমাকে পাশে বসতে দিয়েছিলে। তারপর টেলিফোন করবে বলে হোটেলেই ফিরে এসেছিলে। আর মিথ্যে কথা বলেছিলে নিজের বাবা মাকে।

স্বাতি বলল: সে তোমার জন্যে!

কিন্তু আমার কাছে কত মিথ্যে বলেছ তা জানি নে তো!

মিথ্যে বলিনি, তবে সত্য গোপন করেছি অনেক।

কেন?

মনের সব কথা কি মুখে বলা যায়!

বলে সে উঠে জানালার ধারে গেল। খানিকক্ষণ চেয়ে রইল বাইরের দিকে। তারপর ফিরে এসে বসে বলল : থেকে থেকে বৃষ্টি পড়ছে ছিচ্‌কাঁদুনি কান্নার মতো।

আমি বললুম : সব কথা না হোক, এক আধটা সত্যি কথাও যদি কখনও বলতে, তাহলে আমার খুব সুবিধে হত।

স্বাতি বলল : বুদ্ধি মোটা হলে নানা রকমের অসুবিধা হয়। আগে এ কথা বুঝতে পারলে আমারও ভাল হত।

এই যাত্রাতেই তিরুপতি থেকে ম্যাড্রাসে যাবার কথা আমার মনে পড়ে গেল। রেনিগুন্টা স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়াতেই স্বাতি সমস্ত লটবহর একটা আপার ক্লাসে তুলে দিয়ে তার বাবা-মাকেও ঠেলে তুলে দিল। তারপর নিজের ব্যাগ থেকে দুখানা টিকিট বার করে তার বাবার হাতে দিয়ে বলল তোমাদের টিকিট দুখানা রাখো বাবা, আমরা থার্ড ক্লাসে উঠছি।

তাঁরা দুচোখ বিস্ফারিত করে স্বাতির দিকে চেয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন দেখে সে বলেছিল, গোপালদাকে আজ জব্দ করব। কী করে খবর সংগ্রহ করে তাই দেখব।

আমি নিজেও আশ্চর্য হয়েছিলুম তার কথা শুনে। কিন্তু সে বলেছিল, তাড়াতাড়ি চলে এসো গোপালদা, গাড়ি ছেড়ে দেবে।

বলে পাশের একটা থার্ড ক্লাসে উঠে পড়েছিল। তাকে অনুসরণ করে আমিও সেই গাড়িতে উঠেছিলুম।

সেদিনই কি আমাদের নূতন যাত্রা শুরু হয়েছিল ? জানি নে। স্বাতি তো সে কথা আমাকে জানতে দেয় নি।

আমাদের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। সেই দরজায় কেউ টোকা দিতেই স্বাতি উঠে গিয়ে দরজা খুলল। হোটেলের বেয়ারা এসেছিল, জিজ্ঞাসা করল : বিকেলের চা কি ঘরেই দেব, না নীচে নামবেন ?

স্বাতি বলল : ঘরেই দাও। বৃষ্টি না থামলে আমরা নীচে নামব না।

বেয়ারা মাথা নেড়ে চলে গেল। আর স্বাতি ফিরে এসে বলল : সময় না পেলে সেমটোকা জং আমরা দেখব না, কী বল ?

বললুম : তোমার মর্জি।

স্বাতি হেসে বলল : হঠাৎ খুব ভাল ছেলে হয়ে গেলে !

বললুম : আমি চিরকালই এই রকম। এতদিন সবই তোমার মর্জি মাফিক হয়েছে, আজ আপত্তি করব কেন !

স্বাতি বলল : তোমারও মর্জি আছে, কিন্তু তা প্রতিষ্ঠা করবার মতো উদ্যম নেই। এখনও তুমি কারও হাত ধরে চলতে চাও, তাই না ?

আমি এ কথার প্রতিবাদ করলুম না।

২৩

হোটেলের বেয়ারা যখন চা-এর ট্রে এনে টেবলের উপরে রাখল, তখনও ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে বৃষ্টি কখন থেমেছিল, আমরা তা লক্ষ্য করি নি। স্বাতি উঠে এসে চেয়ারে বসে বলল : নিজেদের পুরনো কথা অনেক ভেবেছ, এবারে ভুটানের কথা বল।

গরম চায়ের লোভে আমিও উঠে বসেছিলুম। বললুম : কী শুনতে চাও বল।

স্বাতি বলল : তোমাদের কুচবিহারের রাজার সম্বন্ধে ভুটানের কী একটা সম্বন্ধ ছিল বলে শুনেছি। কথাটা কি সত্যি ?

হেসে বললুম : সম্পর্কটা বৈবাহিক নয়, বিবাদের। উত্তরে যেমন তিব্বত, তেমনি দক্ষিণে কুচবিহার। এক সময়ে কুচবিহার ভুটান অধিকার করেছিল, পরে ভুটান কুচবিহারের ওপরে প্রভুত্বের চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজকে ডাকতে হয়েছে বিবাদ মেটাতে।

স্বাতি বলল : এমন সংক্ষেপে নয়, গোড়া থেকেই গুছিয়ে বল।

বঁলে এক পেয়ালা চা ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজের ব্যাগ থেকে নানা রকমের খাবার বার করল।

বললুম : ভুটানের যে ইতিহাস পড়েছি, তাতে কুচবিহারের কথা সামান্যই আছে এবং তাতে নামের ভুলও আছে। এই দুই দেশের সম্বন্ধ সঠিক ভাবে বুঝতে হলে কুচবিহারের ইতিহাসও জানতে হবে।

স্বাতি বলল : আমি তো সেই কথাই শুনতে চাইছি।

বললুম : তাহলে গোড়া থেকেই শুরু করি। কুচবিহার রাজবংশের কথা যোগিনীতন্ত্রে পাওয়া যায়। তার একটি শ্লোক তোমাকে শোনাচ্ছি।

ন ল বী প্র মকারান্তে বিশোর্বংশো বিনশ্যতি।
অত উর্দ্ধং মহাদেবি কুপুত্রঃ পালয়েন্মহীম্ ॥

স্বাতি বলল : এর মানে বুঝতে পারলাম না।

মহাদেবী কথাটা দেখেই বোধহয় বুঝতে পারছ যে স্বয়ং মহাদেব পার্বতীকে এই কথা বলছেন। ন ল বী প্র ও ম এই আদ্যক্ষর দিয়ে কয়েক জন রাজার পরেই বিশু বা বিশ্বসিংহের বংশ শেষ হয়ে যাবে। তারপর কুপুত্রেরা পৃথিবী শাসন করবে। এই ভবিষ্যৎ বাণীর কথা শুনে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে মহারাজা নরনারায়ণ. লক্ষ্মীনারায়ণ, বীর নারায়ণ প্রাণনারায়ণ ও মোদনারায়ণের পর কুপুত্রদের অন্তর্দ্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হবে।

তাই হয়েছিল কি ?

তাহলে ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়। ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে কুচবিহারের রাজকীয় অব্দ আরম্ভ হয়েছে এবং শুধু আসাম কাছাড় ও মণিপুর নয়, ভুটানেও এই

অব্দ প্রচলিত হয়েছিল। রাজা তখন বিশ্বসিংহ। কাজেই নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে কুচবিহার রাজ্যের বিস্তার ছিল এই সব দেশেও। এঁর পুত্র নরনারায়ণ যে তাঁর সেনাপতি নিজের ভাই শুক্লধ্বজ বা চিলা রায়ের সাহায্যে রাজ্য আরও বিস্তার করেন, তার প্রমাণ তাঁদের প্রচলিত নারায়ণী টাকা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও নানা স্থানে পাওয়া গেছে।

চা খেতে খেতে আমাদের কথা হচ্ছিল। আমি থামতেই স্বাতি বলল : তারপর!

বললুম : ভারতকোষে রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকরা বলেছেন, চতুর্থ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ পুত্র মহীনারায়ণকে নাজির দেও বা সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন।

স্বাতি বাধা দিয়ে বলল : চতুর্থ রাজা বলছ কেন, ইনি তো তৃতীয় রাজা!

বললুম : না। বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পবে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নরসিংহ রাজা হয়েছিলেন। তখন নরনারায়ণ ও চিলা রায় ছিলেন কাশীতে। খবর পেয়ে তাঁরা ছুটে আসেন এবং নরসিংহ পালিয়ে যান।

কেন?

বিশ্বসিংহের ছেলে ছিল আঠারো জন এবং সব ভাইরা নরনারায়ণকেই সমর্থন করেছিল। কেন তা বলতে পারব না। তবে একটা কথা মনে রেখো। বিশ্বসিংহের এক ভাই ছিল, তার নাম শিষ্য সিংহ। বিশ্বসিংহ তাঁকে রায়কত উপাধি দিয়ে বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুরে জমিদারী দিয়েছিলেন এবং তাঁকেই রাজ্যের নাজির দেও বা সেনাপতি করেছিলেন। কুচবিহারের ইতিহাসে নাজির দেওদের একটা বড় ভূমিকা ছিল।

তারপর বল।

বললুম : অন্তর্বিবাদের সূত্রপাত হয় লক্ষ্মীনারায়ণের আমলেই। চিলা রায়ের পুত্র রঘুদেব নারায়ণ কামরূপের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করলে যুদ্ধ বাধে। রঘুদেব বারো ভুঁইয়ার ঈশা খাঁর সাহায্য নিলে লক্ষ্মীনারায়ণ বাঙলার মোগল সুবেদার মানসিংহের সাহায্য নেন। কিন্তু তাতেও কামরূপ রক্ষা হয় নি এবং মানসিংহ রাজার বোন প্রভাবতী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। পরে অবশ্য কামরূপ জয় করা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু মোগল তা অধিকার করে। পরের রাজা বীরনারায়ণ কামরূপ উদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন নি, করেছিলেন তাঁর পরের রাজা প্রাণ নারায়ণ। মীর জুমলার সময়ে তিনি মোগলদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছিলেন। কখনও জয় হয়েছে। কখনও পরাজয়। ইনি পণ্ডিত ছিলেন, কবি ও সঙ্গীত শিল্পীও। তাঁব সভায় ছিল পঞ্চরত্ন এবং সঙ্গীতের ওপরে তিনি একখানি বইও লিখেছিলেন। তিনিই জল্পেশ্বর, বাণেশ্বর ও ষণ্ডেশ্বরে শিবমন্দির নির্মাণ করেন। আর একটি আশ্চর্য কথা। তাঁর বোন রূপমতী দেবীর বিয়ে হয়েছিল নেপালের এক রাজা প্রতাপমল্লের সঙ্গে।

স্বাতি বলল : জয়পুরের রাজা মানসিংহ বা নেপালের রাজা প্রতাপমল্ল যে কুচবিহারের রাজকন্যা বিয়ে করেছিলেন তা আগে কখনও শুনি নি।

বললুম : একেবারে হাল আমলেও তো জয়পুরের রাজা কুচবিহারের রাজকন্যাকে বিয়ে করেছেন সুন্দরী শ্রেষ্ঠা বলে। সেকালেও হয়তো এই রকমের সুনাম ছিল।

স্বাতি বলল : ভুটানের সঙ্গে বিবাদের কথা বল।

তার আগে কুচবিহারের অন্তর্বিবাদের কথা বলি। প্রাণনারায়ণের মৃত্যু আসন্ন শুনে তাঁর কাকা নাজির দেও মহীনারায়ণ এসেছিলেন তার ছেলেদের নিয়ে। কিন্তু তারা

সবাই রাজা হতে চায় দেখে তিনি ভাবলেন যে নিজের কোন ছেলেকে রাজা করলে অন্য ভাইরা তাকে মেরে ফেলবে। তাই তিনি প্রাণনারায়ণের মেজো ছেলে মোদ নারায়ণকে সিংহাসনে বসালেন। মোদনারায়ণ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে মহীনারায়ণকে দমন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর মহীনারায়ণের ছেলেরাই কুচবিহারে ভুটানের সেনা নিয়ে আসে। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতরা এসে পড়ায় সবাইকে পালাতে হয়। কিন্তু পরবর্তী রাজা তাদের আক্রমণে পরাজিত ও নিহত হয়। রায়কতরা খবর পেয়ে আবার এসে নাজির দেও-এর সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত করে রাজবংশেরই একজনকে সিংহাসনে বসিয়ে যান। এইভাবেই এই রাজ্য দুর্বল হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত উপেন্দ্র নারায়ণের আমলে চরম আঘাত আসে।

কী ভাবে ?

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাতে বললুম : এই রাজার ছেলে ছিল না। তিনি তাঁর দেওয়ানদেও-এর ছেলেকে পোষ্য নিয়েছিলেন, কিন্তু রাজত্ব দেবেন কিনা সে প্রতিশ্রুতি দেন নি। রাজ্যের লোভে সে ডেকে আনে মোগল সেনা, আর যুদ্ধে নাজিরদেও পরাজিত হলে রাজা ভুটানের সাহায্যে মোগল সেনা হঠিয়ে দেন।

স্বাতি বলল : এই ঘটনা কত দিনের পুরনো ?

বললুম : সঠিক সময় বলতে পারব না, তবে এই যুদ্ধ হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে। এরপর থেকেই ভুটান কুচবিহারের উপরে প্রভুত্ব করতে থাকে এবং নিজেদের মনোমত প্রার্থীকেই সিংহাসনে বসাতে থাকে। গিয়া চিলা নামে তাদের একজন প্রতিনিধি কিছু সৈন্য নিয়ে কুচবিহারের রাজধানীতেই বসবাস করত।

ইংরেজ কি তখনও বাঙলায় আসে নি ?

দিল্লির বাদশাহ শাহ আলমের কাছে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পেয়েছিল ১৭৬৫-তে। আর এই বছরেই কুচবিহারে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। রতি শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ গোপনে রাজাকে হত্যা করে। প্রহরীদের হাতে তারও প্রাণ যায়। এই হত্যাকাণ্ডে রাজগুরু রামানন্দ গোস্বামীর হাত ছিল বলে ভুটানের রাজা তাঁর প্রাণদণ্ড দেন। নতুন রাজা হলেন দেওয়ানদেও রামনারায়ণের ভাই ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ। তিনিই কুপরামর্শে তাঁর ভাই রামনারায়ণকে বধ করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনেন।

কী ভাবে ?

ভুটানের রাজা তাঁকে বন্দী করে নিজের রাজ্যে নিয়ে গেলেন, আর কুচবিহারের সিংহাসনে বসালেন আর এক ভাইকে।

ভুটানের এই রাজা কে ?

নিঃসন্দেহে কোন দেবরাজা। ছোগিয়াল শেরপা ওয়াংচুক কুড়ি বছর দেবরাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁর আমলে এই গোলমাল হয়েছিল বলে মনে হয় না। এর পরে পরপর দুজন অল্প সময়ের জন্যে দেবরাজা হয়েছিলেন—দ্রুক্ ফুনছো ও দ্রুক্ তেনজিং। এঁরাই বারবার কুচবিহার আক্রমন করেছিলেন এবং ১৭৬৮-তে শিধর নামে একজন দেবরাজা হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন ওয়াংদিফোদ্রঙের জংপন। এর সময় পর্যন্ত লামারাই দেবরাজা হতেন এবং শিধরই প্রথম চেষ্টা করেন লামাদের কবল মুক্ত হবার।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণের কী হল ?

বললুম : শিধরের আমলেও তাঁকে ধৈর্য ধরে বন্দী থাকতে হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে শিধরের বিবাদের জন্যে মুক্তি পেয়ে গেলেন।

এমন সংক্ষেপে নয়, ঘটনাটা খুলে বল।

বললুম : ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণের ভাই রাজেন্দ্র নারায়ণ রাজা হয়েছিলেন, কিন্তু দু বছর পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর নাজিরদেও ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণের পুত্র ধরেন্দ্র নারায়ণকে সিংহাসনে বসান। এই ঘটনা ১৭৭২ সালের। খবর পেয়ে ভুটানের দেবরাজা শিধর বললেন, বন্দীর ছেলে কখনও রাজা হতে পারে না। আর সৈন্য সামন্ত দিয়ে নিজের ভাগ্নে জিম্পেকে পাঠালেন। তিনি রাজ্য অধিকার করে আর একজনকে সিংহাসনে বসালেন।

তারপর ?

নিরুপায় হয়ে নাজিরদেও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে সন্ধি করলেন। কুচবিহার হল কোম্পানীর করদ মিত্র রাজ্য। কোম্পানীর সৈন্য এল ভুটানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, জিম্পে নিহত হবার পর ভয়ে ভুটান ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করল। ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে মুক্তি পেলেন, কিন্তু রাজা হতে চাইলেন না। পুত্র ধরেন্দ্র নারায়ণই রাজা রইলেন।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে বললুম : এইখানে একটা মজার কথা বলি।

বল।

ধরেন্দ্র নারায়ণের পুত্র হরেন্দ্র নারায়ণের আমলে জয়নাথ মুনশী নামে একজন রাজোপাখ্যান নামে কুচবিহারের একখানি ইতিহাস লিখেছিলেন। এই বইয়ে আমি এই ঘটনার কথা পড়েছিলাম। নিজের রাজ্যে ফিরে ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ তাঁর নাজিরদেওকে বলেছিলেন, বাবা নাজির, রাজ্য কেন কোম্পানীতে দিলে ? ঈশ্বরদত্ত গজ সিক্কার রাজত্ব। অন্যকে রাজকর দিলে তাকে কি আর ছত্রধারী রাজা বলে ?

কী উত্তর দিয়েছিলেন নাজির ?

বলেছিলেন, মহারাজ, আপনাকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করার জন্যেই কোম্পানীকে কর দিতে রাজী হয়েছি। রাজা বললেন, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে। বিশ্বসিংহের বংশে একজনের বদলে না হয় আর একজন রাজা হত। আমরা স্বয়ংসিদ্ধ রাজা ছিলাম, এখন অন্যের অধীনতা স্বীকার করব কেমন করে ? এরপর তিনি আর কোন কথাই বলেন নি।

খুব দুঃখ পেয়েছিলেন।

কিন্তু ১৭৭৫-এ ধরেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু হলে তিনি পুনরায় সিংহাসনে বসতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু রাজকার্যের ভার দিয়েছিলেন মহারানী ও রাজগুরুর ওপরে। আট বছর পর তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর শিশু পৌত্র রাজা হন।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : দেবরাজার কী হয়েছিল ?

বললুম : একটা বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

আমাদের চা খাওয়া শেষ হয়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। হোটেলের বেয়ারাকে দেখতে পেয়ে স্বাতি বলল : নিয়ে যাও চায়ের বাসন।

বেয়ারা ঘরে ঢুকে বলল : নীচে একজন ভদ্রলোক এসেছেন আপনাদের খোঁজে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : বৃষ্টি কি থেমে গেছে ?

বেয়ারা বলল : হ্যাঁ।

চল, তাহলে আমরাও বেরিয়ে পড়ি।

বলে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে স্বাতি বলল : আমি নীচে যাচ্ছি, তুমিও তৈরি হয়ে

নামো।

স্বাতি তার ব্যাগ নিয়ে নেমে গেল। আমি নামলুম একটা মোটা পুলোভার গায়ে দিয়ে। এটা সে এবারে আমার জন্যে বুনে দিয়েছে। সঙ্গে আরও একটা পুলোভার আছে। সেটা সে হিমালয় ভ্রমণের সময়ে বুনে দিয়েছিল। কেদারনাথে সেটা খুব কাজ দিয়েছে। এই পুলোভার গায়ে দিয়ে আমি স্বাতির মনের উত্তাপও খানিকটা পাই।

নীচে নেমে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। নিরাপদ এসেছেন এবং স্বাতির সঙ্গে সে কী একটা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দুজনে ম্যানেজারের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কী যেন বলছে। আমি নীচে নামতেই নিরাপদ এগিয়ে এসে বললেন দেখুন তো গোপালদা, এই পার্মিটটা কি কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নেওয়া উচিত নয়? এটা আপনাদের পার্মিট, না অন্য কারও, তা দেখে নিলে কি ক্ষতি আছে? এটা আদৌ পার্মিট কিনা, তাও তো জানা দরকার।

বলে একখানা ছাপা ফর্ম আমার হাতে দিলে দেখলুম যে সে ভাষার কিছু মাত্র পড়তে পারি এমন বিদ্যে আমার নেই। ম্যানেজার বললেন : এটা ভুটানের রাজভাষা জংখা। সবাই পড়তে পারে না।

স্বাতি বলল : পার্মিট বলে যখন দিয়েছে, তখন এতেই আমাদের কাজ চলে যাবে। কী বল?

বলে আমার দিকে তাকাতেই নিরাপদ বললেন না স্বাতিদি, মাঝপথে চেক করে যদি বলে যে এটা পার্মিটই নয়, কিংবা অন্যের পার্মিট, তখন আপনারা কী করবেন? আমাকেই বা কোথায় পাবেন?

আমি বললুম : কথাটা যখন উঠেছে, তখন কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিলে দোষ হবে না।

পথে আসুন। একটা গোলমাল বাধলে আপনারা নিরাপদকে কোথায় পাবেন, আর নিরাপদই বা দেবুদাকে ধরে করবে কী! কোন সাহায্য তো করতে পারবে না, আর আপনারাই কি আমাকে ছেড়ে কথা কইবেন! কিন্তু স্বাতিদি এই সোজা কথাটা বুঝতে চাইছে না। বলছে, দেবুদা নাকি দুজনের নাম ঠিকানা লিখিয়ে নিয়ে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন!

স্বাতি বলল : এখানে আসার বেলায় তো আমরা তাও করি নি।

নিরাপদ বললেন : সেখানে এই ভাষায় পার্মিট ছিল না।

শেষ পর্যন্ত ম্যানেজার তাঁর কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এসে বললেন : আপনারা একটু স্থির হয়ে বসুন, আমি কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছি।

ভদ্রলোককে দেখে আমার ভুটানবাসী মনে হয়েছিল। স্বাতিও বোধহয় তাই ভেবেছিল। বলল : আপনিও পড়তে পারেন না!

ভদ্রলোক লজ্জিতভাবে বললেন : কথা বুঝতে পারি, কিন্তু লেখা পড়তে পারি না।

অগত্যা আমরা একটা টেবল ঘিরে বসলুম। নিরাপদ আগেই বলে উঠলেন না স্বাতি দি, আজ আর চা-কফি নয়। আমাকে এখনি ফিরতে হবে। কাল দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে কোন ব্যবস্থা করতে পারি নি। আজ করতেই হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : কিসের ব্যবস্থা?

নিরাপদ বললেন : আপনাদের এই হোটেলে এনে তুলেছি বলে কি গরিবের কুটিরে একবার নিয়ে যাব না?

ম্যানেজার বাইরে গিয়েছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একজন অপরিচিত

ব্যক্তিকে নিয়ে ফিরে এলেন। পার্মিটখানা আলোর নীচে ধরে তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন : হ্যাঁ। এটা পারো ও পুনাখা যাবার পার্মিট মনবাহাদুর থাপার নামে।

অ্যাঁ!

বলে নিরাপদ দম-দেওয়া পুতুলের মতো লাফিয়ে বললেন : কার নামে?

মনবাহাদুর থাপা।

সে তো দেবুদার পিওন!

স্বাতি বলল : দেবুদা তো তার হাতেই আমাদের দরখাস্তটা দিয়েছিলেন!

নিরাপদ বললেন : সর্বনাশ! দিন, আমার হাতে দিন।

বলে পার্মিটখানা ভদ্রলোকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের পকেটে পুরলেন, বললেন : কাল আমি নিজেই যাব। কাল তাহলে আপনারা থিম্ফু শহরটাই ভাল করে দেখুন।

তারপর বেরিয়ে যেতে যেতেও ফিরে এসে বললেন : ভালো কথা, ইভনিংটা ফ্রী থাকবেন। আমি কাল এসে আপনাদের নিয়ে যাব।

২৪

হোটেলের বাইরে বেরিয়ে আমরা আকাশের দিকে তাকালুম। না, আর বোধহয় বৃষ্টি হবে না। কিন্তু পাহাড়ে কিছুই বলা যায় না। দিনের আলো এখনও মিলিয়ে যায় নি। আর একটু পরেই হয়তো অন্ধকার নামবে। তার আগেই বাতি জ্বলে উঠবে চারিদিকে। কিন্তু বেড়াতে এসে ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে আমরা চাই নি। স্বাতি বলল : ওপর দিকে তো কিছু নেই, নীচের দিকেই আমরা নামি।

হেসে বললুম : বেশি নীচে নামব না। শুধু এই সিঁড়ি কটা, তারপর আবার ওপরে উঠব।

বলে আমরা নীচের প্রশস্ত রাজপথে এসে নামলুম। পথের মাঝখানে কিছু দূরে দূরে যে সব চারা গাছ লাগানো হয়েছিল, সেগুলো এখন বৃক্ষে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু মাথার উপরে ডালপালা ছড়িয়েছে হাল্কাভাবে। পরে এই গাছের নাম জেনেছিলুম, উইপিং উইলো। পাতাগুলো এমনভাবে নীচু মুখে ঝুলে থাকে যে মনে হয় জল ঝরছে। কান্নার জল। তাই এর নাম উইপিং উইলো। উইলো গাছেরই একটি জাত। আমাদের দেশে ড্রুপিং দেবদারু আছে। তার পাতাগুলোও নীচের দিকে ঝুলে থাকে। তাই এই দেবদারুর জাতকে ড্রুপিং দেবদারু বলে। সে গাছের মোটা পাতা গাঢ় সবুজ রঙের। কালচে সবুজ। এই উইলোর পাতার মতো সূক্ষ্ম ও হাল্কা সবুজ নয়। এই উইলো গাছের একটি চারা নিয়ে যাবার ইচ্ছা হল, কিন্তু লাগাবার জায়গা নেই। স্বাতি আমার ইচ্ছার কথা শুনে বলল : নিজেরা বাড়ি করার পর নিয়ে যাব।

বললুম : আবার কি আসব আমরা ?

স্বাতি বলল : ইচ্ছের কথা মনে থাকলে সংগ্রহ করতে পারব।

সামনেই থিম্ফুর বাজার এলাকা। বাড়িগুলো কতকটা একই রকম শৈলীতে তৈরি হয়েছে। সবগুলো না হলেও পাশাপাশি কয়েকটি বাড়ির মধ্যে কোন প্রভেদ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। প্রায় সব বাড়িই দোতলা, তিন তলাও মনে হচ্ছে কতকগুলো। একতলার দরজা জানালাই খোলা। সমতলের ঘর বাড়ির সঙ্গে এ সবের কোন তুলনা হয় না। এখানে ইঁটের চেয়ে কাঠের ব্যবহারই বেশি। চালা ঘরের মতো ছাদ, কিন্তু তা কিসের বোঝা যাচ্ছে না। আর একটি আশ্চর্যের কথা এই যে বড় সড় সাইনবোর্ড নেই একটাও। কিছু থাকলেও তা চোখে পড়ছে না। বাইরের দিকে দরজা জানালা ও কার্নিশের উপরে কারুকার্য দেখে নেপালের ঘর বাড়ির কথা মনে পড়ছিল। কোথায় যেন একটা মিল আছে। এক কথায় ভুটানের এই শৈলীতে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, এ স্বাতন্ত্র্য তার নিজস্ব।

আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এই সব লক্ষ্য করছিলুম। স্বাতি এবারে বলল : কোন্ দিকে যাবে ?

উত্তরে বললুম : ডান দিকে তো পথের শেষ দেখতে পাচ্ছি। তারপরেই পাহাড়।

স্বাতি বলল : কিন্তু পথটা বাঁ দিকে ঘুরে নদীর দিকে নেমে গেছে।

ঐ দিক থেকেই তো আমরা এসেছি!

আর কাল বোধহয় এই দিকে গিয়েছিলাম।

বললুম : কিন্তু রাজার সমাধি দেখতে গিয়ে পথের নিশানা গুলিয়ে ফেলেছিলুম।

স্বাতি বলল : তবে ঐ দিকেই চল।

বলে আমরা বাঁ দিকের পথ ধরে অগ্রসর হলুম। দুধারের ঘর বাড়ি ঘন সন্নিবদ্ধ নয়। অনেক স্থানে পথের নীচেও নামতে হয় এক দিকে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে বাঁ দিকে ফুটপাথের ধারেই দোকান পাট, আর ডান দিকটা নিচু হয়ে বোধহয় নদীর দিকেই নেমে গেছে। তাই ঘর বাড়ি সব জায়গায় পথের পাশেই নয়, মূল পথ থেকে নীচের দিকে খানিকটা নামতে হয় অন্য পথ ধরে। পরে জেনেছিলুম যে এই পথের ডান ধারেই থিম্ফুর পোস্ট অফিসে এই ভাবেই নেমে যেতে হয়। আরও নীচে অনেক ঘর বাড়ি আছে বসবাসের জন্যে। সরকারি কর্মচারীরা সেই সব বাড়িতে থাকেন। বাড়ি কোনটি একতলা, দোতলা কোনটি। সামনে ছোট ছোট ফুলের বাগানও আছে।

আমি শুনেছিলুম যে ভুঁটানে তাশি কমার্শিয়াল নামে একটা বড় দোকান আছে। ফুনছোলিঙেও নাকি ছিল। নানারকম শৌখিন জিনিষের সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিষই পাওয়া যায় সেখানে। উপরে হোটেল একেবারে আধুনিক ধরনের। এই সংস্থাটি সরকারি নয়, আবার জনসাধারণেরও নয়। এর মালিক নাকি রাজ পরিবারের মানুষ। একজন বলেছিলেন, মহারানী ও তাঁর ভাইরা এই সংস্থার মালিক, তাঁদের কর্মচারীরা কাজ কর্ম দেখে। থিম্ফুর আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌স মিউজিয়ম নাকি অবশ্য দর্শনীয়। এখানে ভুটানী শিল্পের নানা নিদর্শন সাজানো আছে সুন্দর ভাবে। অনেক জিনিষই বিক্রি করা হয়। কিন্তু দাম ভারতীয়দের কাছে একটু বেশি বলে মনে হবে, অবশ্য বিদেশীরা তা ভাববেন না। ভুটানে এখন অনেক বিদেশী আসছেন, তাঁরা যে কোন দামে পছন্দ মতো জিনিষ কিনে নিয়ে যেতে সক্ষম। তাই এই মিউজিয়মে পুরনো দিনের বহু মূল্যবান জিনিষও সাজানো আছে। সে সবের দাম শুনে চমকে উঠতে হয়। দিনের বেলায় এসে আমরা সে সব এই পথের ধারেই দেখে গিয়েছিলুম। অন্ধকারে আমরা এই মিউজিয়মটি দেখতে পাই নি।

পথ চলতে চলতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম : এখান থেকে মনে রাখবার মতো কিছু নিয়ে যাবে না?

স্বাতি বলল : সব কথাই তো মনে রাখছি! জিনিষ নিয়ে গিয়ে কী করব!

সত্যিই তো, আমরা তো সারা ভারত পরিক্রমা শেষ করে এখন ভুটানে এসেছি। কোথাও তো কোন জিনিষ সংগ্রহ করি নি!

স্বাতি বলল : নতুন জায়গায় এলে অনেকেই সুভেনির সংগ্রহ করেন, উপহারের সামগ্রী কিনে নিয়ে যান প্রিয়জনের জন্যে। অনেকে ছবিও তোলেন পরিবারের সবাইকে দাঁড় করিয়ে।

বললুম : আজকাল সিনে ক্যামেরার চল হয়েছে। নিজেদের ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে বন্ধু বান্ধবদের দেখান প্রজেক্ট করে!

স্বাতি বলল : ধনীরা ভি· ডি· ও ক্যাসেট তৈরি করছেন। আর নিজেদের ড্রয়িং রুমে বসে দেখাচ্ছেন বন্ধু বান্ধবকে। আধুনিকতার বিজ্ঞাপন।

এ সব কি তোমার ভাল লাগে না?

ভাল লাগে না বললে তাঁরা দ্রাক্ষা ফলের গল্প শোনাবেন। তাই সে কথা বলে লজ্জা পেতে চাই নে।

বললুম : তোমার ভাল লাগলে সে শখ তুমি মেটাতে পারতে। অনেক ধনী তোমাকে চেয়েছিল, পেলে ধন্য হত তারা।

স্বাতি হেসে বলল : কিন্তু আমি যে নিজে ধনী হতে চেয়েছিলাম। নিজেদের চেষ্টায় ধনী। পরের ধনে পোদ্দারী করতে চাই নি,

বললুম : সে আশা কি তোমার মিটবে?

নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কিন্তু স্বাতি সেই শব্দে চমকে উঠে বলল : তুমি কি আমার জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেললে?

আমি কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

স্বাতি বলল : তাহলে বলব, তুমি আজও আমাকে চেনো নি। আমি কি নিজেকে ধনী ভাবি না ভাবো? নিরাপদ যখন আমাকে স্বাতিদি বলে ডাকে, তখন কি গর্বে আমার মন ভরে ওঠে না? এইভাবে তোমার সঙ্গে পথে পথে না ঘুরলে কে আমাকে চিনত বলতো? আমার অনেক বন্ধুই তো এখন টাকার ওপরে গড়াগড়ি দিচ্ছে! তাদের কেউ কি এই অচেনা জায়গায় এলে এমন আদরের ডাক শুনবে? বল, চুপ করে রইলে কেন?

আমি এ কথারও কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

স্বাতি বলল : না, পারবে না কোন কথা বলতে। আমি গোড়া থেকেই তোমার মধ্যে একটা কম্‌প্লেক্স দেখেছি। হীনমন্যতা। নিজের যোগ্যতার সম্বন্ধে তুমি সচেতন ছিলে না, আস্থা ছিল না নিজের পৌরুষের ওপর। তাই ভাবতে যে অর্থ ও প্রতিপত্তিই সব। বিদ্যাসাগরের কথা ভাব। প্রথম জীবনে তাঁর তো কিছুই ছিল না। কিন্তু তিনি কি কোন হীনমন্যতার শিকার হয়েছিলেন কোন দিন? নিজের কথা না ভেবে তিনি দশের কথা ভেবেছিলেন, ভেবেছিলেন দেশের কথা। জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সমাজের সেবায়। সংকল্পে প্রবল নিষ্ঠাই তাঁর বল ছিল, সেই বলেই তিনি ধনী ছিলেন শৈশব থেকে। লোকে ভুল করে তাঁকে বিদ্যাসাগর বলে, তিনি ছিলেন সঙ্কল্পের সাগর। সঙ্কল্পের চূড়োয় পৌঁছবার নিষ্ঠা নিয়ে মানুষ যে অমর হতে পারে, তারই দৃষ্টান্ত। তোমার সেই সঙ্কল্পের একান্ত অভাব দেখেই আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি।

অন্য দিন অন্য সময় হলে আমি দুহাতে তালি দিয়ে বলতুম, সাবাস। কিন্তু আজ আমার হাত আড়ষ্ট হয়ে রইল, মুখেও কোন কথা জোগাল না। নিঃশব্দে আমরা পথ চলতে লাগলুম।

এক সময়ে মনে হল যে আমরা বোধহয় শহরের আর এক প্রান্তে পৌঁছে গেছি। ঘর বাড়ি কমে এসেছে দেখেই স্বাতি বলল . আর নয়, এইবারে ফেরা যাক।

তার গলার স্বর এখন শান্ত, অথচ বর্ষার জলের ভারে গাছের পাতার মতো যেন কাঁপছে। বুঝতে পারলুম যে এখনও তার স্পর্শকাতর মন থমথম করছে আমার অজ্ঞাত কোন বেদনায়। বললুম : সেই ভাল।

বলে আমরা ফিরলুম।

অন্ধকার তখন গভীর হতে শুরু করেছে। ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে। বিদ্যুতের আলো। শুনেছি, ভারতের সহযোগিতায় জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে এই শহরের জন্যে। কিন্তু এসব কথায় এখন আমার মন নেই। আমি ডুবে যাচ্ছিলুম অতীতে। অন্ধকারে বলব না, অতীতের দিকে তাকিয়ে আমি আলো দেখতে পাই, ভবিষ্যৎও দেখি আলোয়

আলোকময়। কিন্তু চিরকাল আমার এ রকম ধারণা ছিল না, আমার ভবিষ্যৎ আমি অন্ধকার দেখতুম। স্বাতিই এক দিন আমাকে বলেছিল, জীবনটা শুধু নিজের ভোগের জন্যে ভেবো না, তা ভাবলে দুঃখের শেষ থাকবে না। অন্যের দিকে তাকাও, দুঃখ দেখো অন্যের। নিজের দুঃখের কথা মনে পড়বে না, অন্যের দুঃখেই তোমার মন হবে ভারি। নিজে আনন্দ পাবে পরকে আনন্দ দেবার চেষ্টাতেই।

একথা আমি মনে মনে মেনে নিয়েছিলুম, কিন্তু স্বাতিকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, এ তোমার নিজের কথা, না অন্যের কথা বলছ আমাকে ? স্বাতির উত্তরও আমার মনে আছে। সে বলেছিল, এ আমার বিশ্বাসের কথা। তারপরেই জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার কি এ কথায় বিশ্বাস হয় না ? হয় না বলতে পারি নি, হয়ত বলি নি। বলেছিলুম, এ তো সব ধর্মেরই সার কথা। স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, ধর্মের ! মানুষের মনুষ্যত্বের নয় ? বলেছিলুম, মনুষ্যত্বই তো ধর্ম। এক দিন যা আমরা মনুষ্যত্ব বলে ভাবতাম, তারই নাম দেওয়া হয়েছিল ধর্ম। তারপর ধর্মের সংজ্ঞা বদলেছে। ঈশ্বরকে পাবার পথকে আমরা এখন ধর্ম ভাবি। তাই যত মত, তত পথ। ধর্মও তত। ধর্মের জন্যে মনুষ্যত্বকে আমরা অস্বীকার করছি।

কিন্তু এত কথা স্বাতিকে আমি বলতে পারি নি। ঠিক কী বলেছিলুম, তা মনে পড়ছে না।

চলতে চলতেই স্বাতি বলল : কী ভাবছ ?

বললুম : এলোমেলো কথা।

স্বাতি অনেক স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল , অনেক সংযত। বলল : যে কথা তোমাকে আগেও বলেছি, তাই আবার বলছি। তুমি ঠিক আগের মতোই আছ , আগের মতোই ছেলেমানুষ।

কেন বলতো ?

তোমাকে চিনতে তো আমার একটুও সময় লাগে নি। কিন্তু তুমি আমায় আজও চিনতে পার নি। অথচ—

বললুম : বল।

স্বাতি বলল : এক সঙ্গে আমরা সারা দেশ ঘুরে দেখলাম—অন্ধ্র থেকে তামিলনাড়ু, কেরালা ও কর্নাটক রাজ্য। তারপর দিল্লি, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, গুজরাত মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ। হিমাচল কাশ্মীরও দেখলাম। দেখলাম হিমালয়, এক সঙ্গে দেখলাম। কখনও দুজনে, কখনও সবাই মিলে। কত কাছাকাছি থেকে , কত উদ্বেগ ও আনন্দ নিয়ে। সে আনন্দ তো আমাদের জীবনে সঞ্চয়ের পাতায় জমা পড়েছে। তবু তুমি ভীরুই রয়ে গেল। কেন বলতে পার না যে তোমার সঞ্চয়ের ঝুলি থেকে দেশের মানুষকে তুমি অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারবে ? তোমাকে যে দিতেই হবে। দিয়েই তো আনন্দ বেশি।

স্বাতির এই নূতন রূপ দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছিলুম। ভয়ে ভয়ে বললুম : আজ তোমাকে অন্য স্বাতি বলে মনে হচ্ছে।

এ রকমের স্পষ্ট কথা কোনি দিন বলি নি বলে, তাই না ?

বোধহয় তাই।

বলবার সময় হয়েছে বলেই বলছি। আমাদের এই দীর্ঘ দিনের ভ্রমণে আমরা যা সঞ্চয় করেছি, এইবারে তোমাকে তার নির্যাস ঝুলি ঝেড়ে দিতে হবে। মন ভোলানো হাল্কা কথা নয়, তোমার অভিজ্ঞতার কথা যা সঞ্চয় করেছ তিলে তিলে।

আমি কোন উত্তর দিলুম না।

চলতে চলতেই স্বাতি বলল : তুমি সুভেনির সংগ্রহের কথা বলছিলে তো! তাকি তুমি সবার জন্য নিতে পার? তোমার জগৎটা কি এতই ছোট যে সবার জন্যে কিছু নিয়ে যাওয়া যায়! তুমি সবাইকে টেনে নাও তোমার নিজের জগতে, আর তোমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে এমন কিছু দাও যা সবার মনে পৌঁছবে। সবাই যদি আমাদের আপন ভাবে, তবেই তো আমাদের এই ভ্রমণ সার্থক।

বললুম : মনে হয় তুমি ঠিক কথাই বলছ।

মনে হয় বলছ কেন?

আমাদের অতীতের দিকে তাকিয়ে এই কথাই মনে হয়। দূর দূরান্তের দুর্গম স্থানে নির্দিষ্ট হয়েছিল আমাদের তীর্থস্থান—সমুদ্র বা নদীর ধারে, কিংবা পাহাড়ের ওপরে সুন্দর স্থানে। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে তার আকর্ষণ বাড়ানো হয়েছিল সাধারণ মানুষের মনে। তাই আমরা সেই দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে যেতাম। পরিচয় হত পথের দুধারের মানুষের সঙ্গে। তারা আমাদের আপন ভাবত, আর তারাও হত আমাদের আপন জন। আমরা আমাদের দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেতাম। তাতে শুধু ঐক্য নয়, সংস্কৃতিরও প্রসার হত।

সত্যি কথা।

আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমরা স্বার্থপর হয়েছি।

কী রকম?

এই কিছু দিন আগেও তো আমরা যাত্রাগান শুনতাম একটা মঞ্চের চারিদিক ঘিরে বসে। অভিনেতারা আমাদের মাঝখান দিয়েই হেঁটে আসত মঞ্চের ওপরে। দিনের বেলায় দেখতাম তাদের নিজেদের বেশে। দিনের আলোয় রাতের অভিনেতাকে আর খুঁজে পেতাম না।

তারপর?

তারপর থিয়েটার আরম্ভ হল। ঢাকা পড়ে গেল তিনটে দিক। অভিনেতাদের সঙ্গে আমরা সংযোগ হারালাম। তারপর সিনেমা এল। তাতে শুধু ছায়ামূর্তি দেখলাম অভিনেতাদের। তবু একটা জিনিষ বাকি ছিল। সেটা এই অভিনয় দেখতে এসে এক ঘর মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এখন এ সুযোগটাও আমরা হারাচ্ছি। নিজেদের ড্রয়িং রুমে বসে টি· ভি-র পর্দায় দেখছি যাত্রা থিয়েটার সিনেমা। মানুষকে আর আমরা কাছে পেতে চাই না, চাই না কারও আপনজন হতে।

এবারে আমি একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেলুম। আশেপাশে আর কোন মানুষ নেই। স্বাতিই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে বলে জিজ্ঞেস করলুম : আমি কি তোমাকে আঘাত দিলুম?

না, আঘাত নয়।

তবে?

এই অনুভূতিকে কী বলব জানি নে। পরস্পরের কাছ থেকে আমরা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি। আমাদের নতুন সভ্যতা আমাদের বিচ্ছিন্ন হতে শেখাচ্ছে, মানুষকে আপন করে নেবার কথা ভুলে যেতে বলছে। শেষ পর্যন্ত এতে লাভ হবে কি? আমরা কি আরও স্বার্থপর হয়ে উঠব না?

বললুম : এর জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই স্বাতি। এক দিন মনুষ্যত্বই মানুষের বন্ধন ছিল, তারপর ধর্মের বন্ধন। দেশাত্মবোধের বন্ধন তো পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙবার জন্যে। রাজনীতির কি কোন বন্ধন আছে? তাতে শুধুই স্বার্থ আর দলাদলি নয় কি?

রাজনীতি দিয়ে কি কোন জাতির উন্নতি হবে ?

বলে স্বাতির দিকে তাকাতেই সে হেসে ফেললো।

আমি লজ্জিত ভাবে বললুম : তুমি হাসছ ! সত্যিই, আজ আমরা এ সব আলোচনা করছি কেন জানি না।

স্বাতি চারিদিকে চেয়ে বলল : আমরা হোটেলের কাছাকাছি এসে গেছি।

আমি বললুম : কিন্তু কেন তুমি হাসলে তা বললে না !

স্বাতি বলল : তুমি ইতিহাসের কথা ভাবছ, ভাবছ ধর্মের কথা। কিন্তু জীবন্ত মানুষের কথা ভাবছ না। চিরদিনই তাদের তুমি অবজ্ঞা করে আসছ। সাধারণ মানুষ তোমার লেখায় অনুপস্থিত থেকে যাচ্ছে।

বললুম : জানি।

আর এরই সঙ্গে আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল : এ কথা জেনেও তুমি নির্বিকার আছ ?

বললুম : কোন উপায় যে নেই। আমরা এই দেশে এসে হোটেলে উঠেছি, থাকব মাত্র কয়েকটা দিন। এই কয়েকটা দিনে এ দেশের মানুষের কতটা জানা সম্ভব হবে বল ! কারও কাছে শোনা কথা লিখলে কি এ দেশের মানুষের প্রতি অবিচার করা হবে না ! সত্যিকার লেখক যাঁরা, তাঁরা মানুষের কথা লেখবার জন্যে তাদের সঙ্গেই সারা জীবন কাটান। আমার কি না জেনে কিছু লেখা উচিত !

স্বাতি এ কথার প্রতিবাদ করল না দেখে বললুম : যাদের দেখছি, তাদের কথা আমি লিখতে পারি। যতটুকু দেখেছি ঠিক ততটুকু। সাহিত্যে মিথ্যার স্থান নেই, মিথ্যাকে সত্য বলে চালাবার চেষ্টা শাস্তির যোগ্য অপরাধ।

কিন্তু মানুষের কথা না লিখলে যে দেশের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে !

না। একটা মানুষকে দেখে দেশের সব মানুষের বিচার করলে নিশ্চয়ই ভুল হবে। একই পরিবারের দুটো ভাইয়ের চরিত্র দু রকম হয়। কেন হয় তা নিয়ে বিশ্বের গবেষকরা হিমসিম খাচ্ছেন। জীন আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু তাদের মতিগতি কোনও ছাঁচের মধ্যে ফেলা যাচ্ছে না। ফেলা যাবেও না। তাই একজনের সঙ্গে আর একজনের প্রভেদ হবেই, তা সে যতই নিকট হোক।

স্বাতি বলল : তাহলে এক কাজ কর।

বল।

ছোট ছোট সত্য ঘটনার কথা লেখ। তাতে মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা তো হবে।

তাহলে তো পুরনো কথা বলতে হবে। আর বেশি পুরনো হলেই ইতিহাস।

স্বাতি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বলল : তোমার সঙ্গে আর তর্ক করব না।

দেখলুম যে আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে ফিরে এসেছি। এরপর আমাদের হোটেলে উঠতে হবে। কিন্তু তার আগেই স্বাতি বলল : কাল তো আমরা পারো যাচ্ছি না, এখানেই আমাদের থাকতে হবে। তুমি কি কাল সেমটোকা জং দেখতে যাবে, না অন্য কিছু ভাবছ ?

বললুম : কোন গ্রামে যেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু পকেটে পার্মিট না নিয়ে কোথাও যাবার সাহস নেই।

স্বাতি বলল : পারো বা পুনাখার পথে আমরা গ্রাম দেখতে পাব। ইচ্ছে থাকলে কিছু সময় সেখানে কটানো যাবে।

তবে কাল সেমটোকাই চল।

একটা ট্যাক্সি ঠিক করে যাব কি?

বললুম : আজ থাক।

না, বৃষ্টি আর পড়ে নি। একটা শীতল বাতাস আসছিল বোধহয় পাহাড়ের দিক থেকে। বুকের ভেতর গুড়গুড় করে উঠছিল সেই বাতাসে। পাহাড়ে এই রকমই হয়। যতক্ষণ সূর্যের আলো থাকে, ততক্ষণই শীত থাকে লুকিয়ে। অন্ধকার হলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষের ওপর। নেকড়ের মতো ধারালো তার থাবা। স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল : শীত করছে তো! চল, এবারে ফিরি।

বলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

২৫

হোটেলের দরজায় পা দিয়ে ম্যানেজারকে দেখলুম এ দেশের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা টেবিলের দুধারে বসে গল্প করতে। ভদ্রলোকের পরনে বাকু। একটা আলখাল্লার মতো ঢিলে ঢালা পোষাক, তার হাত দুটো ওল্টানো। 'ভি' আকৃতির গলা খোলা। ঝুল হাঁটুর ওপর পর্যন্ত। পায়ে মোটা হোজ, মানে হাঁটুর নীচে অবধি মোজা, তার ওপর দিকটা ওল্টানো। পায়ে বুট জুতো। হাঁটুটা খোলা। অর্থাৎ ভদ্রলোক ফুল প্যান্ট পরেন নি। এইটেই ভুটানের নিজস্ব পোষাক। কাছে এসে শুনলুম, তাঁরা ইংরেজীতে কথা বলছেন।

ম্যানেজার আমার দিকে চেয়ে বললেন : বেড়িয়ে ফিরছেন ?

স্বাতির মুখের দিকে চেয়ে মনে হল যে সে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে চায়। তাই আমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বললুম : শহরটা দেখতে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু সঙ্গীর অভাবে কিছু বুঝতেই পারলুম না।

ভদ্রলোক বললেন : কাল তো আপনাদের পারো বা পুনাখা যাওয়া হল না ! কাল আপনাদের কী প্রোগ্রাম ?

এবারে স্বাতি বলল : আমাদের দেখবার ও জানবার ইচ্ছে তো অনেক। একখানা টুরিস্ট লিটারেচার হাতে পেলে নিজেরাই একটা প্রোগ্রাম করতে পারতাম।

অপরিচিত ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। এইবারে বললেন : আপনারা ঠিক কী জানতে চান বললে আমি আপনাদের সাহায্যের চেষ্টা করতে পারি।

ম্যানেজারও দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন : এঁর নাম লেনদুপ ছেরিং। ছিলেন বড় অফিসার। এখন চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় নেমেছেন। ভদ্রলোক ছেরিং উচ্চারণ করলেন শেরিং-এর মতো করে।

আমরাও নিজেদের পরিচয় দিয়ে নমস্কার বিনিময় করলুম। তারপর স্বাতি বলল : ভুটান সম্বন্ধে আপনি যা বলবেন, তাতেই আমাদের অনেক উপকার হবে।

লেনদুপ ছেরিং আমার দিকে তাকাতেই আমি বললুম : কাল আমাদের পারো যাবার কথা ছিল, আর পরশু পুনাখা। কিন্তু পার্মিটের জন্যে কাল আমাদের পারো যাওয়া হচ্ছে না, তার বদলে পরশু যাব ঠিক করেছি। ভয় হচ্ছে যে পুনাখা দেখা বোধহয় সম্ভব হবে না।

কেন ?

এক দিনে যদি ফিরতে না পারি, তবে আমরা সময় মতো শিলিগুড়ি পৌঁছতে পারব না।

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন : এত কম সময় হাতে নিয়ে আপনারা বেরিয়েছেন ! মধ্য বা পূর্ব ভুটানেও বোধহয় আপনারা যাবেন না !

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার সঙ্কোচ বোধ হল। কিন্তু স্বাতি বলল : ও দিকে তো

অন্য পথেই যাওয়া সুবিধেজনক, তাই না?

লেনদুপ ছেরিং বললেন : এখন এ দিক থেকেও যাওয়া যায়। আপনাদের সদিচ্ছাতেই পথ তৈরি হয়ে গেছে। প্রথমে ফুনছোলিঙ থেকে থিম্ফু ও পারো,তারপর ওয়াংদি ফোদ্রঙের ওপর দিয়ে পুনাখা ও তংসা।

এ তো একদিকে নয়!

হ্যাঁ। পুনাখা উত্তরে, আর পূর্বে তংসা, আর সবার পূর্বে তাশিগং। তংসা আর তাশি গঙে অবশ্য অন্য পথেও পৌঁছানো যায়।

স্বাতি বলল : একটু কফি খেতে খেতে এই সব জায়গার কথা জেনে নেওয়া যাক, কী বল?

বলে স্বাতি হোটেলের একজন বেয়ারাকে ডেকে কফি আনতে বলল।

ম্যানেজার বললেন : আপনারা গল্প করুন, আমি নিজের কাজে যাই।

বলে চলে গেলেন।

স্বাতি ফিরে আসতেই আমি বললুম : আমরা আপনার অসুবিধা করছি না তো?

ভদ্রলোক বললেন : অসুবিধা কিসের! আজকের রাত তো আমি এই হোটেলেই কাটাব, কাল সকালে আমার বাস।

আমি আশ্চর্য হলুম দেখে ভদ্রলোক হেসে বললেন : হোটেলে উঠেছি দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন তো! হবার কথাই। শহরে আমার আত্মীয় আছেন। বন্ধু বান্ধবও আছেন। আগে নিজেরও একটা আস্তানা ছিল। কিন্তু এখন ব্যবসার কাজে আসি বলে হোটেলেই উঠি। সময় পেলে দেখা করে আসি। তাতেই সম্পর্কটা ভাল থাকে বলে মনে হয়।

আমি এ কথার কোন উত্তর দিলুম না, কিন্তু স্বাতি বলল : কাল সকালের বাস ধরে কোথায় যাবেন?

ভদ্রলোক হেসে বললেন : ভুটানের একেবারে শেষ প্রান্তে, মানে তাশিগঙে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। বুঝতে পারলুম যে এ নামটা তার শোনা মনে হচ্ছে না। ভদ্রলোকও বোধহয় এই রকম সন্দেহ করে বললেন : এ জায়গাটা হল ভুটানের একেবারে পূর্বাঞ্চলে। ভারতের অরুণাচল প্রদেশের কাছে। মানে ভুটানের এই জেলাটি অরুণাচলের তাওয়াং থেকে মাইল চল্লিশেক পশ্চিমে। তিব্বতও খুব কাছে।

বললুম : এত কাছে যে সেবারে তো চীনারা এই পথেই ভারত আক্রমণ করেছিল।

ভদ্রলোক বললেন : হ্যাঁ, ঐ অঞ্চলটা এখনও তারা নিজেদের বলে ভাবে। আর শুধু তাওয়াং অঞ্চলই নয়, সমগ্র নেপাল ও ভুটানের উত্তর দিকটাও নিজেদের বলে দাবী করে। হিমালয়ের জন্যেই আমরা নিশ্চিন্ত আছি। বরফের পাহাড় বলেই সেখানে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে সিকিমের ভাগ্য ভাল।

কেন?

তার কোন অংশ তারা এখন দাবী করে না। আর ভুটানেরও পশ্চিমের দিকে তাদের দাবী নেই। থাকলে চুম্বি উপত্যকা দিয়ে ঢুকে সহজেই যুদ্ধ বাধাতে পারত। ইংরেজ যেভাবে নেপাল সিকিম ও ভুটানের দক্ষিণাংশ যুদ্ধ করে কেড়ে নিয়েছে, ঠিক তেমনি করেই তারা হা বা পারো উপত্যকায় ঢুকে থিম্ফুতে উপদ্রব করতে পারত।

স্বাতি বলল : আপনি আগেও নিশ্চয়ই তাশিগঙে গিয়েছিলেন?

ভদ্রলোক বললেন : গিয়েছিলাম অনেক দিন আগে, বোধহয় ১৯৬৯ সালে। তখন

আপনারা তাশিগঙে যাবার পথ তৈরি করছিলেন।

আমরা!

আপনারাই তো ভুটানের সব পথ ঘাট তৈরি করে দিয়েছেন! আপনারা মানে ভারতীয়রা। ইংরেজের মতো আপনারা তো আমাদের স্যাটেলাইট ভাবেন নি, প্রতিবেশী বন্ধু হিসেবেই উন্নতি চেয়েছিলেন। আর তার জন্যে পেয়েছিলেন জিগ্‌মে দোরজি ওয়াংচুকের মতো একজন দূরদর্শী রাজা।

বললুম: আপনি তো এই রাজাকে দেখেছেন?

দেখেছি মানে! খুব কাছে থেকে দেখেছি। আপনজনের মতো কাছে থেকে। ভালবেসেছি, ভক্তি করেছি, তাঁর উদার মনোভাবের জন্যে দেশবাসীকে ভাগ্যবান ভেবেছি। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

কত দিন আগে?

১৯৭২ সালের জুলাই মাসে। বয়সে তিনি আমার প্রায় সমবয়সী ছিলেন, কিন্তু অভিজ্ঞতায় ছিলেন অনেক বড়! আর দূরদর্শিতায় তাঁর বোধহয় দিব্য চক্ষু ছিল।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: কী রকম?

ভদ্রলোক বললেন: ইতিহাসের কথা আপনি আর কারও কাছে জেনে নেবেন, আমি আপনাদের নিজের চোখে দেখা কথাই বলব।

বেয়ারা আমাদের কফি এনে টেবলের ওপরে রাখতেই ভদ্রলোক উঠে বললেন: মুখটা ধুয়ে আসি।

বলে মুখ ধোবার জন্যে চলে গেলেন। পানের রসে তাঁর ফর্সা ঠোঁট রাঙা হয়ে ছিল। বুঝতে পারলুম যে এই জন্যেই বোধহয় তিনি উঠে গেলেন। এর মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে শুধু পোষাকে নয়, রাঙা ঠোঁট দেখেও ভুটানবাসীকে চেনা যায়। স্বাতি এরই মধ্যে কফি তৈরি করে ফেলল এবং ভদ্রলোক ফিরে আসতেই প্রথম পেয়ালাটি তাঁর দিকে এগিয়ে দিল। ধন্যবাদ জানিয়ে ভদ্রলোক সেই কফির পেয়ালাটি টেনে নিয়ে চুমুক দিলেন।

কফি খেতে খেতেই তিনি আমাদের অনেক কথা বললেন: তংসার পেনলোপ সার উগ্যেন দোরজি ওয়াংচুক কী ভাবে ভুটানের প্রথম রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন, তা আপনারা ইতিহাসের বই-এই পেয়ে যাবেন। শুনেছি যে তিনি রাজা হয়ে বসবার পরে উনিশ বছরেই ভুটানের অন্তর্বিরোধের অবসান ঘটাতে পেরেছিলেন। তাঁর পুত্র জিগ্‌মে ওয়াংচুকও নির্বিঘ্নে রাজত্ব করেছিলেন ছাব্বিশ বছর। তাঁর পর রাজা হয়েছিলেন তাঁর চব্বিশ বছর বয়সের ছেলে জিগ্‌মে দোরজি ওয়াংচুক। ১৯৫২ সাল। ভুটানের ইতিহাসে এই সালটি মনে রাখবার মতো। রাজার হৃদয় যে দেশের প্রজার জন্যে কত উদার হতে পারে, তার নজির বোধহয় এ কালে আর একটিও মিলবে না।

ভদ্রলোকের চোখে মুখে এমন একটি ভাব ফুটে উঠল যা নিতান্তই আন্তরিক। তিনি একটু দম নিয়ে বললেন: বিশ্বের দরবারে ভুটান যে কত পিছিয়ে আছে তা দেখতে পেয়ে তিনি রাতারাতি এই দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সংকল্প নিলেন। প্রজাদের টেনে নিলেন দেশের উন্নতির কাজে। দেশের আয় এত কম, আর সেই আয়ের এত বেশি খরচ হয় লামাদের জন্যে যে গরিব প্রজাদের দুর্দশা দূর করা সম্ভব নয়। পয়সা বা টাকা তারা চিনত না, উদ্বৃত্ত শস্যের বদলে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করত তিব্বত বা ভারত থেকে। অল্পেই সন্তুষ্ট ছিল বলে প্রশ্রয় দিয়েছিল আলস্যকে। এই অবস্থার

পরিবর্তন করতে হলে বাইরের সাহায্য নিতেই হবে। তিনি ভারতকেই বেছে নিলেন বন্ধু হিসেবে, ১৯৫৮ সালে নিমন্ত্রণ করে আনলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুকে। ভারত থেকে ভুটানে আসবার কোন পথ সেদিন ছিল না বলে সিকিম থেকে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা ডিঙিয়ে তাঁকে এ দেশে আসতে হয়েছিল। অথচ ভারতের সঙ্গে ভুটানের দক্ষিণ সীমান্ত দুশো মাইল ব্যপ্ত।

তারপর ?

বলে স্বাতি সাগ্রহে তাকাল ভদ্রলোকের মুখের দিকে। তিনি বললেন : পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে রাজার কী আলোচনা হয়েছিল আমরা জানি না। জানা সম্ভব নয়। তবে পণ্ডিত নেহেরু নিশ্চয়ই দেখেছিলেন যে আমাদের রাজা সিংহাসনে বসবার পরে প্রথম কাজ করেছিলেন দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ। ১৯৫২ সালেই তিনি এই প্রথা বেআইনি বলে ঘোষণা করে দেশের পাঁচ হাজার দাসকে মুক্তি দিয়েছিলেন। শুধু মুক্তি নয়, তাদের জমি ও অর্থ দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আর পরের বছরই তিনি জনসাধারণের শ দেড়েক প্রতিনিধি নিয়ে চংদু বা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি গঠন করেছিলেন। তিনি যা করেছিলেন ও যা করতে চাইছেন, তা নিশ্চয়ই বলেছিলেন। পণ্ডিত নেহেরুও তাই ভুটানের অগ্রগতিতে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন। এর পর থেকেই পথ ঘাট নির্মাণ আরম্ভ হয়ে যায়। প্রথমেই নির্মিত হয় হাসিমারা থেকে ফুন ছোলিঙ হয়ে পারো ও থিম্ফু আসার পথ। তারপর থিম্ফু থেকে ওয়াংদি ফোদ্রং হয়ে পুনাখা ও তংসা যাবার পথ ও তাশিগং থেকে তংসার পথ। এর আগেই তৈরি হয়েছিল বঙ্গাইগাঁও থেকে গ্যালেফুগ হয়ে তংসার পথ, আর রঙ্গিয়া থেকে তাশিগঙের পথ। এখন আপনি পশ্চিম ভুটানের হা থেকে পূর্ব ভুটানের তাশিগঙ পর্যন্ত সরাসরি যেতে পারেন।

স্বাতি বলল : তবে আপনি ঘুরে যাচ্ছেন কেন ?

ব্যবসার খাতিরে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলে চলে না।

বললুম : বুঝেছি। আপনি ভুটানের রাজার সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন।

আমার এই কথায় ভদ্রলোক বেশ উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। বললেন : জানেন, সব কথা বিশ্বাস করতে আপনাদের কষ্ট হবে।

সে আশঙ্কা করবেন না।

ভদ্রলোক বললেন : কোন দেশের স্বাধীন রাজা নিজের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা খর্ব করতে চেয়েছেন বলে আমার জানা নেই। এঁকে তাই করতে দেখে আমরাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি স্বেচ্ছায় অ্যাব্‌সোলিউট মনার্ক থেকে কন্‌স্টিটিউসনাল মনার্ক্ হলেন। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির হাতে এত ক্ষমতা দিলেন যে তিন বছর অন্তর অন্তর রাজাকে ভোট অফ কন্‌ফিডেন্স নিতে হবে। তারা ভোটের ক্ষমতা পেল, ক্ষমতা পেল রাজাকে সরাবারও।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : তবে রাজার ক্ষমতা রইল কী ?

ভদ্রলোক সহাস্যে বললেন : যতক্ষণ তিনি প্রজার বিশ্বাসভাজন, ততক্ষণ তাঁর সমস্ত ক্ষমতা। প্রজার বিশ্বাস হারালেই তিনি আর রাজা নন।

প্রজার হাতে এত ক্ষমতা দিলেন কেন ?

মনে হয় এ তাঁর দূরদর্শিতা। সিকিমের রাজার অবস্থা দেখেছেন ! তিনি এখন রাজ্যের কেউ নন। অথচ ভুটানের রাজা ক্ষমতা দিয়েও রাজা ছিলেন, তাঁর ছেলেও রাজা হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে একজন রাজা গেলে আর একজন রাজা

হবেন। একজন ক্ষমতাচ্যুত হলে আর একজন আসবেন ক্ষমতায়। কিন্তু প্রজা চিরকালই থাকবে। তারা শক্তির অধিকারী হলে দেশও শক্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী হবে। দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যে দেশের লোকের হাতেই ক্ষমতা দিতে হবে। দেশাত্মবোধ জাগবার সুযোগ না দিলে কোন দেশই বড় হতে পারে না।

ভদ্রলোকের কথায় আমরা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম। তাই দেখে তিনি বললেন : এমন দরদী রাজার কথা আপনারা শুনেছেন কি ?

স্বাতি অবিলম্বে বলল : না, শুনি নি নয়, ভাবতেও পারি নে।

ভদ্রলোক বললেন : আমি আপনাদের সাহায্যের কথা বলছিলাম। আপনাদের চেষ্টাতেই আমরা কলম্বো প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। বৈদেশিক সাহায্য পাই কুড়ি কোটি টাকা। ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নে ঢুকেছি, মেম্বার হতে পেরেছি ইউ· এন্· ওর।

বললুম : তাই ভারত যেদিন বাঙলা দেশকে স্বীকৃতি দিল, আপনারাই প্রথম সমর্থন করলেন ভারতকে।

করতেই হবে। ভুটানের জন্যে ভারত যা করেছে, তা তো আমরা ভুলতে পারি না। শুধু পথঘাটই নয়, আমাদের টাঁকাশাল, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, স্কুল-কলেজ, ব্যাঙ্ক, বাজার, সিনেমা—সবই হয়েছে আপনাদের সহায়তায়। আপনারা আমাদের সেনা বাহিনীরও শিক্ষার ভার নিয়েছেন। আপনাদের প্রধান সেনাপতি মানেক শ এসেছিলেন, রাষ্ট্রপতি গিরিও একবার এসেছিলেন।

স্বাতি বলল : আপনি আমাদের তাশিগঙের কথা বলুন। সেখানে হয়তো আমরা যেতেই পারব না!

ভদ্রলোক বললেন : একটি জনবহুল জেলা, কৃষি প্রধান। একটি জঙের জন্যে তাশিগং বিখ্যাত।

কী ভাবে যেতে হয় ?

যাতায়াতের এখন কী সুবিধা হয়েছে, এবারেই দেখতে পাব। আমি যখন শেষবারে গিয়েছিলাম, তখন রঙ্গিয়া থেকে বাসে এসেছিলাম সীমান্ত শহর সংদ্রুপ জঙকারে, সেখানে অন্য বাস ধরে তাশিগঙে। দূরত্ব বেশি নয় তো, আর উচ্চতাও সাড়ে তিন হাজার ফুটের মতো। রঙ্গিয়া থেকে ব্যবস্থা ভাল হলে এক দিনেই পৌঁছানো যাবে।

আমি বললুম : তাশিগঙ জঙটি বোধহয় দেখবার মতো ?

ভদ্রলোক বললেন : প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব ভাল। একটা উঁচু পাহাড়ের ওপরে জং, তার দুধারে দুটি নদী—দঙ্গমা চু আর গমকি চু। নীচে মানস নদী। ভুটানের তৃতীয় দেবরাজা ভুটানের পূর্বাঞ্চলে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করে এই জং নির্মাণ করেছিলেন। আসলে একটি দুর্গ, তবে দেশের অন্যান্য জঙের মতো ভেতরে একটি বিহার আছে। মাঝখানে উপাসনার ঘরে এক জোড়া বিরাট আকারের হাতির দাঁতের ওপরে বেদী। মন্দিরের মধ্যে সুন্দর ফ্রেস্কো ও মূর্তি। এই সব মূর্তির মধ্যে এগারটি মাথার চেনরেজি ও যমের মূর্তিই প্রধান।

যম তো আমাদের মৃত্যুর দেবতা!

আমাদের কাছে তিনি তার চেয়েও বড়, কিং অফ ল। ধর্মরাজ যম ভাল-মন্দ ওজন করেন, রক্ষা করেন ধর্ম বিশ্বাস। তবে তিনি অবলোকিতেশ্বরের ভীষণ ভয়ঙ্কর রূপ বলে লোকে তাঁকে ভয় পায়, নানাভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেখানে গেলে একটি কথা মনে রাখবেন।

কী কথা ?

বিহারে অনেক লামা আছেন তো, তাঁদের নাচ দেখবার চেষ্টা করবেন। যমের সামনের অঙ্গনে তাঁরা পর্ব দিনে যমের নানা কাহিনী নিয়ে নাচেন।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল : লামাদের একটা নাচ দেখতে পেলে মন্দ হত না।

কথাটা সে বাঙলায় বলল, আর আমি তার উত্তরও দিলুম বাঙলায় : চেষ্টা করে দেখা যাবে।

কিন্তু মিস্টার লেনদুপ ছেরিং তা বুঝতে না পেরে বললেন : আপনারা কি বিরক্ত হচ্ছেন ?

স্বাতি বলে উঠল : মোটেই না। বরং ভাবছি, এইবারে আপনার কাছে তংসার কথা জানতে চাইব কিনা।

ভদ্রলোক বললেন : তংসায় যাওয়া আপনাদের কাছে থিম্ফু আসার মতোই সোজা। আপনারা কলকাতা থেকে আসছেন তো ? শিলিগুড়ি বা হাসিমারায় না নেমে বড় লাইনের ট্রেনেই বঙ্গাইগাঁও এসে নামবেন। সেখান থেকে চলে আসবেন গ্যালেফুগ, দূরত্ব কুড়ি-পঁচিশ মাইল হবে। সেখান থেকে বাসে চেপে তংসা। ইচ্ছে করলে এখান থেকেও যেতে পারেন। ওয়াংদি ফোদ্রং থেকে পেলে লা পেরিয়ে তংসা পর্যন্ত মোটর পথ তৈরি হয়ে গেছে।

স্বাতি বলল : জং ছাড়া সেখানে কি আর কিছু দেখবার আছে ?

ভদ্রলোক একটু ভেবে বললেন : আপনাদের কাছে তংসার প্রধান আকর্ষণ হবে কুলাকাংড়ি গিরি শৃঙ্গ। এখানে তো কোন তুষার শৃঙ্গ দেখতে পাচ্ছেন না ! তা দেখতে হলে আপনাদের পারো ছাড়িয়ে যেতে হবে চোমলহরি শৃঙ্গ দেখতে, কিংবা তংসায় কুলাকাংড়ি দেখতে। চোমলহরি চব্বিশ হাজার ফুটের তিনফুট কম, আর কুলাকাংড়ির চারটি শৃঙ্গই সাড়ে চব্বিশ হাজার ফুটেরও বেশি ! চোমলহরি শৃঙ্গ জয় হয়েছে একাধিকবার, কিন্তু কুলাকাংড়ির শৃঙ্গে কেউ উঠেছে বলে শুনি নি।

আমি বললুম : এবারে তংসার জঙের সম্বন্ধেও কিছু বলুন।

ভদ্রলোক বললেন : এই জঙটি পূর্ব ও পশ্চিম ভুটানের মাঝে এমন এক জায়গায় অবস্থিত যে একে ডিঙিয়ে এক ধার থেকে অন্য ধারে যাবার উপায় ছিল না। আর এইজন্যেই পেনলোপরা যখন ক্ষমতার লড়াই-এ মত্ত ছিলেন, তখন তংসার পেনলোপাই জয়ী হয়েছিলেন। এখন যাঁরা বংশানুক্রমে রাজা হচ্ছেন, তাঁরা আগে তংসারই পেনলোপ ছিলেন। এই জঙের কাছেই তাঁদের বাসগৃহ এবং আমাদের স্বর্গত রাজার জন্মও হয়েছিল সেখানে।

এখন সেখানে কী দেখবার আছে ?

অনেক কিছু। তবে সবই ঐতিহাসিক ব্যাপার। শুনেছি, নওয়াং নামগিয়েল একটি ছোট জং তৈরি করেছিলেন, দেবরাজারা সেটি ধীরে ধীরে বড় করেন। প্রথম রাজা একটি কুড়ি ফুট উঁচু বুদ্ধ মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। একাদশ শতাব্দীর তৈরি গণ্ডারের শিঙের স্থাপত্য ও শিল্পকর্ম দেখবার মতো। চার দিকপালের ফ্রেস্কো খুব সুন্দর। উপাসনার ঘরে ফুরপার ছবিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : ফুরপা কে ?

একজন দেবতা, তাঁর ছটি হাতে নানা রকমের অস্ত্র। আরও নানা রকমের মূর্তি আছে।

আমি বললুম : তংসার পেনলোপ তো এখন ভুটানের রাজা, এই জঙের মালিক

এখন কে ?

ভদ্রলোক বললেন : পেনলোপ নামের কোন পদাধিকারী তো এখন নেই, এখন একজন জংদার ওপরেই এই জং ও জেলার কর্তৃত্ব দেওয়া আছে।

মিস্টার লেনদুপ ছেরিং তাঁর ঘড়ির দিকে তাকাতেই ব্যস্তভাবে আমি বললুম : তংসা ও তাশিগঙের মাঝে কি কিছু দেখবার নেই ?

ভদ্রলোক বললেন : পথের কথা জানতে চান ? ওয়াংদি ফোদ্রং থেকে তংসা পৌঁছতে হয় পেলে লা পেরিয়ে। এই পাহাড়ের নাম ব্ল্যাক মাউন্টেন। আর তংসা ছাড়িয়ে তাশিগঙের দিকে যেতে বুমথাং উপত্যকা। প্রথমে তাশি ছোলিং, তারপরেই ওয়াংদি ছোলিঙ।

এ সব জায়গায় দেখবার কিছু নেই ?

ও দিকে গেলে ওয়াংচুক লিং গ্রামে বুমথাং নদীর ধারে দেখবেন বিয়াকর জং। তার মাঝখানের টাওয়ার দেড়শো ফুট উঁচু, আর ঝর্নার ধারে যাবার জন্যে একটি ঢাকা পথ আছে দুর্গ থেকে। ভেতরে প্রার্থনার জন্যে সুসজ্জিত ঘর তো আছেই, তার দেওয়ালে ফ্রেস্কো। বজ্রপাণির চিত্রও*আছে। আর যা আছে তা অন্য কোথাও নেই।

সেটা কী ?

একাদশ-দ্বাদশ শতকের তিব্বতী কবি মিলা রস্‌পার জীবনের নানা কাহিনী।

বলেই ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। বললেন : আজ উঠি। আবার দেখা হবে।

আমরাও উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার জানালুম।

২৬

কফির বাসন নিতে এসে বেয়ারা জিজ্ঞাসা করল : আপনারা কি ডিনার খেয়ে ওপরে উঠবেন ?

ঘড়ি দেখে স্বাতি বলল : সত্যিই তো, ডিনার সেরেই আমরা ওপরে উঠতে পারি। তাই করবে ?

আমি বললুম : সেই ভাল।

বেয়ারা খাবারের অর্ডার নিয়ে চলে যাবার পর স্বাতি বলল : ভদ্রলোক দেশের রাজাকে খুব ভালবাসতেন।

বললুম : নরি রুস্তমজীর লেখা পড়েও আমার ধারণা হয়েছিল যে মানুষ হিসেবে রাজার তুলনা নেই। রাজার সঙ্গে তাঁর যখন দেখা হয়েছিল,তখন তাঁর বয়েস তো বেশি নয়, কিন্তু সেই বয়েসেই তিনি অনেক বিজ্ঞ ছিলেন এবং প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে তাঁর চিন্তার অন্ত ছিল না। রাজ্যের অর্ধেক আয় ব্যয় হত মঠের জন্যে, কিন্তু জন সাধারণের স্বার্থে সেই খরচ কমাতে তিনি রাজী ছিলেন না লামাদের অসন্তোষের আশঙ্কায়। তার বদলে তিনি জঙে জনশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ছোট বড় সবার সঙ্গে মেলামেশা করতেন অবাধে সহজ ভাবে, সবার জন্যে তাঁর দ্বার খোলা ছিল। দেশে ঘুরে দেখতেন, থাকতেন তাঁবুতে, প্রজারা এসে অভাব অভিযোগের কথা বলত। থিম্ফুর হাসপাতাল তাঁর নিজের হাতে তৈরি।

নিজের হাতে মানে ?

নিজের তৈরি প্ল্যান—ভুটানের নিজস্ব শৈলীতে। একশো চল্লিশজন মজুর নিজে খাটাচ্ছিলেন। নরিকে বলেছিলেন যে আর ছ মাসেই নির্মাণ শেষ হবে। দেশের বেশির ভাগ লোক কৃমি আর যৌনরোগে ভোগে। তাদের চিকিৎসার জন্যে পঞ্চাশ বেডের হাসপাতাল তৈরি করেছিলেন। মিথান এনেছিলেন তাওয়াং অঞ্চল থেকে।

মিথান কী ?

বাইসনের মতো দেখতে গৌরকে সেদিকে মিথান বলে, কিন্তু তার দুধ কেউ নাকি খায় না। রাজা সেই মিথান এনে ভুটানের গরুর সঙ্গে ক্রস্ করে উন্নত জাতের গরু করেছিলেন। চাষের উন্নতি, টাকার প্রচলন—এ সবই তাঁর কাজ।

স্বাতি বলল : তাদের অবস্থার কি খুব বেশি উন্নতি হয়েছে ? সেদিন একটা ভ্রমণ কাহিনীতে ভুটানের কুলি ও ঘোড়া ওয়ালাদের কথা পড়লাম। তারা ভাত সেদ্ধ করার সময় গোটা কয়েক শুকনো লঙ্কা ফেলে দিল, আর সেই ভাত খেল শুধু নুন দিয়ে। পর দিন যাত্রার আগে নুন আর শুকনো লঙ্কা মেখে ছাতু খেল পেট ভরে। তাদের নোংরামির কথাও পড়েছি বলে মনে হচ্ছে।

বললুম : আমাদের দেশের পাহাড়ীদের সঙ্গে তাদের তুলনা কর। যে ঘোড়া ওয়ালারা আমাদের কেদারনাথে নিয়ে গেছে, তাদের কথা কি তুমি ভুলে গেছ ?

নরি রুস্তমজীই ঠিক কথা বলেছেন।

কী বলেছেন তিনি ?

রাজার ইচ্ছাতেই তাঁকে গ্রামে ঘুরে ঘুরে গৃহস্থদের অবস্থা নিজের চোখে দেখতে হয়েছিল। তারপর তিনি লিখেছিলেন যে ভুটানীদের ঘরবাড়ি ভারতীয়দের চেয়ে প্রশস্ত। অনেক জায়গাতেই বাড়ি তৈরির সময়ে খাদ্য ও পানীয় দিয়ে অনেক গ্রামবাসীর সাহায্য পাওয়া যায়। আর ঘরে আলো বাতাসের জন্যে বড় জানালা থাকে অনেক। বাড়িগুলো সাধারণত দোতলা। নীচে গৃহপালিত পশু, মাঝখানে শোবার ও ওপরের চালে জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা। ঘরবাড়ি আমাদের পাহাড়ীদের চেয়ে বেশি নোংরা নয়, বেশি পরিস্কারও নয়। আর খাদ্য ? ভাল খায়, মাংস ভালবাসে। ধেনো মদ বেশি খায় না, কাউকে মাতলামি করতে দেখা যায় না।

সবাই কি খেতে পায় ?

যারা গ্রামে বাস করে তাদের মাংস ভাত আর সব্জির অভাব নেই। পাহাড়ের গায়ে জল এনে চাষের ব্যবস্থা ভাল, কিন্তু তাঁতে কাপড় বোনার চল তেমন নেই।

নোংরামির কথা কিছু লেখেন নি ?

বললুম . তাহলে একটা মজার কথা বলি।

বল।

তাঁরা জনা ত্রিশ বাচ্চা ছেলে নিয়ে ফিরছিলেন ভারতে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন বলে। হা পৌঁছে তাঁরা সেই ছেলেদের স্নানের ব্যবস্থা করলেন ভুটানের নিজস্ব কায়দায়।

স্বাতি বলল : সে আবার কী রকম ?

মাটিতে একটা চৌকো গর্ত খুঁড়ে কাঠের তক্তা পেতে সেই গর্ত জলে ভরা হল। তারপর আগুন জ্বালা হল কাছে। তার ভেতর ফেলে দেওয়া হল অনেক বড় বড় পাথর। এক একটা পাথরের ব্যাস প্রায় এক ফুট। সেই সব পাথর তেতে উঠতেই লাঠি দিয়ে গড়িয়ে সেগুলো গর্তের জলে ফেলে দেওয়া হল। দেখতে না দেখতেই জল গরম হয়ে উঠল।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : কেন, জল গরম করার কি আর উপায় নেই ?

কিন্তু ভুটানীরা নাকি মনে করে যে এইভাবে গরম করা জল শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। পাথরে নাকি খনিজ পদার্থের গুণ আছে।

তার মানে তুমি বলতে চাও যে ভুটানীরা স্নান করে।

বললুম : দেশটা আমাদের মতো গরম নয় তো যে রোজ স্নান করতে হবে ! শীতের দেশের খবর আমরা কতটুকু রাখি !

তবে একটা জিনিস বোধহয় লক্ষ্য করেছ।

কী !

শহরের পথঘাট অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, কোথাও একটা কুটোকাটিও নেই।

বললুম : এখনও পর্যন্ত নোংরামি কোথাও দেখি নি।

পরে আমরা নিরাপদর কাছে শুনেছিলুম যে ভুটানীরা পান খেতে খুব ভালবাসে। পানের রসে তাদের ঠোঁট সারাক্ষণ টুকটুকে লাল। কিন্তু যেখানে-সেখানে পানের পিক ফেলতে দেখা যায় না। সিগারেট ধরিয়ে দেশলায়ের কাঠি কেউ পথে ছুঁড়ে ফেলতে পারে না, হাতে রেখে রাস্তার পাশের ডাস্টবিনে ফেলতে হয়। এক মন্ত্রী নাকি একবার একজনকে রাস্তায় দেশলায়ের কাঠি ফেলতে দেখে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

—টেবলে আমাদের খাবার আসতেই আমরা আহারে মন দিলুম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে স্বাতি বলল : আজ আমাদের ছুটির দিন, তাই না ?

আমি বললুম : ছুটি না নিলেই ভাল হত।

কেন বলতো !

ঘরের বাইরে বেরিয়ে কারও কাছে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেলেই আমরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করি। সেই সাহায্য নিলে ক্ষতি কিন্তু আমাদেরই হয়। অর্থাৎ আমরা সাবলম্বী হতে পারি না। কাল আমরা নিজেরা পার্মিট সংগ্রহ করলে আজ আমাদের এই অবস্থা হত না, আর কাজটাও শেখা হয়ে যেত।

স্বাতি বলল : এ রকম যে হবে, তা কি কেউ জানত !

শেষ পর্যন্ত বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে আমরা ব্রেকফাস্ট করতে নামলুম নীচে। একটু আগেই নীচে নামলুম। আর আশ্চর্য হয়ে গেলুম গত সন্ধ্যার সেই ভদ্রলোককে দেখে। মিস্টার লেনদুপ ছেরিং কফির সঙ্গে থুকপা খাচ্ছিলেন। স্বাতি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নমস্কার করে বলল : আপনার তো সকালের বাসেই চলে যাবার কথা ছিল !

ভদ্রলোক হেসে বললেন : ইচ্ছে থাকলেই যে সব কাজ করা যায় না, তা বুঝতে পারছি।

আমরা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে বললেন : আগে বসুন, তারপর বলছি।

বেয়ারা এগিয়ে এসেছিল, তাকে খাবারের অর্ডার দিয়ে আমরা বসলুম। ভদ্রলোক বললেন : আপনাদেরও তো আজ পারো যাবার কথা ছিল, পারলেন যেতে ? শেষ পর্যন্ত হয়তো পুনাখায় যাওয়া বাদ দিতে হবে, তাই না ?

সত্যি কথা।

ভদ্রলোক বললেন : আমারও তাই। যে কাজটা কাল রাতেই হবে ভেবে সকালে যাব স্থির করেছিলাম, তা হয় নি। এর জন্যেই আটকা পড়েছি। যদি তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, তবে পরের বাস ধরব, আর ফুন্‌ছোলিঙ থেকে ট্যাক্সি নিয়ে যাব ট্রেন ধরতে।

স্বাতি বলল : এখন আপনার যদি তাড়া না থাকে, তাহলে আমাদের খুব লাভ হবে।

কী রকম ?

বলে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন।

স্বাতি বলল : পুনাখার কথা আপনার কাছে জেনে নিতে পারলে আমাদের আর যেতে না পারার আপশোস থাকবে না।

খেতে খেতেই ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন : আপনারা দেশ দেখতে এসেছেন, তাই নিজের চোখে দেখাই ভাল। পরের মুখে শোনার চেয়ে নিজের চোখে দেখাই ভাল।

আর দেখার সুযোগ না থাকলে শুনেও তো কিছু আনন্দ পাওয়া যায় ! তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

ভদ্রলোক বললেন : পুনাখায় গেলে পথে ওয়াংদি ফোদ্রংও দেখা হয়ে যেত। দূর বেশি নয়। এখান থেকে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ মাইল পথ। আর পুনাখা এখান থেকে পঞ্চাশ মাইলের কিছু বেশি। পুনাখা যাবার পথে কিংবা ফেরার সময় ওয়াংদি ফোদ্রঙের জংও দেখে নিতে পারতেন।

আমি বললুম : এ দুটি জায়গার বৈশিষ্ট্যের কথা যদি আপনি সংক্ষেপে বলতেন, তাহলে খুব ভাল হত।

ভদ্রলোক একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন, তারপর বললেন : বলছি। তাং চু আর সঙ্কোশ নদীর সঙ্গমের কাছে একটা পাহাড়ের ওপরে ওয়াংদি ফোদ্রঙের জং। নদীর ওপরে আছে সুন্দর পুল। তারপর চড়াই পথে জঙে উঠতে হয়। এই অঞ্চলের প্রায় সব জঙই নওয়াং নামগিয়েলের আমলে তৈরি। তাই সবই খুব পুরনো। তিনি নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে এইখানে ঘুমন্ত ষাঁড়ের আকারে একটি জঙ তৈরি করলে দেশে শান্তি বিরাজ করবে। তিনি তাই করেছিলেন।

স্বাতি বলল : এই রকমেরই আকার নাকি জঙের ?

ভদ্রলোক বললেন : আমার তো শিল্পীর চোখ নয়, আমি কিছু বুঝতে পারি না। তবে বলেছি যে নওয়াং নামগিয়েল যখন এই জঙ নিমার্ণের জন্যে জায়গা খুঁজতে লোক পাঠিয়েছিলেন, তারা চারটে কাক এখান থেকে চারদিকে উড়ে যেতে দেখেছিল। এই কথা শুনে তিনি বলেছিলেন যে সেখানেই জঙ নির্মাণ করলে চারি দিকে ধর্মের প্রসার হবে।

একটু থেমে বললেন : এই জঙের একটি মন্দিরের ছাদ সোনার। আর একটি কথা মনে রাখবেন।

কী কথা ?

আগে এই সব জঙে আগুন লাগত, একবার দুবার করে পুড়ে যেত। তারপর ১৮৯৭-এর ভয়াবহ ভূমিকম্পে ভুটানের প্রায় সর্বত্র খুব ক্ষতি হয়েছিল। তাই এই সব জং অনেকবার পুনর্নির্মিত হয়েছে, ছোট থেকে বড় হয়েছে একটু একটু করে। নদীর ওপরে যে পুল দেখবেন, তাও নতুন। তিনশো বছরের পুরনো সুন্দর পুলটি ১৯৬৮ সালের বন্যায় ভেসে যাবার পর নতুন একটি পুল তৈরি হয়েছে।

ভদ্রলোক আর একবার থামলেন, তারপর বললেন : ভেতরের কথা বলব ?

বলবেন বৈকি।

প্রার্থনার বিরাট ঘরে তিনটি মূর্তি দেখবেন—বুদ্ধ, গুরু পদ্মসম্ভব ও শবদুং রিমপোছের মূর্তি। ঘরের দেওয়ালে জাতকের কাহিনীর ফ্রেস্কো, আর ঘরের বাইরে একটি দেওয়ালের গায়ে দেখতে পাবেন একটি চিত্র—সৃদপাল খোর্লোর।

বলেই আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বললেন : বুঝতে পারলেন না, তাই না ?

স্বাতি বলল : একেবারেই না।

ভদ্রলোক বললেন : সংস্কৃত ভাষায় নাকি ভবচক্র বলে। জীবনে যে যেমন কর্ম করে, সে তেমনি ফল পায়। বৌদ্ধধর্মের প্রথম অবস্থার একটি ধারণা এই চক্র দিয়ে বোঝানো হয়েছে। ভুটানের অনেক মন্দিরেই আপনি এই রকম ভবচক্র দেখতে পাবেন।

বললুম : মণিচক্র শুনেছি।

হ্যাঁ, মণিচক্র থাকে দেওয়ালের গায়ে সারিবদ্ধ ভাবে। এগুলি চিত্র নয়, এক রকমের গোলাকার আধার, তার মধ্যে মন্ত্র লেখা কাগজ। এমনভাবে এগুলো সাজানো যে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। তাই দর্শনার্থীরা এগুলি ঘুরিয়ে দিয়ে যান। একবার ঘোরালেই লক্ষ মন্ত্রজপের ফল। এই সব মণিচক্রের গায়েও মন্ত্র খোদাই করা থাকে।

ভবচক্রে কী আছে ?

এটি দেওয়ালে আঁকা চিত্র। মাঝখানে একটি ছোট বৃত্ত কর্মে প্রেরণার প্রতীক। হিংসা কাম ও অজ্ঞানতার প্রতীক হল স্নেক কক্ ও হগ্। একটি মনস্টার তার থাবা দিয়ে ধরে আছে এই চক্র। এর অর্থ হল এদের জয় করেই মানুষ ওপরে সূর্যলোক,

মনুষ্যলোক বা দেবলোকে যাবে। তা না পারলে অধঃপতিত হবে নরকে, প্রেত বা পশুদের জগতে। এ সবই ক্ষণস্থায়। মুক্তি আসে সম্পূর্ণ ভাবে অজ্ঞানতা, কাম ও হিংসা বর্জন করে।

বললুম : সংক্ষেপে বলতে গেলে জীবনের একমাত্র কাজ হিংসা ও কাম বর্জন করে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা। মুক্তির পথ।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন : ঠিক তাই।

স্বাতি বলল : একটি ভবচক্র আমাদের দেখতে হবে।

আর আমি বললুম : তার পরে বলুন।

ভদ্রলোক বললেন : অন্যান্য জঙের মতো এখানেও সব কিছু দেখতে পাবেন। চারকোনা উঠোন। দুধারে তিনতলা পর্যন্ত লামাদের ঘর, অন্য দু ধারে উপাসনার ঘর। প্রত্যেক ঘরেই সোনার মূর্তি। বেদীর ওপরে ঘি-এর প্রদীপ, আর দুধারে হাতির দাঁত। দেওয়ালে ফ্রেস্কো, আর ছবি-আঁকা সিল্কের কাপড়। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এই সব দেখতে হয়।

ভদ্রলোক থামতেই আমি বললুম · এবারে পুনাখার কথা বলুন।

পুনাখা খুব কাছেই। ওয়াংদি ফোদ্রং থেকে মাইল দশেকের বেশি হবে না। যখন হাঁটতে হত, তখন একদিনেই যাওয়া যেত। এখন ওযাংদি ফোদ্রঙে অতিথিনিবাস হয়েছে শুনেছি। সেখানে একটা রাত কাটিয়ে পুনাখা ঘুরে আসতে মন্দ লাগবে না।

বললুম : সময় পেলে নিশ্চয়ই যাব।

পুনাখাতেই যে এ দেশের রাজধানী ছিল তা নিশ্চয়ই জানেন।

মো চু আর ফো চু নদীর সঙ্গমের ওপরেই এখানকার জং। এই দুটি নদীর মিলিত ধারাই সঙ্কোশ নামে ওয়াংদি ফোদ্রং হয়ে দক্ষিণে নেমেছে।

আমার ধারণা যে সঙ্কোশ নামটা বাঙলা নাম। এর আগে এই নদী বোধহয় পুনাখা চু ও ওয়াংদি চু নামেই বেশি পরিচিত। গঙ্গাও তার নাম বদলেছে চার বার।

ভদ্রলোক তাঁর ঘড়ি দেখে বললেন : এই সব জঙের ভেতরটা প্রায় একই রকমের। নদীর ওপর একটা পুল পেরিয়ে জঙের বিরাট কাঠের দরজায় পৌঁছতে হয় প্রায় কুড়ি ফুট কাঠের সিঁড়ি ভেঙে। যুদ্ধের সময়ে এই কাঠের সিঁড়ি সরিয়ে নিলেই জঙে ঢোকা সম্ভব হত না। নওয়াং নামগিয়েল প্রথমে এখানেই একটা ছোট জং তৈরি করেছিলেন, পরে তৈরি করেন এটি। জঙের ভেতরে ঢুকেই আশি ফুট উঁচু উচি। পাশের উঠোনে একটি লাখাঙের মধ্যে নওয়াং নামগিয়েলের মরদেহ রক্ষিত আছে একটা সোনা-রূপোর কাস্কেটে। এই মন্দিরটি দেখেন মাচিন জিম্পন ও মাচিন সিম্পন। রাজা ও জেয় খেনপো ছাড়া আর কারও অধিকার নেই এই মন্দিরে ঢোকবার। নিজেদের পদে অভিষিক্ত হবার আগে তাঁদের এখানে এসে আশীর্বাদ নিতে হয়।

স্বাতি বলল : জেয় খেন্‌পো কে ?

ভদ্রলোক বললেন : আগে যিনি ধর্মরাজা ছিলেন, তিনিই এখন জেয খেনপো অর্থাৎ প্রধান লামা। শীতের সময়ে তিনি এসে এখানে বাস করেন। আর আপনারা তো জানেন যে আগে যে দেবরাজার পদ ছিল, সেইপদেইএখন রাজা। হিজ হাইনেস এখন হিজ ম্যাজেস্টি হয়েছেন। কিন্তু দুজনেই দুজনকে সম্মান করেন। তবে রাজার পদ বংশানুক্রমে, আর জেয় খেনপোকে তিন বছর পর বানপ্রস্থে যেতে হয। তখন অন্য একজন লামা আসেন এই পদে।

স্বাতি বলে উঠল : আশ্চর্য নিয়ম।

ভদ্রলোক বললেন : এত বড় পদ থেকে অবসর নিয়ে বাকি জীবন তাঁকে কোন গুহায় কাটাতে হয় ধর্ম চিন্তা করে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর মৃতদেহ মহা সমারোহে এই জঙে এনে সমাধিস্থ করা হয়। উচির নীচের একটি ঘরে আছে লামা পেমা লিঙ্গপার সমাধি।

একটু থেমে বললেন : আর এই জঙে দেশের প্রথম রাজা উগ্যেন ওয়াংচুককে সার উপাধি দিতে এসেছিলেন বৃটিশ দূত ক্লড হোয়াইট এবং তাঁর নাতি জিগমে দোর্জি ওয়াংচুক এখানেই ডেকেছিলেন দেশের ন্যাশনাল আসেম্বলির প্রথম অধিবেশন। একজন ক্ষমতা দখল করেছিলেন আর একজন সেই ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন জনগণকে।

বলেই উঠে দাঁড়ালেন।

আমাদেরও খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমরাও উঠে দাঁড়ালুম। স্বাতি বলল : আপনার কি খুব দেরি হয়ে গেল ?

দেরি! কাজের জন্যে আরও দেরি হবে কিনা জানি না। নমস্কার।

বলে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

২৭

হোটেলের বাইরে বেরিয়ে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলুম। সূর্যের আলোয় দূরের পাহাড়টা যেন রুপোর মতো চিক চিক করছে। মনে হল, রাতে বরফ পড়েছিল। সেই বরফের কুচি এখনও পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে লেগে আছে। বুঝতে পারলুম যে বছরের কোন সময়ে এই পাহাড় বরফে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন একে বরফের পাহাড় বলেই মনে হবে।

বাস স্ট্যাণ্ডে নেমে এসে আমরা কোন ট্যাক্সি দেখতে পেলুম না, তার বদলে খান কয়েক জীপ দাঁড়িয়েছিল। এগুলোও ট্যাক্সির মতো যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করে এবং একজন ড্রাইভার অ্যামবাসাডার গাড়ির চেয়ে তাদের জীপ গাড়িই বেশি বিশ্বস্ত বলে দাবী করল।

আমরা সেমটোকা জং দেখতে যাব শুনে সবাই এগিয়ে এল। আমি পারো ও পুনাখা যাতায়াতের ভাড়াও জেনে নিলুম। পারো এক বেলাতেই দেখে আসা যায়। সকালে একটু তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বেরোলে দুপুরে ফিরে এসে থিম্ফুতেই লাঞ্চ খাওয়া সম্ভব। তবে সবই নির্ভর করে যাত্রীদের ওপরেই। অনেকে জং বা লাখাং দেখতে এত সময় নেন যে তত সময়ে পুনাখা থেকেও ফিরে আসা যায়।

স্বাতি বলল : আজ পারোর কথা থাক। আজ সেমটোকা দেখেই ঘুরে আসি।

বলে একজনের জীপে আমাকে তুলে দিয়ে আমার পাশেই বসল। তিনজনেই সামনে বসলুম। এতে পিছনে ওঠার জন্যে কসরৎ করতে হল না।

শহর থেকে বাইরে যাবার পথ একটাই। যে পথে আমরা এসেছিলুম, সেই পথ ধরেই এগিয়ে গিয়ে নদীর পুল পেরোলুম। তারপর এগোলুম দক্ষিণের দিকে। বাঁ হাতে একটা পথ উপরের দিকে উঠে গেছে দেখেই বুঝতে পারলুম যে এইটেই পুনাখা যাবার পথ। খানিকটা এগোবার পর বোধহয় চেক পোস্ট পাওয়া যাবে।

দূর থেকেই আমরা টিলার মতো উঁচু একটা পাহাড়ের ওপর সেমটোকা জং দেখতে পেলুম। পথের উপর থেকে শ খানেক ফুটের বেশি উঁচুতে নয় এবং থিম্ফু থেকে এর দূরত্বও নয় মাইল পাঁচেকের বেশি। খুব অল্প সময়েই আমরা এই জঙের কাছে পৌঁছে গেলুম।

গাড়ি থেকে নেমেই স্বাতি বলল : একজন ইংরেজী জানা লোক পেলে খুব ভাল হত।

তা হত, কিন্তু সে রকম লোক কোথায় পাওয়া যাবে ?

স্বাতি বলল : এখন তো এই বাড়িতেই লামাদের স্কুল হয়েছে, একজন ইংরেজী জানা লামা কি ধরা যাবে না ?

বললুম : চেষ্টা করে দেখতে হবে।

স্বাতি বলল : আমি এই কথাই বলছি। তোমার কৌশল তো আগে দেখেছি, চেষ্টা

করলেই তুমি একজনকে ধরতে পারবে।

তার কথা শুনে হাসলুম। কিন্তু স্বাতি বলল : হাসছ কেন, আমি কি তোমাকে নতুন দেখছি! স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে চলতে চলতে ট্রেনের যাত্রীকে তুমি চিনে ফেলতে, মানে এমন কম্পার্টমেন্টে উঠতে যেখানে তোমার পছন্দ মতো যাত্রী আছে।

তারপর ?

খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে লক্ষ্য করতে তাকে, তারপর তার দুর্বলতা জেনে নিয়েই আলাপ জমিয়ে ফেলতে।

আমরা খুব ধীরে ধীরে জঙের দিকে এগোচ্ছিলুম। আর স্বাতি বলছিল : এই ভাবে কত কথাই তুমি জেনে নিয়েছ, আর তা বলে আশ্চর্য করে দিয়েছ আমাদের। আমরা ভাবতাম যে সব কথাই বুঝি তোমার জানা।

আর সবজান্তা ভাবতে আমাকে, তাই না ?

বলে আমি হাসলুম।

কিন্তু এখানে আমি খুব সহজে কাউকে ধরতে পারলুম না। দুএকজনকে প্রশ্ন করে ব্যর্থ হবার পর একজন বৃদ্ধ লামা এক তরুণকে ডেকে আমাদের সঙ্গে দিলেন। নিজেদের ভাষায় তাকেই নির্দেশ দিলেন আমাদের সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে। তাঁরই সঙ্গে আমরা এই ছোট জংটি দেখলুম।

তরুণ লামা হিন্দীতে বললেন : প্রথমেই এই জঙের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবেন। অন্য জং বা গোম্পায় যেখানে একসারি মণিচক্র থাকে, সেখানে দেখুন এক সারি চৌকো শ্লেট পাথর, তার ওপরে মুনিদের মূর্তি খোদাই করা আছে। এঁরা সবাই প্রাচীন লামা।

তার পরেই প্রশ্ন করলেন : এখানে তান্ত্রিক লামা ধর্মের যে দুটো ধারা আছে তা জানেন তো ?

স্বাতি বলল : না।

তরুণ লামা উৎসাহিত হয়ে বললেন : গুরু পদ্মসম্ভব এদেশে এনেছিলেন নি্যন্‌মা-পা, আর মগধের নরো পাঞ্চেনের করব্যু-পা তিব্বতে এনেছিলেন মার-পা-লোচাভা। সেখান থেকে ভুটানে। এই সব ছবি এই দুই ধারারই লামাদের। এই দেখুন মূল প্রার্থনা সভার বাইরেই আটজন বৌদ্ধ দার্শনিকের খোদাই করা চিত্র। এঁরা সবাই ভারতীয়।

বলে একে একে চিনিয়ে দিলেন নাগার্জুন, আর্যদেব, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ, ধর্মকীর্তি, আকাশগর্ভ ও স্মৃতিগর্ভ। তারপর তংশাগ, পঁয়ত্রিশ বুদ্ধ।

তারপর মূল মন্দিরের ভিতরে এসে বললেন : মাঝখানে বুঝতেই পারছেন বুদ্ধের মূর্তি। আর এঁরা আটজন বোধিসত্ত্ব।

স্বাতি বলল : এঁদেরও নিশ্চয়ই নাম আছে!

আছে বৈকি।

বলে তাঁদেরও একে একে চিনিয়ে দিলেন : ইনি জাম্পেন ইয়াং, মানে আপনাদের ভাষায় মঞ্জুশ্রী। চানা দোর্জি হলেন বজ্রপাণি, চেন রেজি হলেন অবলোকিতেশ্বর, ঝাম্পা হলেন মৈত্রেয় বুদ্ধ। জানেন নিশ্চয়ই যে মৈত্রেয়র জন্ম এখনও হয় নি, তিনি আগামী কালের বুদ্ধ।

স্বাতি বলল : আর চার জন ?

তরুণ লামা লজ্জিত ভাবে বললেন : এঁদের সংস্কৃত নাম আমি জানি না।

আমি বললুম : অনেক বলেছেন। সব নাম কি আর মনে রাখতে পারব!

তরুণ লামা বললেন : আসুন এই দিকে।

বলে ষোলজন স্থবিরকে দেখিয়ে বললেন : এঁরা সবাই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন নানা জায়গায়।

তারপরেই বললেন : এই জং যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর নাম জানেন তো : তিনি এখানকার প্রথম শবদুং—নওয়াং নামগিয়েল। তিনি ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

কৌতূহল জানাবার জন্য বললুম : সত্যি নাকি!

তরুণ লামাটি বললেন : তা না হলে কি তিনি এই জং তৈরি শেষ করতে পারতেন!

কেন?

তিব্বতের দেসি চঙ্গপা পাঁচজন লামাকে পাঠিয়েছিলেন এখানে। তাঁরা আরও অনেক লোক এনে এই জায়গাটা ঘিরে ফেলে জল বন্ধ করে দিয়েছিলেন। জং যাতে তৈরি হতে না পারে তার জন্যে নানা রকমের উপদ্রব করতে আরম্ভ করেন।

তারপর?

নওয়াং নামগিয়েল যুদ্ধ করে তাদের তাড়িয়েছিলেন। আর শেষ করেছিলেন এই জং নির্মাণ। কিন্তু তিব্বতের দেসি চুপ করে রইলেন না। সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তিনি এই জং দখল করে নিলেন।

নওয়াং হেরে গেলেন?

শুনুন না তার পরের কথা। সৈন্যরা জং দখল করবার কিছু পরেই আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে, আর জঙের ছাদ ভেঙে পড়ল সৈন্যদের মাথার ওপরে। যারা এই জং দখল করেছিল, তারা সবাই সেই জলন্ত ছাদ চাপা পড়ে মারা পড়ল। তারপর শবদুং আবার তৈরি করলেন এই জং।

বললুম : ভারি আশ্চর্যের কথা।

তরুণ লামা খুশিতে উচ্ছল হয়ে বললেন : অলৌকিক ক্ষমতা না থাকলে কি এই রকম হয়!

বললুম : কিছুতেই না।

গল্প করতে করতেই আমরা জঙের বাইরে বেরিয়েছিলুম। এইবারে তরুণ লামাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বিদায় নিলুম।

জীপে উঠে বসতেই ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল : এইবারে পারো যাবেন তো?

বললুম : আজ নয়।

সে বলল : বেলা তো বেশি হয় নি, আজই আপনাদের সব দেখিয়ে আনতে পারব।

বললুম : পকেটে আজ পার্মিট নেই। থাকলে এখানে না এসে পারো দেখতেই চলে যেতুম।

গাড়ি চালাতে শুরু করে সে বলল : তাহলে চলুন, থিম্ফু শহরটাই আজ আপনাদের ঘুরিয়ে দিই।

কোথায় নিয়ে যাবে?

প্রথমে জং দেখতে চলুন। এই জং আর কী দেখলেন! বিরাট ব্যাপার! এক বেলায় দেখতে হলে খুব তাড়াতাড়ি দেখতে হবে।

এবারে স্বাতি বলল : কাল আমরা জং দেখেছি।

ড্রাইভার ঘাবড়ে গিয়ে বলল : দেখা হয়ে গেছে!

তারপরেই নতুন উদ্যমে বলল : তাহলে চলুন, চাঙ্গলি মিথাং আর দেচেন চিলিং প্যালেস দেখবেন।

স্বাতি বলল : চাঙ্গলি মিথাং তো নদীর ধারে। দেচেন চিলিং প্যালেসটা কোথায় ?

ড্রাইভার সোৎসাহে বলল : দ্রিচ্‌লিং দেখবেন ?

এবারে সে দেচেন চিলিং না বলে দ্রিচলিং বলল। কোন্ কথাটা ঠিক, তা জানি নে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু না বলে বললুম : কোথায় তা বলবে তো!

বেশি দূর নয়। নদী পেরিয়ে মাইল পাঁচেক যেতে হবে। পাহাড়ের গায়ে সাদা পাথরে তৈরি এই প্যালেস। কারুকার্য করা কাঠের দরজা জানালাগুলো সব ভুটানের কায়দায় তৈরি। খুব সুন্দর দেখতে। ড্রুক গিয়ালপো থাকেন এইখানে।

আমি বললুম : আমরা গরিব মানুষ, দরকার নেই রাজবাড়ি দেখে।

কিন্তু ড্রাইভার বলল : ভেতরে যেতে তো বলছি না। দেখবেন বাইরে থেকে। পাহাড়ের গায়ে বিরাট কম্পাউণ্ডের মধ্যে ধবধবে সাদা বাড়িটা ঠিক ছবির মতো মনে হবে।

স্বাতি বলল : তা বুঝতে পারছি।

শহরের কাছাকাছি পৌঁছে স্বাতি ড্রাইভারকে বলল : আজ তুমি আমাদের চাঙ্গলি মিথাং দেখিয়ে তোমার স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দাও। কাল আবার দেখা যাবে।

জীপের ড্রাইভার কিছু হতাশ হয়ে আমাদের চাঙ্গলি মিথাং ময়দানের সামনে নিয়ে এল। কিন্তু কথা বলার উৎসাহ তার একটুও কমে নি। বলল : আসুন, আপনাদের সব দেখিয়ে আনি।

বলে গাড়ি থেকে নেমে আমাদের আগে আগে চলল। ভিতরে গিয়ে দেখলুম যে এ একটা খেলার মাঠ। এক ধারে কিছু বসবার জায়গা আছে ছাদের নীচে। শহরের ফুটবল প্রভৃতি খেলা বোধহয় এইখানেই হয়।

ড্রাইভার বলল : বড়লোকদের হেলিকপ্টার এই মাঠেই নামে।

তারপরেই বলল : জানেন, কিছু দিন আগে এই মাঠেই একটা খুব বড় যুদ্ধ হয়েছিল!

স্বাতি বলল : কিছু দিন আগে মানে ?

তা প্রায় একশো বছর আগের কথা হবে। বুড়োদের মুখে আমি সেই যুদ্ধের গল্প শুনেছি।

বলে সেই গল্প আমাদের শোনাল। যুদ্ধ বেধেছিল কে দেবরাজা হবে এই নিয়ে। এই রাজাদের আদি পুরুষ নাকি আগে পারোর পেনলোপ ছিল, সেখান থেকে গিয়েছিল তংসার পেনলোপ হয়ে। আর পারোতে পেনলোপ হয়ে বসেছিল তাঁরই এক আত্মীয়। এদিকে থিম্ফুর জংপন আর পুনাখার জংপন—এই দুজন ছিল এক দলে।

কিন্তু যুদ্ধটা বাধল কেন ?

শুনেছি টাকার জন্যে। বোধহয় ইংরেজই হবে। কর দেওয়া বন্ধ করেছিল বলে জঙের খরচ চলছিল না। লামার সংখ্যা তো কম নয় হাজার তিনেক তো হবেই। কারও খরচ কুলোচ্ছিল না।

তারপর ?

তংসার পেনলোপের বয়স তখন কম। মাত্র চব্বিশ বছর। সে থিম্ফুতে এসে

বলল, টাকা না দিলে চলবে না। এই নিয়েই যুদ্ধ বাধল। কিন্তু বুদ্ধি হল পারোর পেনলোপের । সে বলল,না না যুদ্ধ নয়। একটা মিটিং করে সব ঠিক করা যাক। কিন্তু মিটিঙে কোন ফয়সালা হল না। দুপুরবেলায় ছুটি হল খাওয়া দাওয়ার জন্যে। এই মাঠেই খাওয়া দাওয়া হচ্ছিল। এমন সময়—

বলে জীপের ড্রাইভার থামতেই স্বাতি বলল : কী হল ?

পারোর পেনলোপ তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে সবার ঘাড়ের ওপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুনাখার জংপন তো মারা পড়ল, আর পালিয়ে গেল থিম্ফুর জংপন। সে আবার পুনাখা থেকে সব টাকা-পয়সা নিয়ে তিব্বতে পালিয়ে গেল।

তারপর ?

শুনেছি, সে দলাই লামার সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু দলাই লামা তো বোকা নয়। সে বলল, এ সবের মধ্যে আমি নেই।

আর ইংরেজ ?

ইংরেজ বলল, গোলমালটা তো তংসার পেনলোপই বাধিয়েছিল। তাই দেবরাজা হবার হক তারই। তারপর ইংরেজকে সাহায্য করার জন্যেই নাকি শেষ পর্যন্ত তংসার পেনলোপই দেশের রাজা হয়ে বসল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : এ সব কথা কি তুমি স্কুলে পড়েছ ?

না বাবু, লেখাপড়া আমরা জানি নে। এ সব গল্প আমাদের শোনা। ঠিক কিনা তাও জানি না।

স্বাতি বলল : তোমার বাড়ি কোথায় ?

বাড়ি !

বেশ বুঝতে পারলুম যে লোকটার মন খাবাপ হয়ে গেল। বলল : বাড়ি থাকলে কি আর এই বিদেশে পড়ে থাকি !

স্বাতি বলল : এ তোমার দেশ নয় ?

ড্রাইভার বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল : পেটের দায়ে এখানে পড়ে আছি। আমার দেশ হল নেপাল। সেখানেই আমার সব আত্মীয় স্বজন।

মাঝে মাঝে দেশে যাও তো ?

যেতে আর পারি কোথায়। যে টাকা রোজগার করি বাড়ি পাঠাবার পর কিছুই আর থাকে না। জমাতে পারি না কিছু। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আবার আমরা তার জীপে উঠে বাস স্ট্যাণ্ডে ফিরে এলুম। স্বাতি তার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল : কাল আমাদের পারো নিয়ে যাবে তো ?

ড্রাইভার খুশী হয়েছিল। পরম উৎসাহে বলল : কখন যাবেন ?

এই ধর সকাল আটটার সময় ?

আপনাদের হোটেলে চলে আসব ?

না না, তার দরকার হবে না। আমরা এখানেই আসব।

ড্রাইভার আমার দিকে চেয়ে বলল : আমার নামটা মনে রাখবেন বাবু, জং বাহাদুর নামে সবাই আমাকে চেনে। গাড়ির নম্বরটাও দেখে রাখুন।

স্বাতি হেসে বলল : তোমার কোন ভাবনা নেই।

তারপর হোটেলের দিকে এগিয়ে বলল : লোকটাকে কেন নিলাম জানো ?

জানি। লোকটা তোমার গাইডের কাজ ভাল্ করবে।

স্বাতি হাসল, কোন উত্তর দিল না।

২৮

হোটেলে ফিরে স্বাতি বলল : আর আমরা ইতিহাসের আলোচনা করব না। ইতিহাসের কথা আর ভাল লাগছে না।

বললুম : আমরা কি ইচ্ছে করে ইতিহাসের আলোচনা করি ! পাকে চক্রে ইতিহাসই আমাদের চেপে ধরে।

হোটেলের ম্যানেজার আমাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বললেন : এখানে তো মাছ পাওয়া যায় না, আজ আপনাদের জন্যে মুরগির বিরিয়ানি করেছি, আর কাস্টার্ড পুডিং।

আমি বললুম : অনেক ধন্যবাদ।

কিন্তু স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : মিস্টার লেনদুপ ছেরিং কি চলে গেছেন ?

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ আগে। তিনি আপনাদের গুড উইশেস জানিয়ে গেছেন।

পরে দেখা হলে তাঁকে আমাদের অজস্র ধন্যবাদ দেবেন।

ম্যানেজার আশ্চর্য হয়ে বললেন : কেন বলুন তো !

স্বাতি বলল : তাঁর কাছে আমরা অনেক কথা জানতে পেরেছি।

বেয়ারা এসে কাছে দাঁড়িয়েছিল। নিজের হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে স্বাতি বলল : খেয়ে ওপরে উঠবে ?

বললুম : সেই ভাল।

আমাদের ঘরে কোন আরাম চৌকি নেই বলে দুপুরে আমাকে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করতে হয়। স্বাতি জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। তারপর একখানা চেয়ারে বসে বলল : এখনও তোমার অনেক কাজ বাকি আছে।

কী কাজ বলতো !

ভুটান পর্বেই তুমি তোমার ভ্রমণ শেষ করবে ভেবেছ ! কিন্তু নেপাল আর ভুটানই ভারতের প্রতিবেশী নয়, বাঙলাদেশ পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা এমনকি ব্রহ্মদেশকেও ভারতের প্রতিবেশী দেশ বলা উচিত। এক সময়ে তারাও ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

সভয়ে আমি বললুম : রক্ষা কর। গত কয়েক বছর অনেক ছুটোছুটি করেছি। এবারে একটু স্থির হয়ে আরাম করতে দাও।

স্বাতি হেসে বলল : আন্দামান ও লাক্ষাদ্বীপও তো আমাদের দেখা হয় নি !

সবই যে দেখতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

তবে কি এখন থেকে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য মন্থন করবে ?

কিছু না করে কি আমরা থাকতে পারি না ?

স্বাতি বলল : কাজ ফুরিয়ে গেলে তো বেঁচে থাকার মানেও ফুরিয়ে যায় ! তাই কোন দিন ভেবো না যে আমাদের কাজ ফুরিয়ে গেছে। পুরাকালের মানুষ গার্হস্থ্য জীবন শেষ হয়েছে ভাবলে বনে যেতেন নিশ্চিন্তে আধ্যাত্মিক চিন্তার জন্যে। সেখানে

তাঁদের নতুন জীবন আরম্ভ হত।

হেসে বললুম : এই জন্যেই বুঝি তুমি আমাকে প্রাচীন সাহিত্য পড়তে বলছ ! কিন্তু তার আগে কি আমাদের করবার কিছু নেই ?

স্বাতি বলল : আমরা তো বনে যাব না, তাই সব কাজই আমরা সংসারে থেকেই করব।

এই রকমের এলোমেলো কথা বলে আমরা কত সময় কাটিয়েছিলুম তার খেয়াল রাখি নি। হঠাৎ দরজায় টোকার শব্দ শুনে স্বাতি এগিয়ে গেল এবং দরজা ফাঁক করে নিরাপদকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল : আসুন, আসুন। সময় আমাদের আব কাটছে না।

নিরাপদ বললেন : খুব দুঃখিত যে আমার অবহেলার জন্যেই একটা দিন আপনাদের নষ্ট হল।

তারপর আমাদের পার্মিটখানা স্বাতির হাতে দিয়ে বললেন এটা রেখে দিন। পারো ওয়াংদি ফোদ্রং ও পুনাখার পার্মিট। এবারে পড়িয়ে এনেছি। নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে পড়তে পারবেন।

স্বাতি পার্মিট হাতে নিয়ে সরে এসে বলল : বসুন, একটু গল্প করা যাক।

কিন্তু নিরাপদ বললেন না স্বাতিদি, এখন আমার একটুও সময় নেই। শনিবার বলে আগে ছুটি পেয়েছি। পরে এসে দেবুদার বাড়ি নিয়ে যাব। দেবুদা বিশেষ ভাবে বলেছে।

আমি বললুম : তবে তো যেতেই হবে।

স্বাতি বলল : আপনি আবার কষ্ট করে আসবেন কেন ! কোথায় যেতে হবে বলুন, সময় মতো আমরা বেরিয়ে পড়ব।

নিরাপদ হেসে বললেন : এতো কলকাতা শহর নয় স্বাতিদি, এখানে বাড়ি খুঁজে পাবেন না।

কেন ?

আগে জংখা ভাষাটা শিখে নিন, তারপর বাড়ি খুঁজবেন।

বলে নিরাপদ হাসতে হাসতে বলে গেলেন যে অন্ধকার হবার অনেক আগেই আসবেন, আজ যেন হোটেলেই আমরা তাঁর অপেক্ষা করি।

নিরাপদ সত্যিই দেরি করেন নি। আর একা নয়, তাঁর এক তরুণ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। বাঙালী বন্ধু, থাকে পাশাপাশি ফ্ল্যাটে। ভুটানে কাজ করতে এসেছে একা। নিরাপদ বললেন : আমার সম্বন্ধে যেমন আপনারা নিরাপদে থাকতে পারেন, ওর সম্বন্ধে আপনাদের তেমনি ভাবতে হবে।

স্বাতি বলল : কেন ?

ওর নাম তাপস, কিন্তু কাজে কর্মে ও ঘোরতর সংসারী। দেবু বৌদি বোধহয় ওর জন্যে এতক্ষণ ছটফট করছে।

ওর জন্যে !

ঠিক ওর জন্যে নয়, ওর সাহায্যের জন্যে। মানে মনবাহাদুর যদি না এসে থাকে তো দেবু বৌদিকে হয়তো বাড়িতেই পাওয়া যাবে না। থিম্ফুর পথে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাপসকে।

আমি বললুম : এমন হেঁয়ালি করে কথা বলবেন না ভাই, উদ্বেগে বুকের অসুখ হয়ে যাবে।

তাপসই উত্তর দিল, বলল : আসল কথা কি, দেবু বৌদি মুর্গি কাটতে পারে না, দেবুদাও না। খাঁচায় মুর্গি থাকে, দরকার হলে আমার ডাক পড়ে।

বাধা দিয়ে নিরাপদ বললেন : কথাটা ঠিক হল না। ওকে কষ্ট দেবে না বলে দেবুদা মনবাহাদুরকে ডাকে। কিন্তু আসা-না-আসা মনবাহাদুরের মর্জি। বিশেষ করে শনিবার সন্ধ্যায়।

কেন ?

সেদিন ওর বেসামাল হবার দিন। বাড়ির কথা মনে পড়ে বলে তা ভুলে থাকতে চায়। মোটা বকশিসের লোভও ওকে সেদিন টলাতে পারে না।

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল : ঠিক তাপসের মতো, তাই না ? তিলোত্তমা এসেও ধ্যান ভঙ্গ করতে পারবে না।

তাপস করুণ ভাবে বলল : সেই ভয়েই কেউ কাছে ঘেঁসছে না স্বাতিদি, নামটা বদলে নেব ভাবছি।

দেরি না করে আমরা পথে নেমে পড়লুম। স্বাতি বলল : আজকের সন্ধ্যেটা তাহলে ভাল কাটবে বলে মনে হচ্ছে।

নিরাপদ বলে উঠলেন : কেন বলুন তো !

স্বাতি বলল : ইতিহাস আর ধর্মের কথা শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আজ হাল্কা কথায় খানিকটা আরাম পাব।

নিরাপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই স্বাতি বলল : ওকি !

নিরাপদ বললেন : সে গুড়ে বালি পড়বার ভয় আছে।

কেন ?

দেবুদার এক বড়লোক আত্মীয় নাকি কাল থিম্ফুতে এসেছেন। দেবুদা তাঁদের খুঁজতে যাবেন সরকারী হোটেলে। দেখা পেলে কী হবে জানি নে।

স্বাতি বলল : বড়লোকের ভয় আছে নাকি !

ওরে ব্বাবা ! কিন্তু ভয়টা বড়লোককে নয়, বড়লোকমিকে। মানে, বড়লোকি চালকে।

কাল আমরা যে পথ ধরে হেঁটেছিলুম সেই পথেই চলতে চলতে তাপস বলল : মানে, চাল-চালিয়াতি দেখলে আমাদের ভয় করে।

আমি ভয়ের ভাণ করে বললুম : সেই বড়লোক দাদা দেবুদার বাড়ি আসছেন না তো।

বলে আমি পথের মাঝেই দাঁড়িয়ে গেলুম। নিরাপদ আমার হাত ধরে টেনে বললেন : অত ভয় পাচ্ছেন কেন, আমরা তো আছি ! বিপদ দেখলে পালিয়ে যাব।

আরও খানিকটা পথ এগোবার পর নিরাপদ বললেন : এইবারে রাইট টার্ন্।

বলে মিলিটারি কায়দায় পা ঠুকে ডান দিকে ফিরে নীচের পথ ধরলেন।

স্বাতি এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। এইবারে বেশ গম্ভীর ভাবে নিরাপদকে বলল : আমার একটা কথা রাখবেন ভাই ?

নিরাপদ যেন চমকে উঠেছেন, এইভাবে বললেন : এইরকম গম্ভীর স্বর শুনলেও আমি ভয় পাই স্বাতিদি। এমন খাতির করে না বলে আমাকে সরাসরি আদেশ করুন, কথা রাখতে আমি বাধ্য হব।

স্বাতি বলল : কোন বড়লোকের কাছে আমাদের পরিচয়টা দেবেন না।

নামটাও বলতে পারব না ?

এমন ভাবে বলবেন যেন সত্যিই আমরা আপনার আত্মীয়, আপনাদের কাছেই বেড়াতে এসেছি।

নিরাপদ বললেন : অর্থাৎ গোপালদা যে বই লেখেন, এ কথাটা গোপন রাখতে হবে, এই তো ?

স্বাতি খুশী হয়ে বলল : ঠিক বুঝেছেন।

কিন্তু কেন, তা বলবেন কি ?

বড়লোকেরা ভুল বোঝে ভাই, এ কাজটা সম্মানের চোখে দেখে না।

সহসা গম্ভীর হয়ে নিরাপদ বলল : কোন বড়লোকের সঙ্গে দেখা হলে বাজিয়ে আপনার কথাটা যাচাই করে নেব।

খানিকটা নেমেই আমরা এক সারি এক তলা বাড়ি দেখতে পেলুম। পাশাপাশি কয়েকটা বাড়ি। মনে হল যে এই বাড়িগুলি সরকারী কর্মচারীদের আবাস। নিরাপদ একটা বাড়ির ডান দিকের দরজার সামনে এসে হাঁক দিল : বৌদি !

বাড়ির সামনে আমি নেম প্লেট দেখতে পেলুম। তাতে দেবুদার নাম লেখা। বৌদি ছুটে এসে দরজা খুলে দিলেন, তারপর তাপসকে দেখতে পেয়েই খুশিতে উচ্ছল হয়ে বলে উঠলেন : তুমি এসে গেছ ভাই ! বাঁচালে আমাকে !

নিরাপদ বললেন · দেখলেন তো স্বাতিদি, .আমরা যেন কেউই নই।

দেবু বৌদি লজ্জিত ভাবে বললেন : আসুন, ভেতরে আসুন।

তারপর নিরাপদর দিকে চেয়ে বললেন · তোমার দাদার আক্কেলটা একবার দেখ। মন বাহাদুর আসবে বলে সেই যে কেটে পড়েছেন, কাজের সময়ে টিকিটি আর দেখতে পাবে না।

নিরাপদ এবারে আমার দিকে চেয়ে বললেন : দেখলেন গোপালদা, আমি একেবারে খাঁটি কথা বলেছিলাম কিনা ! যাই, আমি যখন আপনাদের ডেকে এনেছি, তখন আমিই আপনাদের পরিচর্যা করি। বসুন আপনাবা।

বলে একটা সোফায় আমাদের বসিয়ে দিয়ে তাপসকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল কয়েক কাপ কফি নিয়ে। বললেন : আসুন. রান্না চড়তে তো দেরি আছে। গলাটা আমরা ভিজিয়ে নিই।

দেবু বৌদি মুখ বাড়িয়ে বললেন : তাপসের কফিটা ঢেকে রেখো ভাই।

আপনাদেরটাও ঢেকে রাখছি।

এই সময়ে বেল বাজতেই নিরাপদ এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন এবং সরে দাঁড়ালেন এক পাশে।

তোমরা এসে গেছ !

বলে ঘরে ঢুকলেন দেবুদা। তাঁর সঙ্গে এক শৌখিন দম্পতি। বয়সেও দেবুদার চেয়ে অনেক বড় বলে মনে হল। তাঁদের দিকে চেয়ে বললেন : আসুন।

আমরা উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। সোফাটা ছেড়ে দিলুম তাঁদের। দেবুদা তাঁর স্ত্রীকে ডেকে এনে পরিচয় কবিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় করাবার সময়ে বললেন : ইনি বই লেখেন। ভ্রমণ কাহিনী। বেড়াতে এসেছেন এখানে। আর ইনি, কী বলব—

আমি নমস্কার করে বললুম : কিছু বলতে হবে না, আমি বুঝতে পারছি।

মিস্টার মল্লিক বললেন : বাঙলায় লেখেন, না ইংরেজীতে ?

বললুম : বাঙলায়।

ভদ্রলোক সোফার এক ধারে বসে বললেন : সরি, বাঙলা বই আমি পড়ি না।

নিরাপদ এক কাপ কফি তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন : তার জন্যে লজ্জা পাবার কারণ নেই। বাঙালীরা আজকাল বাঙলা বই পড়েন না।

ভদ্রলোক একবার কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন নিরাপদর দিকে, তারপর দেবুদাকে বললেন : কিছু খাবার কথা তো ছিল না!

নিরাপদই উত্তর দিল : এটাতো খাবার নয়! ভাল না লাগলে রেখে দেবেন।

মিসেস মল্লিক স্বাতির সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি কোন আপত্তি না করে কফির পেয়ালাটি হাতে নিলেন।

দেবু বৌদি বাড়ির ভিতরে চলে গিয়েছিলেন। নিরাপদ একটা মোড়া এনে মিস্টার মল্লিকের সামনে বসে বললেন : সম্প্রতি ভাল বই কী পড়েছেন?

সম্প্রতি?

বলে ভদ্রলোক ভাবতে লাগলেন।

নিরাপদ বললেন : থাক, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। ছেলেমেয়েদের বাঙলা স্কুলে পড়াচ্ছেন না তো!

কেন বলুন তো!

মানে, বাঙলা স্কুলে পড়ালে ইংরেজী ভাল শেখে না। গোড়া থেকে ইংরিজি শিখলে, আর ইংরিজি স্কুলে শিখলে, ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়ায়।

মিস্টার মল্লিক বললেন : ঠিক বলেছেন। বাড়িতেও বাঙলায় কথাবার্তা বলা উচিত নয়। সেই যে একটা কথা আছে—স্বপ্নও দেখতে হবে ইংরিজীতে! একেবারে খাঁটি কথা।

নিরাপদ এমন ভাবে বসেছিলেন যে মিসেস মল্লিকের কথাও শুনতে পাচ্ছিলেন। এক আধটা কথা আমারও কানে আসছিল। হঠাৎ একটা মন্তব্য শুনে আমি উৎকর্ণ হলুম। ভদ্রমহিলা বলছিলেন : আপনাদের কথা আমি এক বন্ধুর কাছে শুনেছি। ব্যাপারটা কী জানেন? এ সব কথা বেশি দিন চাপা থাকে না।

আমি স্বাতির দিকে চেয়ে দেখলুম যে সে কোন কথা না বলে ভদ্রমহিলার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আর তিনি বলেই ফেললেন : আপনাদের যা সম্পর্ক, তাতে এ ভাবে মেলামেশা ভাল হচ্ছে না।

স্বাতি কোন প্রতিবাদ করল না। আর লক্ষ্য করলুম যে নিরাপদ তাঁর কঠিন দৃষ্টি সরিয়ে আনলেন মিস্টার মল্লিকের দিকে। বললেন : আমাদের দেবুদাকেই দেখুন না, এই ভয়ে তিনি ছেলেমেয়েদের এখানে রাখেন নি। এখানে রাখলে হয় হিন্দী শিখত, নয় জংখা। মানে বিপদজনক ব্যাপার। করে খেতে হবে তো তাদের, তাই ইংরিজি না শিখলে চলে! ভাল ছেলেমেয়েরা তো এখন বিদেশে পড়তে যাচ্ছে—শুধু ডক্টরেট নয়, নোবেল প্রাইজ নিতে হচ্ছে অ্যামেরিকায় রিসার্চ করে। এই পোড়া দেশে কি যোগ্যতার কোন রেকগ্নিসন আছে!

ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন : একেবারে আমার মনের কথাটি বলেছেন।

বলে কফির কাপ নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন : আজ উঠতে হচ্ছে, একটা পার্টিতে যেতে হবে।

ভদ্রমহিলা মিস্টার মল্লিকের দিকে চোখ রেখেছিলেন। নিজের কাপে বোধহয় একটা চুমুকও দেন নি। সেটা নামিয়ে রেখে বললেন : আজ একেবারেই সময় নেই। মিস্টার বিশ্বাস জোর করে টেনে আনলেন বলেই আসতে হল। চলি।

বলে মিস্টার মল্লিকের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

দেবুদা তাঁর স্ত্রীকে ডাকতে গিয়েছিলেন বাড়ির ভিতরে। কিন্তু তিনি এসে পৌঁছবার আগেই মিস্টার মল্লিকরা চলে গেলেন।

নিরাপদ দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন : তাপসের কাজ বোধহয় হয়ে গেছে। ওদের জন্যে আর একবার কফি তৈরি করি রান্না চড়বার আগে। আর সেই সঙ্গে মেনুটাও দেখে আসি।

বলে অন্তঃপুরে ঢুকে গেল।

দেবুদা বেরিয়ে গিয়েছিলেন মিস্টার মল্লিকদের এগিয়ে দিতে। সদর রাস্তায় বোধহয় তাঁদের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। কিংবা ট্যাক্সি। এই অবকাশে স্বাতিকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : ভদ্রমহিলা কী পরামর্শ দিচ্ছিলেন ?

স্বাতি কোন উত্তর না দিয়ে হাসল।

বললুম : শুনেছি। তুমি কোন উত্তর দিলে না কেন ?

প্রয়োজন বোধ হল না।

কেন ?

মনে যাদের ময়লা, তারাই ঐ রকম ভাবে।

নিরাপদ তাপসকে নিয়ে ফিরে এল। তার হাতে গরম কফির কাপ। ধোঁয়া উঠছে। আর এক কাপ কফি নিরাপদ ঢেকে রাখল। বলল · বৌদিও আসছে । রান্না চড়িয়েছে প্রেসার কুকারে, কফি খাবার সময়ে কান পেতে রাখবে বাঁশির শব্দের জন্যে। ঘড়ি আছে এই ঘরের টেবলেই।

স্বাতি হাসল দেখে বলল : আপনি হাসছেন স্বাতিদি ! এ সব কাজ আমাদেরও শিখতে হয়েছে এ দেশে এসে। এই দেশে বাস কতকটা নির্বাসনের মতো, আপনারা এলে আমাদের ভাল লাগে।

এই সময়ে দেবু বৌদিও কতকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ঘরে এলেন, বললেন : আমার কফি কোথায় ?

নিরাপদ কফির কাপ তাঁর হাতে ধরিয়ে দিল। তারপর তিনি স্বাতির দিকে চেয়ে বললেন : এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম। মাংস বাদে আর সব কিছু সকালেই রেঁধে রেখেছিলাম। মুর্গি কেটে দেবার কেউ ছিল না বলেই দেরি হল।

তাপস বলল : কাল আমাকে খবর দেন নি কেন ? অফিসে যাবার আগেই তাহলে কেটে দিয়ে যেতাম।

বৌদি বললেন : সব দোষ তোমাদের দাদার। তিনিই মনবাহাদুরকে পাঠাবেন বলেছিলেন।

নিরাপদ বললেন : আর আমি সব জেনেও মজা দেখবার জন্যে তাপসকে কিছু না বলে এঁদের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম।

বেশ লোক যাহোক।

মাঝে থেকে তাপসের দাম বাড়ল।

এই সময়ে দেবুদা ফিরে এলেন। ধপাস করে একখানা চেয়ারে বসেই বলে উঠলেন : একটা কর্তব্য চুকল।

নিরাপদ বললেন : কী রকম ?

দেবুদা বললেন : আমার এক সম্পর্কে দাদা টেলিফোনে খবর দিয়েছিলেন মল্লিক সাহেব এখানে আসছেন বলে। তাকে একটু সাহায্য করতে হবে। গিয়ে দেখলাম ওরে বাবা, কে কার সাহায্য চায় ! হোটেলের বারে বসে দুজনেই টানছেন। দাদার খাতিরেই

আমি এঁদের টেনে আনলাম। ওফ্‌।

বলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন দেবুদা।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : এখানে আপনাদের কেমন লাগছে ?

দেবু বৌদি বললেন : আমাকে জিজ্ঞেস করুন।

তাই করছি। উত্তরটা আপনিই দিন।

ভদ্রমহিলা বললেন : এখান থেকে ইনি ছাড়া পেলে আমি বেঁচে যাই। কলকাতায় ফিরে কালীঘাটে পুজো দেব আগে।

স্বাতি বলল : কিন্তু আমাদের তো বেশ ভাল লাগছে !

তিনি বললেন : কিছুদিন আমাদেরও ভাল লেগেছিল। এখন পালাই পালাই করছি।

কেন ?

সপ্তাহে এক দিন বাজার। সেদিন হাজার কাজ থাকলেও সব গুছিয়ে কিনে আনতে হবে। মাছ তো পাওয়াই যায় না, তাই ভরসা এই জ্যান্ত মুরগি আর ডিমের ওপরে।

নিরাপদ বললেন : এই ভাবে নিন্দে করবেন না বৌদি। পুনাখার নদীতে বড় বড় ট্রাউট মাছ আছে। ইচ্ছে করলে ধরে আনতে পারেন।

দেবুদা হাসতে হাসতে বললেন : একবার নাকি মহারাজা সেখানে জাল ফেলে নদীর মাছ ধরেছিলেন। সেই মাছ খাবার গল্প অনেকের কাছে শুনেছি।

নিরাপদ বললেন : মাংস এখন রোজই পাওয়া যায়। ইন্দুবাবু রোজ মাংস খাচ্ছেন—তাজা মাংস।

মাংসের নামে বৌদি যেন আঁৎকে উঠলেন, বললেন : মাংস খাবার কথা আমাকে বলবেন না।

তারপর স্বাতিকে বললেন মৃদু স্বরে : আমার পাশেই এক ভুটিয়া পরিবার আছেন।

বাধা দিয়ে দেবুদা বললেন : ভুটিয়া বোলো না, বল বুট্‌নিজ। এ দেশে তিব্বতীদের ভোটিয়া বলে।

ঐ হল।

বলে তিনি বললেন : এরা ছোট বড় নানা রকমের মাংস কিনে এনে রোদে শুকিয়ে রাখে। সে সময়ে যে গন্ধ পাই, তাতে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে।

কিন্তু মানুষগুলো ভাল নয় কি ! সারাক্ষণ হাসি মুখ !

আর পানের রসে টুকটুক করছে ঠোঁট !

কথার মাঝখানেই প্রেসার কুকারের বাঁশি বাজল। বৌদি ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন : আর দশ মিনিট।

কিন্তু দেবুদা বললেন : পনের মিনিট রাখো।

সে আমি বুঝব।

আর কী আছে ?

বৌদি বললেন : ফ্রায়েড রাইস, আর চাট্‌নি।

কোনও সুইট ডিশ নেই ?

দুধ নেই তো, তাই পায়েস করেছি টিনের দুধে।

নিরাপদ বললেন : গ্র্যাণ্ড্ ব্যাপার।

তারপর তাপসের দিকে চেয়ে বললেন : কাল সন্ধ্যায় আমরা কিছু করতে পারব না তাপস ?

তাপস লাজুক ছেলে। সারাক্ষণ মাথা নীচু করেই আছে। এইবারে বলল : পারব না বলে কোন কথা নেই।

সাবাস !

বলেই নিরাপদ আমাদের বললেন : কাল সন্ধ্যেবেলায় তাহলে গরিবের কুটিরে আপনাদের সবার পায়ের ধুলো পড়ছে। আমি গিয়ে আপনাদের টেনে আনব।

আমি কোন উত্তর দিতে পারলুম না। স্বাতি হাসল। থিম্ফুর এই সন্ধ্যাটি আমাদের আনন্দে কাটল।

২৯

পরদিন সকালেই আমরা পারো যাত্রা করলুম। জীপের ড্রাইভার জং বাহাদুর যে হোটেলের বাইরে পায়চারি করছিল তা আমরা জানতে পারি নি। আমরা বেরিয়ে আসতেই সে একটা নমস্কার করে আমাদের সঙ্গে চলতে লাগল।

স্বাতি বলল : আমরা যে পার্মিট পেয়েছি, তা তুমি জানলে কী করে ?

জং বাহাদুর বলল : চাইলেই তো পার্মিট পাওয়া যায় ! আর থিম্ফু এসে পারো না দেখে চলে যাবেন এ হতেই পারে না।

স্বাতি হেসে বলল : তুমি খুব বুদ্ধিমান।

আমরা নীচে নেমে এসে তার গাড়িতে উঠে বসলুম। দুজনেই সামনে বসলুম। ড্রাইভার ও স্বাতির মাঝে আমি। স্বাতি তার ডান হাতে একটা হাতল চেপে ধরে বসল। পিছনে বসলে চারি দিকের দৃশ্য ভাল দেখা যায় না। সামনে বসবারও সুবিধে। আর দেখা যায় ভাল।

গত রাত্রে বৃষ্টি হয় নি। পাহাড়ের রঙ বদলে গেছে। শ্যামল বলব, না নীলাভ ধূসর তা জানি না। দূরত্বের জন্যে গাছপালা দেখতে পাওয়া যায় না। সেই গাছপালা পাহাড়ের রঙ আর আকাশের সঙ্গে কখনও মিলে যায়, কখনও হাল্কা মেঘে ঢেকে যায়। পরিচ্ছন্ন পথে আমরা শহর ছেড়ে বাইরে চলে এলুম। এই পথ ধরেই আমরা ফুনছোলিঙ থেকে এসেছি।

সকালবেলায় আমি খানিকক্ষণ পড়বার সময় পেয়েছিলুম। পারো ও তার কাছাকাছি দর্শনীয় স্থানের ইতিহাস আমি পড়ে ফেলেছি। তিব্বতের মানুষ এই দিকেই এসেছে বেশি, এই দিকেরই উন্নতি হয়েছে আগে। জং ও লাখাঙের সংখ্যা এ দিকেই অনেক বেশি।

স্বাতি বলল : তুমি কী ভাবছ বলতো !

বললুম : পারো উপত্যকার কথাই ভাবছি।

সকালে তো অনেক কিছু পড়েছ, চলতে চলতে তার কিছু শোনাও না !

বললুম : বেশ বুঝতে পেরেছি যে সেকালে ভুটানে আসার পথ ছিল এই দিক দিয়ে। অন্য দিকে থাকলেও তা এ দিকের মতো সুবিধাজনক ছিল বলে মনে হয় না। তিব্বত থেকে সরাসরি এই উপত্যকায় আসার পথের কথা জানি না। তবে কিছু দিন আগেও লোকে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা থেকে ভুটানের হা উপত্যকায় আসত। সেখান থেকে পারো উপত্যকায়। কিন্তু হা উপত্যকায় কেউ বসবাস করত না।

এ কথা কেন বলছ ?

বলছি এই জন্যেই যে হা উপত্যকায় একটি মাত্র ছোট জং ছিল, সেটির জায়গায় একটি নতুন জং তৈরি হয়েছে এই শতকেরই গোড়ার দিকে। তার মধ্যেই এখন রয়াল ভুটান আর্মির ট্রেনিং স্কুল হয়েছে। এই উপত্যকাটি ছিল কালিম্পঙের দোর্জি

পরিবারের সম্পত্তি। এঁরা ভুটানেরই মানুষ, কিন্তু বাস করতেন কালিম্পঙে। সবাই এঁদের ভুটানের প্রধানমন্ত্রী বলত। কিন্তু আসলে এই রাজ্যে এ নামের কোন পদ ছিল না। তিনি ভুটান সরকারের একজন পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন এবং পররাষ্ট্রের কাজ দেখতেন।

নরি রুস্তমজীর লেখা আমার মনে পড়ে গেল। জিগমি দোর্জি তাঁর পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি গভর্নমেণ্টের এজেণ্ট হয়েছিলেন। যে কথা তাঁর লেখায় নেই আজ আমি তা ইতিহাসে পড়েছি। ১৯৬৪ সালে আততায়ীর হাতে তিনি প্রাণ হারিয়েছেন।

স্বাতি বলল : আমি এ কথা কোন ভ্রমণ কাহিনীতে পড়েছি।

কী পড়েছ ?

স্বাতি বলল : এই হত্যার ব্যাপারে রাজার হাত ছিল বলে নাকি রানীর সন্দেহ ছিল। রানী তো তাঁর ছোট বোন ছিলেন!

বললুম : না। এ রকম কথা আমি কোথাও পড়ি নি।

স্বাতি বলল : এই ভ্রমণ কাহিনীতেই আমি আর একটা কথা পড়েছি।

কী কথা ?

রাজা নিজে মারা গেছেন আফ্রিকার নাইরোবিতে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : সেখানে তিনি কেন গিয়েছিলেন ?

স্বাতি বলল : তা জানি না, তবে মারা গেছেন হার্ট অ্যাটাকে। অর্থাৎ মৃত্যুটা আকস্মিক হলেও স্বাভাবিক কারণে।

কার লেখা মনে করতে পার ?

কোন পত্রিকায় না বই-এ পড়েছি, মনে পড়লে বলব।

আমি বললুম · ইতিহাসে পড়লুম যে হা উপত্যকাব সব কিছু এখন রাজমাতার সম্পত্তি। অর্থাৎ বড় ভাই-এর সম্পত্তি তিনিই পেয়েছেন।

তাঁর কি কোন উত্তরাধিকারী ছিল না ?

জানি না।

এর পর কিছুক্ষণ নীরবে চলবার পর স্বাতি বলল এইবাবে পারোর কথা বল।

বললুম : পাবোর কথা বলবার আগে তিব্বত থেকে ভুটানে আসার পথটা খুঁজে বার করতে হবে।

আমরা কথা বলছিলুম বাঙলায়। স্বাতি হঠাৎ ইসাবায ড্রাইভাবকে দেখিযে বলল ওকে জিজ্ঞেস করবে ? হয়তো জানে।

বললুম : পাহাড়ের পথে ওর সঙ্গে কথা বলা কি উচিত হবে ?

তার পরেই একটা জঙের কথা মনে পড়ে গেল। তার নাম দ্রুক গিযেল জং। আজ সকালেই পড়েছি যে এই জংটি পারো থেকে মাইল দশেক দূরে একটা পাহাড়ের ওপরে। এই জং থেকে যে পথটি দেখা যায় সেই পথে আগে তিব্বতে যাতাযাত কবা যেত। তিব্বতের সঙ্গে একটা যুদ্ধের পরে নওয়াং নামগিযেল এই জংটি নির্মাণ কবেছিলেন তিব্বতী সেনার অতর্কিত আক্রমণ লক্ষ্য করবার জন্যে। তিব্বতীরা নাকি বার বার এই পথে আসত ভুটান আক্রমণে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল · মনে পড়েছে বুঝি ?

বললুম : হ্যাঁ। পারো থেকে মাইল দশেক দূরে দ্রুক্ গিয়েল জং থেকে তিব্বতের ফারি নামে একটা জায়গা দুদিনেই পৌঁছনো যেত হেঁটে। তিব্বতীরা সেই পথেই আক্রমণ করত। আর একশো বছর আগে চীনের সম্রাট তংসার পেনলোপকে যে

উপহার পাঠিয়েছিলেন তা এই পথেই এনেছিল তাঁর প্রতিনিধি দল।

স্বাতি বলল : তবে তো বোঝাই যাচ্ছে যে মধ্য ভুটানে আসবার কোন সোজা পথ তখন ছিল না।

ঠিক কথা। দলাই লামা একবার চুম্বি উপত্যকা দিয়ে আর একবার অরুণাচল প্রদেশের ভেতর দিয়ে ভারতে এসেছিলেন বলে আমার মনে হয়েছিল যে তিব্বত থেকে ভুটানের ভেতর দিয়ে আসার কোন পথ বোধহয় নেই।

স্বাতি বলল : পারো থেকে তো বেশি দূরে নয়, এই জং দেখতে গেলেই পথটা জানা হয়ে যাবে।

বললুম : বছর কয়েক আগে এই জং পুড়ে গেছে, তারপর আর মেরামত করা হয় নি।

তাহলে বোধ হয় তিব্বতে যাবার পথও বন্ধ হয়ে গেছে। সে পথ থাকলে সেখানেও একটা মিলিটারি ট্রেনিং স্কুল খোলা হত।

বলে স্বাতি হাসল।

পুরনো পথ ধরে আমরা নেমে আসছিলুম। এ পথে এখনও কোন চেক পোস্ট পাই নি। থিম্ফু চু আর পারো চুর সঙ্গমকে এখানে ছুজম বলে, ইংরেজী নাম কনফ্লুয়েন্স। থিম্ফুতে আসবার সময়ে এই জায়গাটা আমরা দেখেছি। এই পথের প্রথম চেক পোস্ট এখানেই। পারো চুর উপত্যকা ধরে এগোতে হলে এখানেই পার্মিট দেখাতে হবে।

স্বাতি বলল : কনফ্লুয়েন্সে বোধহয় আমাদের পার্মিট দেখাতে হবে।

বললুম : তাই মনে হচ্ছে।

দূরত্বটা মনে আছে?

হিসেব করে বললুম : তা কুড়ি মাইলের মতো হবে।

সেখান থেকে পারো কত দূরে?

মাইল পনেরো।

স্বাতি এবারে হিসেব করে বলল : পঁয়ত্রিশ মাইল পেরোতে আমাদের দু ঘণ্টার বেশি সময় লাগা উচিত নয়।

বললুম : এ রকম ভাল রাস্তায় তার বেশি লাগবে না কনফ্লুয়েন্সে পৌঁছতে। সত্যিই আমাদের এক ঘণ্টা সময় লাগল না। গাড়ি এসে পাহাড় ঘেঁসে দাঁড়াল নদীর এপারেই। পার্মিট চেক হবার পরে ওপারে যেতে পারা যাবে। এ কাজটা এবারে খুব সহজেই হয়ে গেল। যাত্রীর ভিড় তো নেই, শুধু আমরাই দুজন।

পার্মিট চেক হবার পরে দুই নদীর সঙ্গমের শোভা আমরা আবার দেখলুম। পশ্চিমের পারো উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে এসেছে পারো চু—পশ্চিম থেকে পূর্বে। থিম্ফু চু নেমেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। সঙ্গমের কাছে সেই ছোর্তেনটিও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই দৃশ্য আমরা বেশিক্ষণ ধরে দেখলুম না। পারোয় আমাদের অনেক কিছু দেখবার আছে বলে আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এসে জীপে উঠলুম আগের মতো করেই। ড্রাইভার এতক্ষণ পান খাচ্ছিল বলে কথা বলতে পারে নি। এইবারে বলল : থিম্ফু আসার পথে তো এই জায়গা দেখেছেন, নদী পেরোলেই নতুন পথ। নদীর ধারে ধারেই এই পথ পারো পৌঁছে যাবে।

বলে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে যাত্রা শুরু করল।

এখানে আসার সময় জেনেছিলুম যে কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে হা উপত্যকায় যাওয়া যায়। কিন্তু হা থেকে পারো সরাসরি আসারও একটা পথ আছে। আগে এটি

পায়ে চলার পথ ছিল। এখন নিশ্চয়ই সে পথেও গাড়ি চলে। ভাবলুম যে এক সময়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করেই এ কথাটা জেনে নেব।

নদীর পুল পেরিয়ে খানিকটা এগোবার পরেই আমরা পারোর প্রশস্ত উপত্যকায় পৌঁছে গেলুম। স্বচ্ছ জলের নদীটি পাথরের বুকের উপর দিয়ে নেচে নেচে বয়ে আসছে। কিন্তু জীপের শব্দে তার কলধ্বনি কানে আসছে না। উপত্যকাটি ক্রমেই প্রশস্ত হতে লাগল, আর দুধারের পাহাড় সরে যেতে লাগল দূরে।

আরও অনেকটা পথ এগিয়ে এসে ড্রাইভার পথের ধারে জীপ দাঁড় করাল। তাই দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : কী হল ?

ড্রাইভার তার সীট থেকে নেমে পড়েছিল, বলল : এইখান থেকে পারো শহরটা দেখে নিন।

এ কথা শুনেই স্বাতি নেমে পড়ল। আমিও নামলুম। দেখলুম। পথের নীচেই কিছু ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে। তারপরেই পারো নদী এঁকে বেঁকে বয়ে আসছে পাহাড়ের নীচে দিয়ে। ওপারের পাহাড়ের গায়েও ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। আর মেঘের পিছনে যেন বরফের পাহাড় দেখতে পাচ্ছি। এই সুন্দর দৃশ্য যখন আমরা দু চোখ ভরে দেখছিলুম তখন ড্রাইভার বলল : ওই যে চারকোণা বিরাট বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটাই পারোর জং। আর ওপরের ঐ ছোট গোল বাড়িটিও একটি জং ছিল, এখন পারোর জাদুঘর। পুলের ওপর দিয়ে আমরা ওপারে গিয়ে ওই পাহাড়ে উঠব।

স্বাতি বলল : পেছনে যে বরফের পাহাড় তা কোন তুষারশৃঙ্গ বলে মনে হচ্ছে না।

কেন বলতো ?

থিম্ফুতে যেমন দেখেছিলাম, সেই রকমই মনে হচ্ছে। বৃষ্টির জলই বোধহয় বরফের মতো জমে আছে।

বললুম : অনেকটা দূর এগিয়ে গেলে বোধহয় চোমলহরির বরফ দেখা যাবে।

স্বাতির ক্যামেরা তার কাঁধে ছিল, বলল : একটা ছবি নেওয়া যাক।

বলে সে একটা ছবি তুলে নিল।

ভয়ে ভয়ে বললুম : যদি তোমার ক্যামেরাটা ধার দাও, তাহলে এই দৃশ্যকে পেছনে রেখে তোমার একটা ছবি তুলে রাখি।

স্বাতি হাসল। বলল : নাও।

বলে ক্যামেরাটা হাতে দিতেই আমি খানিকটা দূরে গিয়ে এই দৃশ্যেরই ছবি নিলুম স্বাতিকে এক পাশে রেখে। কোন প্রাণী না থাকলে প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রাণ আসে না বলে আমার মনে হয়।

জীপে উঠে আমরা আবার এগোলুম।

শহরে এসে ড্রাইভার আবার এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাল। বলল : আজ আপনাদের ভাগ্য খুব ভাল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : কেন বলতো !

ততক্ষণে সে নেমে পড়েছিল, বলল : আজ এখানে তীর ধনুকের খেলা হচ্ছে।

মানে আর্চারি কম্পিটিশন !

হ্যাঁ। মাঝে মাঝেই এই রকমের খেলা হয়। বিদেশীরা এলে এই খেলা দেখতে চায়। খুব খুশী হয় খেলা দেখে।

আমরাও নেমে পড়লুম। তারপর গাছে ঘেরা একটি ছোট মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। নানা রঙের পোশাক পরে অনেক মেয়ে পুরুষ দু ধারে সারিবদ্ধ ভাবে

দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। বড় বড় ছাতা খোলা আছে রঙ বেরঙের। তার নীচেও দর্শক। এক দিক থেকে তীর ছোঁড়া হচ্ছিল। আমরা তাই সাবধানে এসে দাঁড়ালুম।

ভুটানে বন্দুক আসবার আগে তীর ধনুক নিয়েই যুদ্ধ হত। কিছু দিন আগেও নাকি এখানকার মানুষ ভাল তীর ছুঁড়তো। তাই এই আর্চারির খেলা এ দেশে বেশ জনপ্রিয়। বাজারে নাকি তীর রাখার তূণ বিক্রি হয়। বিদেশীরা কিনে নিয়ে যায় সুভেনির হিসেবে।

আর্চারির নিয়ম কানুন আমরা জানি না, বুঝিও না কিছু। এমন কাউকেও দেখতে পেলুম না যাকে জিজ্ঞেস করে কিছু জেনে নিতে পারি। তবে মনে হল যে এটি গুটিঙের মতো কোন খেলা। যারা বোঝে, তারা দেখে আনন্দ পায়। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর আমরা ফিরে এলুম।

ড্রাইভার বলল : ভাল লাগল না বুঝি ?

আমি সত্যি কথাই স্বীকার করলুম · কিছু বুঝি না বলেই ভাল লাগল না।

তবে ফিরে আসার আগে স্বাতি একখানা ছবি তুলে নিয়েছিল।

এরপর আমরা পারোর বাজার এলাকা দেখলুম। রাস্তার দুধারে কিছু দোকানপাট। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বোধহয় আছে, কিন্তু ক্রেতার ভিড় নেই। ড্রাইভার একটা দিকে নির্দেশ করে বলল : এই দিকে মহারানীর ডোরিনা প্যালেস।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : মহারানীর প্যালেস ?

হ্যাঁ। মহারাজা এখানে এলে তো জঙে থাকেন, কিন্তু মহারানী থাকেন এই প্যালেসে।

কেন ?

জঙে থাকার নিয়ম তো নেই ! শুধু যুদ্ধ বাধলে মেয়েরাও এই জঙে আশ্রয় নিতে পারে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু আমি কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

নদীর পুল পেরোবার আগে পথের ধারে কয়েকটি ছোর্তেন চোখে পড়ল। কতকটা মন্দিরের মতো দেখতে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশের জন্যে কোন দরজা নেই। বাইরে দাঁড়িয়েই প্রণাম জানাতে হয়।

এর পরে নদীর পুল পেরিয়ে আমরা পাহাড়ে ওঠার পথ ধরলুম। দূর থেকেই বুঝতে পেরেছিলুম যে বেশি উপরে আমাদের উঠতে হবে না। পারোর উচ্চতা ৭৭৫০ ফুট। এই উচ্চতা কোন্ জায়গার তা বলতে পারব না। কিন্তু নদীর ধার থেকে পাহাড়ের চূড়ার উচ্চতা দু হাজার ফুট হতে পারে। কিন্তু জঙের উচ্চতা শ পাঁচেক ফুটের বেশি হবে না। এর অনেক উপরে মিউজিয়ম। সেটির উচ্চতা হাজার ফুটের কম হবে না। এ সবই আমার অনুমানের কথা। চোখে দেখে অনুমান। ইতিহাসের বইয়ে পড়েছি যে পারো জংটিই সাত হাজার ফুট উঁচুতে। তাহলে মিউজিয়মের উচ্চতাই সাড়ে সাত হাজার ফুট হবে। তার ওপরে কী আছে তা জানি নে। কিছু নিশ্চয়ই আছে। কিংবা ঐ মিউজিয়মের উচ্চতা হবে ৭৭৫০ ফুট।

ড্রাইভার আমাদের বলল যে এই জঙের নাম রিনচেন পঙ জং,মানে স্তূপাকৃত রত্ন এবং এটিও নির্মাণ করেছেন নওয়াং নামগিয়েল। মনে হল যে পাথরে তৈরি এই দুর্গটি খুবই মজবুত। কাঠের দরজা জানালায় নানা কারুকার্য। রঙও নানা রকম। একটা বেদীতে উঁচু বাঁশে পতাকা উড়ছে। তারই পিছনে কাঠের পুল পেরিয়ে জঙে পৌঁছতে হয়। এই পুলটি সরিয়ে নিলে জঙে পৌঁছনো আর সম্ভব নয়। শত্রু আক্রমণ করলে

এটি বোধহয় সরিয়ে নেওয়া হত। তিব্বতের দিক থেকে এটি দ্বিতীয় দুর্গ। দ্রুক গিয়েলের পর এই রিনচেন পঙ জং। তিব্বতী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যেই এই জং নির্মাণ করেছিলেন নওয়াং নামগিয়েল।

পশ্চিম দিক দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। জংটি পাঁচতলা, মাঝখানে সাততলা উচি। পূর্ব দিকের কারুকার্য করা গেট দিয়ে ঢুকলে সরাসরি তিন তলায় পৌঁছনো যায়। এই দিকে একটি দশ ফুট উঁচু বিরাট আকারের মানচিত্র আছে। এটি ঘোরালেই একটা ঘণ্টা বাজে। উচির ভেতরে ফ্রেস্কো ও মূর্তি আছে। সব জঙেই তিনটি মূর্তি থাকে— বুদ্ধ, গুরু পদ্মসম্ভব ও প্রথম শবদুং নওয়াং নামগিয়েলের মূর্তি। এই জঙের প্রধান আকর্ষণ হল বিরাট আকারের একটি তংখা, অর্থাৎ নানা বর্ণে রঞ্জিত কাপড়।এটি লম্বায় ও প্রস্থে চল্লিশ হাত করে। একজন বিখ্যাত শিল্পীর হাতে এটি আঁকা। আগুনে এই তংখাটি পুড়ে যায় নি। প্রতিবছর বসন্তকালে চেচু নৃত্য উৎসবে এটি দেখানো হয়। তার জন্যে নানা অনুষ্ঠানও নাকি হয়। লামারা এই তংখা নিয়ে শোভাযাত্রা করেন। জনসাধারণ আসে দূর দূরান্ত থেকে এই অনুষ্ঠান দেখতে। সূর্যাস্তের আগে দু ঘণ্টা ধরে এটি দেখানো হয়। এই জঙের দেওয়ালে আরও অনেক চিত্র আঁকা আছে, তার মধ্যে একটি নওয়াং নামগিয়েলের।

এই জংটি কিছু দিন আগেও পারোর পেনলোপের হেড কোয়ার্টার ছিল ! আর তিনি ছিলেন দেবরাজা পদের একজন দাবীদার। দেবরাজার পদের জন্যে এঁরা যুদ্ধ করতেন ! শেষ যুদ্ধে ইনি তংসার পেনলোপের পক্ষে ছিলেন এবং তাঁকে জয়ী হতে সাহায্য করেছিলেন। রাজা হবার আগে ভুটানের রাজাও পারোর পেনলোপ ছিলেন এবং তিনি রাজা হবার পর এই পদের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁর সৎ ভাই। পারোর পেনলোপের পদটি রাজ পরিবারের জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

এই জঙের ভিতরে আমরা লামাদেরও দেখলাম। নানা বয়সের লামারা এখানে বাস করেন, পড়াশুনো করেন, পূজা পাঠ করেন, উৎসব অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতও করেন। জঙের সমস্ত খরচ বহন করে সরকার। ঘুরে ঘুরে দর্শনীয় অনেক কিছু দেখে আমরা বেরিয়ে এলুম। পারোতে আমাদের আরও দেখবার আছে। শুধু জাদুঘর নয়, একটি মন্দিরও আমাদের দেখতে হবে। ভুটানের প্রাচীনতম মন্দির পারোর খুব কাছেই। এটি না দেখে কেউ ফিরে যায় না।

জীপের কাছে ফিরে আসতে ড্রাইভার বলল : ভাল করে দেখেছেন তো ?

স্বাতি বলল : হ্যাঁ।

তবে এবারে তাগ্ জঙে চলুন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : তাগ্ জঙ !

ড্রাইভার বলল : হ্যাঁ, ঐ ছোট জংটিতেই তো এখন পারোর জাদুঘর। ন্যাশনাল মিউজিয়ম।

তাগ্ জঙের নাম আমি ইতিহাসের বইয়ে পড়েছিলুম। জেনেছিলুম যে ভুটানের প্রথম রাজা উগ্যেন ওয়াংচুক যখন তংসার পেনলোপ ছিলেন তখন নাকি তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এই তাগ জঙে। কে কেন কী জন্যে তাঁকে বন্দী করে এখানে রেখেছিলেন তা জানি নে। কেমন করে তিনি মুক্ত হয়েছিলেন, সে কথাও আমার জানা নেই।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে আমাদের সেই জঙের দিকে নিয়ে চলল।

৩০

পাহাড়ের পথ ধরে আমরা তাগ্ জঙে উঠে এলুম এবং পথের এক পাশেই জীপ থেকে নেমে পড়লুম। তারপর জঙের দিকে তাকিয়ে স্বাতি বলে উঠল : এ আবার **কী রকমের** জঙ ?

সত্যিই এটাকে জঙ বলতে ইচ্ছে করে না। থিম্ফুর তাশি চো জঙ আর পারোর রিনচেন পঙ জঙ দেখার পর একে জঙ বলে মানতে ইচ্ছে করে না। রাস্তায় দাঁড়িয়েই দেখলুম যে এ একটা ক্ষুদ্র গোলাকৃতি বাড়ি। রাস্তা থেকেই সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর তলা পর্যন্ত। তিনটে তলা দেখা যাচ্ছে। তার উপরে ছাদ। ছাদের উপরেও একটা ছোটখাট তলা আছে মনে হচ্ছে। সবার উপরে একটি চতুষ্কোন শিখর ভুটানের নিজস্ব শৈলীতে।

আমাদের নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ড্রাইভার এগিয়ে এল। বলল : বাইরে থেকে এই জং দেখে ভুল করবেন না।

কেন ?

ওপরে তিনটে তলা দেখছেন তো, নীচে আরও চারটে তলা আছে।

মানে ?

ড্রাইভার বলল : এটা সাততলা বাড়ি, আটতলাও বলতে পারেন। নীচের তলাগুলোয় খাদের দিক থেকে আলো আসে।

স্বাতি বলল : বুঝেছি। পাহাড়ে আমরা এই রকমের ব্যাপার দেখেছি। রাস্তার দিক থেকে দুটো তলা মনে হয়েছে, আর নীচের তলায় নামতে হয় ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে।

আমি বললুম : কখনও একটা ঢালু পথও নীচের দিকে নেমে যায় দেখেছি। কিন্তু এখানে সে রকমের কোন পথ নেই। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আবার নামতে হবে নীচে।

ড্রাইভার বলল : মাথাপিছু এক টাকার টিকিট কাটতে হবে ভেতরে যাবার জন্যে।

আমরা এগিয়ে গেলুম। তারপর টিকিট কেটে দেখলুম ভুটানের ন্যাশনাল মিউজিয়ম। খুব বড় সড় ব্যাপার নয়, কিন্তু বিচিত্র জিনিষের সমাবেশ। যে তলায় পৌঁছে ছিলুম সেখানে দেখলুম মেয়েদের পোশাক ও ঘোড়ার জিন। তার উপরের তলায় উঠে দেখলুম গোম্পার ভিতরের নানা জিনিষ। এই সব দিয়েই সাজানো হয় গোম্পাগুলো। একটু সময় লাগল সব কিছু দেখতে। তারপর উঠে গেলুম উপরে। সেখানে প্রথমেই দেখলুম ডাক টিকিটের একটি সংগ্রহ। এখানে সময় নষ্ট না করে মন্দিরে গিয়ে ঢুকলুম। অনেকগুলি মূর্তি আছে এই মন্দিরে। একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে বড় পুরুষ মূর্তিগুলি বুদ্ধ, পদ্মসম্ভব ও অতীশ দীপঙ্করের। এ ছাড়াও অনেক তান্ত্রিক মূর্তি আছে। অনেকগুলিই বীভৎস এবং কয়েকটি কাপড় জড়ানোও

আছে। একজন বিদেশী ভদ্রলোক খুব মনোযোগ দিয়ে এই মূর্তিগুলি দেখছিলেন এবং একটা নোটবুকে কিছু টুকে নিচ্ছিলেন। স্বাতি আমাকে অত্যন্ত মৃদু স্বরে বলল : আমি বাইরে যাচ্ছি, তোমার কিছু জানবার থাকলে এই ভদ্রলোকের কাছে জেনে নাও।

বুঝতে পারলুম যে কিছু অশ্লীল মূর্তি দেখেই সে বাইরে চলে গেল। আমি এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়ালুম। তিনি আমার পায়ের শব্দ পেয়ে আমার দিকে ফিরে তাকাতেই আমি বললুম : তান্ত্রিক মূর্তি নিয়ে কিছু গবেষণা করছেন বোধহয়!

ভদ্রলোকের মাতৃভাষা যে ইংরেজী নয়, তা তাঁর উত্তর শুনেই বুঝলুম। তিনি বললেন : না, গবেষণা নয়। তবে এইসব মূর্তি দেখে নানা রকমের কৌতূহল হচ্ছে। শুধু এখানে নয়। নানা জায়গায় এই রকমের অদ্ভুত ও বীভৎস মূর্তি দেখেছি। অনেকে ছবি নিচ্ছে বলে এরা কিছু মূর্তি এখন ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করেছে।

আমি বললুম : এই সব মূর্তির সম্বন্ধে কিছু বলুন না।

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে দেখলেন। স্বাতিকে বোধহয় তিনি দেখতে পান নি। একা দেখে বললেন : আপনি তাক্‌সাং মনাস্টরি দেখে এসেছেন ?

বললুম : না।

দেখেন নি !

কোথায় সেটা ?

ভদ্রলোক বললেন : এই গোম্পাটি দেখতে হলে আপনাকে এখানে থাকতে হবে। ভয় নেই। অতিথি নিবাস আছে। ভোরবেলায় বেরিয়ে পড়বেন। মাইল পাঁচেক যেতে পারবেন জীপে, তারপর পাহাড়ের ওপরে উঠতে হবে। খাড়া চড়াই। প্রায় দু হাজার ফুট ওপরে উঠতে হবে। এমন এক জায়গায় এই গোম্পাটি তৈরি হয়েছে যে দেখে আশ্চর্য হবেন। গুরু পদ্মসম্ভব এখানে একটি বাঘের পিঠে চড়ে এসেছিলেন বলে এই গোম্পাকে বলে টাইগার্স নেস্ট বা বাঘের গুহা। তাক্ সাঙের মানেও নাকি তাই।

বললুম : এই নিয়ে বোধহয় একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

কিন্তু আমি এখানে দেখলাম যে খুব সম্প্রতি রাজমাতা একটি নতুন গোম্পা নির্মাণ করে নানা দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছেন। নীচের দুটি তলায় আছেন ছোটখাট দেবতারা, দৈত্যরা তাঁদের পাহারা দিচ্ছে। এই গোম্পায় একটি দেবতাকে দেখে—এ দেশের ভাষায়—

বলে নোটবুকের পাতা ওল্টাচ্ছেন দেখে আমি তৎপর ভাবে বললুম : থাক, এ দেশের কঠিন নাম আমিও মনে রাখতে পারব না।

ভদ্রলোক নিরস্ত হয়ে বললেন : চমকে উঠতে হয়।

কেন ?

তাঁর ষোলটি পা এবং বাহু চৌত্রিশটি। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর সঙ্গিনীর সঙ্গে সঙ্গমরত। তিনি নাকি মঞ্জুশ্রীর ভয়ঙ্কর রূপ, মৃত্যুর দেবতাকে জয় করেছেন তিনি।

একটু থেমে বললেন : স্থানীয় নাম মনে পড়ছে না, ভারি কঠিন উচ্চারণ। আপনারা নাকি বজ্রযোগিনী বলেন, উলঙ্গ ডাকিনীদের মধ্যে প্রধান। তাঁর ডান হাতে খড়্গ ও বাঁ হাতে মাথার খুলি, মাথায় মুকুট ও গলায় মুণ্ড মালা।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : বৌদ্ধ গোম্পায় একালে তৈরি মন্দিরে এই সব মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে !

ভদ্রলোক বললেন : পারোর আশেপাশে আরও অনেক গোম্পা আছে—ছুম্ফু গোম্পা, সাঙ্গতোগ পেরি গোম্পা, সাঙ্গনা ছোখর গোম্পা, দেন্‌সা দোচোলিং গোম্পা।

এই শেষের গোম্পায় মহাকাল আর মহাকালীর মূর্তি দেখেছি। এদেশে মহাকালকে নাগ-পো, চেন্‌পো বলে। আর মহাকালীকে বলে লা-মো।

মূর্তি কী রকম?

না, মূর্তির মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য দেখি নি। তবে মহাকালীর সম্বন্ধে একটি বীভৎস গল্প শুনেছি। লা-মো তাঁর স্বামী ও পুত্রকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করাতে না পেরে পুত্রকে হত্যা করে তার ছাল ছাড়িয়ে হৃৎপিণ্ড খেয়ে ফেলেছিলেন। লামারা এই দেবীকেই ধর্মের সবচেয়ে বড় রক্ষক বলে মনে করেন।

তারপরেই বললেন: পারো জঙের সামনে পারো লাখাঙ দেখেছেন তো! সেখানেও অনেক দেবদেবীর মূর্তি দেখবেন। যমকে দেখবেন তার সঙ্গিনীর সঙ্গে কুবেরের তিন মাথা আর দশটা হাত। যম ও চামুণ্ডির বীভৎস মূর্তি। মাপ করবেন আমাকে, এই সব মূর্তি দেখে আমার মনে হয়েছে যে লামাদের বিকৃত কামনাই প্রতিফলিত হয়েছে এইসব মূর্তিতে।

আড়ালে স্বাতির শাড়ির আঁচল দেখে আমি বললুম: এ আপনি খুব ভাল কাজ করছেন। এই ধর্মের দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে গবেষণা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বেরিয়ে এলুম।

স্বাতি আমার অপেক্ষা করছিল। বলল: কিছু জানতে পারলে?

পরে বলব।

বলে উঠে গেলুম উপরের তলায়। এটি সাজানো এখনও শেষ হয় নি। নানা রকমের রান্নার বাসন সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলিই বোধহয় সাজানো হবে।

এর উপরে উঠতে না পেরে আমরা নীচে নামতে লাগলুম। যে তলায় প্রথমে এসেছিলুম তার নীচের তলায় নানা রকমের পোশাক ও বন্দুকের সঙ্গে কিছু অদ্ভুত জিনিষও সাজানো আছে। তাদের পরিচয় লেখা আছে ফলকে। হঠাৎ স্বাতির একটা চিৎকার শুনে আমি সরে এলুম তার কাছে। স্বাতি বলে উঠল: দেখো কাণ্ড।

দেখলুম একটা ডিম, তার পরিচয় লেখা ঘোড়ার ডিম। ঘোড়ার শিঙও আছে। আর আছে বজ্র বা থাণ্ডার বোল্ট, চাঁদের পাথর ও মানুষের মাথার মগজ বা ব্রেন।

স্বাতি বলল: এ রকমের অদ্ভুত জিনিষ কোন মিউজিয়মে দেখি নি।

বললুম: এর মানে, ঘোড়ার ডিমের মতো অবিশ্বাস্য জিনিষে এখনও অনেকের বিশ্বাস আছে।

তাইতো দেখছি।

বলে স্বাতি নীচের তলায় নামল। এখানে নানা জাতেরপশু ও পাখি। তার নীচের তলাটি অসম্পূর্ণ। নানা ধরনের বাক্স ও মদের পাত্র সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সাজানো হবে। বেলা বাড়ছে বলে আমরা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এই জাদুঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

জীপের কাছে এসে স্বাতি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল: এখানে কি আরও কিছু দেখবার আছে?

ড্রাইভার বলল: পারোয় এলে কিচু গোম্পা দেখতেই হয়।

সে কত দূরে?

দূর বেশি নয়। নদীর ধারেই দেখতে পাবেন।

কী দেখবার আছে?

এটাই তো ভুটানের সবচেয়ে পুরনো গোম্পা। লোকে বলে যে বারো-চোদ্দ শো

বছর আগে এই গোম্পা তৈরি হয়েছিল। পুরনো গোম্পার পাশে একটা নতুন গোম্পাও আছে। চলুন না, গেলেই দেখতে পাবেন।

বলে আমরা উঠে বসতেই সে গাড়ি ঘুরিয়ে পাহাড় থেকে নীচে নামতে লাগল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম : তুমি আমাদের পারো লাখাঙ দেখালে না কেন?

ড্রাইভার আশ্চর্য হয়ে বলল : আপনারাই তো জাদুঘরে আসতে চাইলেন! লাখাঙ তো জঙের সামনেই ছিল।

স্বাতি বলল : তাই নাকি!

বললুম : জানতুম না বলেই তো দেখা হল না। বেলা বাড়ছে তো, আমাদের আবার ফিরতেও হবে।

স্বাতি বলল : এখন মনে হচ্ছে যে সারা দিনের প্রোগ্রাম করে এলেই বোধহয় ভাল হত।

কিন্তু এখানকার বাজার তো দেখেছি! কোন হোটেল বা রেস্তোরাঁ আছে বলে মনে হল না।

আমাদের হোটেল থেকে শুকনো লাঞ্চ আনা যেত। আর তা না হলে হেভি ব্রেকফাস্ট করে কফি আর স্যাণ্ডুইচ নিয়ে বেরোলে ফেরার তাড়া থাকত না।

বললুম : এখানে সরকারি গেস্টহাউস বা কোন অতিথি নিবাস থাকতে পারে। সেখানে রাত্রিবাসের অনুমতি নিয়ে এলে আরও অনেক কিছু দেখা সম্ভব হত।

কী রকম ?

একটা পাহাড়ের গায়ে তাক্‌সাঙ্গ নামে একটা গোম্পা আছে, ইংরেজীতে তার নাম টাইগার্স নেস্ট।

আমার মুখে এই গোম্পার নাম শুনে ড্রাইভার কী বুঝল সেই জানে, বলল : জানেন তো, গুরু পদ্মসম্ভব বাঘের পিঠে চড়ে পাহাড়ের ঐ জায়গায় এসে নেমেছিলেন। এ দেশে এসেছিলেন কেন জানেন তো ?

এ কথা আমি মিউজিয়মের সেই বিদেশী ভদ্রলোকের মুখে শুনেছিলুম। কিন্তু স্বাতি শোনে নি বলেই বলল : তাই নাকি!

ড্রাইভার বলল : বুমথাঙের সিন্ধু রাজা যুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন ভারতের রাজা নবুদারীর কাছে। রাজার বড় ছেলে যুদ্ধে মারা গেলে মনের দুঃখে রাজা বললেন, ভগবান নেই, ভেঙ্গে ফেলো দেশের সব মন্দির। আর রাজাও মরণাপন্ন হলেন অসুখে।

তারপর ?

এই সময়ে গুরু পদ্মসম্ভব তিব্বত থেকে ভুটানে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা সেরে উঠলেন। গুরুর ইচ্ছায় রাজার বিশ্বাস ফিরে এল ধর্মে। তিনি বাঘের পিঠে চড়ে ভুটানের এই পাহাড়ে এসে একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন বলেই পরে তাঁর ভক্তরা এখানে গোম্পা তৈরি করেছে।

স্বাতি বলল : আর কিচু গোম্পা ?

সে গোম্পা আরও পুরনো।

আমরা তখন পাহাড় থেকে নীচে নেমে নদীর পুল পেরিয়ে এসেছিলুম। এবারে ডান হাতে ঘুরে নদীর তীর ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। ড্রাইভার বলল : এই পথ ধরে এগিয়ে গেলে আমরা দ্রুক গিয়েল গোম্পায় পৌঁছে যাব।

কত দূর এখান থেকে ?

দশ মাইলেরও কম।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল যে এই পথেরই কোন এক জায়গা থেকে তুষারাচ্ছন্ন চোমলহরি গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়। সেই কথা ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল : যাবেন দেখতে ?

বললুম : দূর কত বলতো !

ড্রাইভার বলল : মাইল তিনেক আগেই জঙ দেখতে পাবেন, আর তার পিছনে পাহাড়।

স্বাতি বলল : আজ বরফ দেখা যাবে ?

ড্রাইভার একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর বলল : এতক্ষণে বোধহয় মেঘে ঢেকে গেছে। বরফ দেখতে হলে সকালে যেতে হয়, ভোর বেলায়।

হুঁ।

বলে স্বাতি নীরব হল।

ভুটান ট্রাভেল এজেন্সি এই দেশ দেখাবার যে ব্যবস্থা করেছে, তাতে এক দিনে পারো দেখানো হয়, আর এক দিনে পুনাখা ও ওয়াংদি ফোড্রং। হয়তো সারা দিন ধরেই দেখানো হয়। কিন্তু এই বরফ দেখাবার ইচ্ছা থাকলে রাতে এখানে থাকবার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু এ সব জায়গায় হোটেল বা টুরিস্ট বাংলো নেই বলেই তা সম্ভব নয়। অদূর ভবিষ্যতে কিছু গড়ে উঠবে বলেও মনে হয় না।

অল্প সময়েই আমরা কিচু গোম্পার কাছে পৌঁছে গেলুম। গাড়ি থেকে নেমে খানিকটা পথ আমাদের হাঁটতে হল। চলতে চলতে স্বাতি বলল : তোমার ইতিহাসের বইয়ে এই গোম্পার কথা নেই ?

বললুম : সব গোম্পার কথাই আছে।

সত্যিই কি এটি এ দেশের সবচেয়ে পুরনো গোম্পা ?

তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে এই গোম্পা লাসার শাক্য মুনির গোম্পার আগেই নির্মিত হয়েছিল। অর্থাৎ এই গোম্পাটি নির্মিত হয়েছে ৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে। লাসার গোম্পা তখনও সম্পূর্ণ হয় নি, সেটা তখন তৈরি হচ্ছিল। তোমার মনে আছে কিনা জানি না, তিব্বতের রাজা সংচেন গাম্পো বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করবার জন্যে একশো আটটি গোম্পা তৈরি করেছিলেন। তার মধে দুটি এই ভুটানে। একটি পারোর কিচু গোম্পা, আর একটি বুমথাঙের জাম্পো লাখাং। অনেকে মনে করেন যে এরও কুড়ি বছর আগে এটি তৈরি হয়েছিল। তার মানে লাসায় তখনও কোন গোম্পা তৈরি হয় নি। প্রথমে ধ্যানি বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, পরে আগুন লেগে এই গোম্পাটি পুড়ে গেলে শাক্য মুনির মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়।

গোম্পার দরজায় আমরা পৌঁছে গিয়েছিলুম। বললুম : এই সব ঘর বাড়ি তৈরি হয়েছে দেড় শো বছর আগে। জেয় খেনপো ও পারোর পেনলোপ এসব তৈরি করেছেন— সোনার ছাদ, অবলোকিতেশ্বর ও বজ্রপানির মূর্তি প্রতিষ্ঠা—এ সব তাঁদের কীর্তি। আর এই যে নতুন মন্দির দেখা যাচ্ছে, এটা তৈরি করেছেন রাজমাতা। এই মন্দিরে তারার মূর্তি আছে।

স্বাতি বলল : তারা তো হিন্দুর দেবতা !

হেসে বললুম : আগে বলি নি ? রাজা সংচেন গাম্পোর দুই স্ত্রীও তারা। একজন সাদা, আর একজন সবুজ— তাঁর উগ্র মূর্তি।

দরজা পেরিয়ে আমরা অঙ্গনে প্রবেশ করলুম। ভিতরে লামারা ছিলেন। কেউ

বোধহয় পাঠ করছিলেন। তার শব্দ আসছিল। আমরা ঘুরে ঘুরে ভিতরে ও বাইরে দেখলুম। উপাসনার ঘরটি বেশ বড়। পদ্মসম্ভবের সোনার মূর্তি বোধহয় বারো হাত উঁচু হবে। দেওয়ালে নানা বর্ণের আঁকা ফ্রেস্কো। দেবদেবীর মূর্তিও আছে।

বাইরে বেরিয়ে আসবার সময়ে স্বাতি বলল : আর দেরি করা উচিত হবে না।

কেন বলতো!

হোটেলে তো কিছু বলে আসা হয় নি! দেরি হলে কিছু খেতে পাওয়া যাবে না।

বললুম : আর দেরি হবে কেন!

স্বাতি বলল : ভাল জায়গা দেখলে এখানেই কিছু খেয়ে নেওয়া যেত।

হেসে বললুম : সব সময়ে দুদিক সামলানো যায় না!

ফেরার পথে আর আমরা কোথাও দেরি করলুম না। ড্রাইভার তার জীপ নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল।

এক সময়ে আমি তাকে বললুম : ফেরার জন্যে আমাদের কোন তাড়া নেই।

স্বাতি বলল : ভয় করছে বুঝি?

বললুম : পথ তো সমতল। তাই ভয় নয়, ও হয়তো আরও কিছু দেখাতে চায়।

এই কথাগুলো আমরা বাঙলায় বলেছিলুম। ড্রাইভার বুঝতে পারে নি। সে আমার আগের কথারই জবাব দিল, বলল : তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে আপনাদের আর একটা জায়গা দেখাতে পারতাম।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : কোন জায়গা?

ড্রাইভার বলল : সানডে মার্কেট। সকালে গেলে জমজমাট হাট দেখতে পেতেন। থিম্ফুর সমস্ত বাসিন্দা আসে এই হাটে সপ্তাহের বাজার করতে। এখনও পুরোপুরি ভাঙে নি। সেখানে গেলে আপনাদের একটা ধারণা হয়ে যাবে।

সতর্কভাবে গাড়ি চালিয়ে সে থিম্ফু ফিরে এল। শহরের বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে না এসে সে আমাদের নীচের দিকের বাজারে নিয়ে এল। তার আগে সে একটা খোলা জায়গা দেখিয়ে বলল : এই জায়গাটা চিনে রাখুন।

স্বাতি বলল : কেন বলতো!

ফুনছোলিঙে ফেরার বাস আপনাদের এইখানে ধরতে হবে। টিকিটও পাবেন এইখানে।

কেন, যেখানে আমরা নেমেছিলুম সেখানে পাব না?

এই জন্যেই তো জায়গাটা চিনিয়ে রাখলাম। ফেরার সময় আমাকে বলবেন, আমি আপনাদের পৌঁছে দেব। সব বাস এইখান থেকে ছাড়ে।

স্বাতি বলল : এ কথা জানা না থাকলে বেকায়দায় পড়তে হত।

আমরা এগিয়ে গিয়ে বাজারের কাছে নামলুম। ভিতরে গিয়ে দেখলুম যে একটা প্রশস্ত জায়গায় তখনও কিছু লোকজন ও দোকানপাট আছে। খোলা জায়গা। মাথায় ছাদ নেই। চারি দিক ঘিরে চালা ঘর। সেখানেও কিছু দোকান পাট আছে। ভুটানে তৈরি জিনিষপত্রও এই হাটে বিক্রি হচ্ছে।

কিন্তু বেলার দিকে চেয়ে আমরা সময় নষ্ট করলুম না। জীপে চেপে ফিরে এলুম আমাদের হোটেলের কাছে। স্বাতি ভাড়া ঠিক করেছিল যাত্রার আগেই। কিছু বেশি দিতে সে খুশী হয়ে নমস্কার করল।

৩১

হোটেলের ম্যানেজার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বললেন : যাক, সময় মতোই আপনারা ফিরে এসেছেন।

বলে বেয়ারাকে ডেকে দিলেন।

প্রথমে আমরা ভুটানের সাম্চিতে তৈরি অরেঞ্জ স্কোয়াশ খেলুম এক গ্লাস করে। গলা শুকিয়ে উঠেছিল। খাবারের অর্ডার দেবার পর স্বাতি বলল : আর আমাদের বাকি রইল কী?

বললুম : পুনাখা।

পুনাখায় আমরা কী দেখব? শুধু একটা পুরনো জঙ?

আর পথে ওয়াংদিফোদ্রঙের জঙ ও দেখতে পাব।

স্বাতি বলল : জঙ আর গোম্পা ছাড়া আর কিছু কি দেখবার নেই?

বললুম : আর কিছু আছে বলে তো শুনি নি।

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই আমি বললুম : দুঃখ পেলে নাকি?

না, দুঃখ নয়। ভাবছি, এবারের ভ্রমণে আমরা নতুন কী পেলাম? আর যা বাকি আছে, তা দেখলে কি নতুন কিছু পাব?

আমি বললুম : তুমি কি ফেরার কথা ভাবছ?

স্বাতি বলল : নতুন কিছু না থাকলে পথের আনন্দ কিছু কুড়িয়ে নিয়ে যেতে চাই।

কথাটা বুঝতে পারলুম না।

এখানে সময় নষ্ট না করে আমরা আর একবার গ্যাংটকে যেতে পারি। কিংবা কালিম্পঙ বা মিরিকে। দার্জিলিঙ পাহাড়ে মিরিক নতুন গড়ে উঠছে।

বললুম : পুনাখা দেখার চেয়ে সে বোধহয় খারাপ হবে না। জঙ দেখার আগ্রহ আর নেই।

স্বাতি বলল : বরফের পাহাড় কিংবা লামাদের নাচ দেখতে পেলে যাওয়া যেত। কিংবা কোন উৎসব।

হেসে বললুম : সে তো আমাদের ইচ্ছেয় হবে না।

শেষ পর্যন্ত ফিরে যাওয়াই আমরা স্থির করলুম। দুপুরে ঘরে বসে না থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ব পথে। হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব ফেরার টিকিট কাটতে। যদি কাল সকালের বাসে জায়গা পাই তো কালই আমরা ফুনছোলিঙে ফিরব।

স্বাতি বলল : ফুনছোলিঙের হোটেলে তো বলে এসেছি! একটা খবরও এখান থেকে দিতে হবে।

আর যদি সুযোগ পাওয়া যায় তো কালই আমরা শিলিগুড়ির দিকে এগিয়ে যেতে পারি না? কিংবা জলদাপাড়ার ফরেস্ট রেস্ট হাউসে রাত কাটাতে পারি না?

স্বাতি খুশী হয়ে বলল : চমৎকার আইডিয়া। পুনাখা দেখার চেয়ে সে অনেক বেশি

অ্যাডভেঞ্চারাস হবে। পরদিন সকালে আমরা গ্যাংটক যাত্রা করব।

হেসে বললুম : নিজেদের গাড়ি থাকলে তা সম্ভব হত, বাসে নিজেদের মর্জি খাটে না।

তাহলে পথের ধারেই পড়ে থাকব আর একটা রাত। তাতে থ্রিল আছে, আনন্দ আছে বেহিসেবি হবার।

বললুম : তাহলে এক কাজ করা যাক। আজ আমরা বাসের টিকিট কাটতে বেরোব না। কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ব নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে। একটা অনিশ্চিত যাত্রার আনন্দ উপভোগ করা যাবে।

স্বাতি বলল : তাহলে দুপুরে নিজেদের ঘরেই বিশ্রাম কবা যাক।

আর—

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। তাই তো ?

বললুম : ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা কথা স্থির করে ফেলেছি।

কী কথা ?·

ভ্রমণের কাহিনী আর লিখব না।

স্বাতি বলল : ক্লান্ত হযে পড়েছ !

হেসে বললুম : অপরকে ক্লান্ত করেছি বেশি।

খেতে খেতেই আমাদের কথা হচ্ছিল এবং আহার শেষ হবার পর ফিরে এলুম নিজেদের ঘরে। স্বাতি বলল : শুয়ে একটু গড়িয়ে নাও। আমি বসছি পাশে।

বলে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

কেন জানি না, এই ভাবে নিশ্চিন্ত মনে শুলেই আমার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায়। নিঃসঙ্গ জীবনের কথা। বছর পাঁচেক আগেও আমি স্বাতিকে চিনতুম না, এই বিরাট দেশের সম্বন্ধেও কোন ধারণা ছিল না। উত্তরপাড়ার একখানা এঁদো ঘরে আমার রাত কাটতো, আর ভবঘুরে মনটা ঘুরে বেড়াত সারা ভারতে। পেটেব দাযে চাকরি করতুম কলকাতায়, মনের দাবী মেটাতে লাইব্রেরিতে বসে বই পড়তুম। জীবনে উন্নতির জন্যে একটা ডক্টরেট পাবার চেষ্টা করতুম লুকিয়ে।

অনেকেই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করত, কেরানীগিরি কেন করছি ? কিন্তু কেউ বুঝত না যে নিজের চেষ্টায় আর কিছু করা সম্ভব ছিল না। চেষ্টার তো ত্রুটি করি নি ! কিন্তু সঙ্কোচ করেছি সে কৈফিয়ৎ দিতে। স্বাতির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এই সময়ে। আমাকে সে চিনেছিল, আর নীরবে সাহায্য করেছিল আমাকে টেনে তুলতে। আত্ম সম্মান বিকিয়ে আমাকে উন্নতি করতে কোন দিন বলে নি।

স্বাতি যে আমার দিকে চেয়েছিল তা আমি দেখতে পাই নি। তাই তার কথা শুনে আমি চমকে উঠলুম। সে জিজ্ঞেস করেছিল : কী ভাবছ ? নিশ্চয়ই কোন পুরনো কথা ?

তার মুখের দিকে চেয়ে আমি মিথ্যা বলতে পারলুম না। বললুম : জীবনটা কেমন বদলে গেল, তাই ভাবছি।

স্বাতি বলল : জীবন তো এক রকম থাকবে না, তা বদলাবেই।

কিন্তু এমন তাড়াতাড়ি বদলাবে ভাবতে পারি নি।

আমি ভাবতে পেরেছিলাম।

বললুম : শুধু ভাবা নয়, এখন মনে হচ্ছে যে গোড়া থেকেই তোমার একটা পরিকল্পনা ছিল। সেই পরিকল্পনা মতোই তুমি কাজ করেছিলে।

স্বাতি হাসল দেখে বললুম : আজ তুমি হাসছ !

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : আজ বলছ কেন, প্রথম দিনও কি আমি হাসি নি ? তুমি যখন ভয় পেতে, তখনও তো আমি তোমার ভয় দেখে হেসেছি।

হ্যাঁ। আর আমি তোমার সাহস দেখে আরও বেশি ভয় পেয়েছি।

স্বাতি বলল : আর তোমার সেই ভয় দেখে আমি এক রকম জোর করেই তোমার কাছে একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলাম। মনে আছে কী সেই প্রতিশ্রুতি ?

কন্যাকুমারীতে সমুদ্রের ধারে বসে ?

স্বাতি মাথা নাড়ল দেখে বললুম : সেই প্রতিশ্রুতির কথা কি ভুলতে পারি ! সেই জ্যোৎস্না রাতে তুমি নিজেকে ভুলে যেতে পার নি। বলেছিলে, তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। বল রাখবে ?

স্বাতি বলল : কিছু জানতে না চেয়েও তুমি অসঙ্কোচে বলেছিলে, রাখব।

আমি জানতুম যে তুমি এমন কিছু চাইবে না বা চাইতে পার না, যা আমি দিতে পারব না।

হ্যাঁ। তুমি কোন উত্তর না দিলেও আমি মেনে নিয়েছিলাম যে তুমি আমার অনুরোধ নিশ্চয়ই রাখবে।

বললুম : তুমি বলেছিলে, দেশে ফিরে তোমার বাবার কাছে কোন অনুগ্রহ নিয়ে নিজেকে যেন আমি ছোট না করি। আর এই কথা শুনেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে তোমার কাছে আমি বড় হয়ে উঠতে পেরেছি বলেই তুমি আমার ছোট হবার কথা ভাবছ।

স্বাতি বলল : সেদিনের কথা থাক।

হেসে বললুম : জীবনের সবচেয়ে সত্য কথাই তো সেদিন তুমি আমাকে বলেছিলে—হৃদয় তো তিলে তিলে দেবার জিনিস নয়, আর তা একবার কাউকে দিয়ে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

কিন্তু তোমার মনে অনেক দ্বিধা ছিল, অনেক ভয়, অনেক ভাবনা। আমার কথা তুমি বিশ্বাস করতে পার নি।

আমি মুখ ফুটে এ কথা স্বীকার করতে পারলুম না। পুজোর ছুটিতে সমগ্র দক্ষিণ ভারত ঘুরে কলকাতায় ফিরে আমি ভেবেছিলুম যে সেই বিলেত ফেরৎ লোকটির সঙ্গেই স্বাতির বিয়ে হয়ে যাবে। অগ্রহায়নেই তার বিয়ে হবার কথা ছিল। কিন্তু তা হল না। কেন হল না, কী জন্যে বিয়ে ভেঙে গেল, তা জানি নে। বসন্তকালে দিল্লিতে যখন তাদের সঙ্গে আবার দেখা হল, তখনও আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। রানার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা দেখে ভেবেছিলাম যে তার সঙ্গেই স্বাতির বিয়ে হবে। কিন্তু সে বিয়েও হল না। রানাই যে পিছিয়ে গিয়েছিল, তা আমি পরে জানতে পেরেছিলুম। কিন্তু স্বাতির ভূমিকা আমি সহজে জানতে পারি নি।

পুজোর সময় স্বাতির বাবা আমাকে জয়পুর থেকে টেলিগ্রাম করে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমার জন্যে তাঁরা সেখানেই অপেক্ষা করছিলেন। রাজস্থান থেকে আমরা সৌরাষ্ট্র ঘুরে গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে গিয়েছিলুম। ফিরেছিলুম গোয়া দেখে মধ্যপ্রদেশ হয়ে। জো রায় নামে এক প্রতিষ্ঠিত যুবক স্বাতির পাণিপ্রার্থী হয়েছিল। তার সঙ্গেই যে স্বাতির বিয়ে হবে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলুম। তাই তার বিয়ের দিন স্থির হয়েছে এবং কলকাতায় বিয়ে হবে জেনে পালিয়ে গিয়েছিলুম পুরীর সমুদ্রতীরে অজ্ঞাত বাসে।

স্বাতি যে আমার ভাবনার ধারা অনুসরণ করছিল তা জেনে বিস্ময়ে অভিভূত হলুম। আমাকে নীরব দেখে বলল : আমার ওপর তোমার কোন আস্থা ছিল না, তাই আমার বিয়ের খবর পেয়ে তুমি কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে বড় দিনের সময়ে। তাই না ?

এই অভিযোগের কোন উত্তর দিতে আমি পারলুম না দেখে স্বাতি বলল : তোমার খবর আমরা হালদার মশায়ের কাছে পেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি নিজে আমাদের কাছে আসো নি।

বলতে পারলুম না যে এই অভিযোগ সত্য। আবার একটা পুজো এসেছিল। বন্ধু মনোরঞ্জনের সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়েছিলুম উত্তর প্রদেশ ভ্রমণে। বিহার থেকে উত্তর প্রদেশ। দিল্লিতে এসে দেখা হয়েছিল স্বাতির সঙ্গে। তাদের সঙ্গেই দেখেছিলুম পাঞ্জাব হিমাচল প্রদেশ ও কাশ্মীর। চাওলার চেষ্টায় চাকরি পেলুম আসামে। সেই সূত্রে পূর্ব ভারতটাও দেখা হয়ে গেল। তারপর সেই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্বাতি আমার কাছে ছুটে এল দিল্লি থেকে। এরপর থেকেই তো আমরা এক সঙ্গে আছি।

স্বাতি বলল : অ৲০ আমি তোমার কাছে এসেছি নিজে থেকে। তুমি আমাকে ডাকো নি।

বললুম : সাহস পাই নি।

আর তুমি আমার ডাক শুনতে পাও নি। শুনতে চাও নি। মনের দরজাটা চিরদিন বন্ধ করে রেখেছিলে মনের কথা কান দিয়ে শুনবে বলে।

তারপর বলল : আজও তোমার লজ্জা সঙ্কোচ ভয় ! তাই আমাকে অপমান সইতে হয় পাঁচজনের কাছে।

অপমান !

স্বাতি বলল : অপমান নয় ! এই তো কাল সন্ধ্যেবেলায় মিসেস মল্লিক আমাকে কী বললেন ! তুমি তো শুনতে পেয়েও কোন প্রতিবাদ করলে না। যা সত্য, তা বলতে পার না কেন ? বাধা কিসের ? কী জন্যে তুমি আজও সব কথা সবার কাছে স্বীকার করতে পার নি ? কেন সবাই ভুল বোঝে আমাদের ?

বললুম : সত্যিই এ আমার দুর্বলতা। কিন্তু এই দুর্বলতা আমি এবারে ঝেড়ে ফেলব।

স্বাতি বলল : তুমি পারবে না। এ কাজ আমাকেই করতে হবে।

বললুম : তুমিও পারবে না।

পারব না ?

না।

কেন পারব না ?

দিল্লি থেকে তুমি যখন দার্জিলিঙে আমার কাছে এসেছিলে, তখন তোমার ব্যাগে একখানা চিঠি ছিল। তোমার মা আমাকে চিঠি লিখে সব জানিয়েছিলেন। কিন্তু তুমি সেই চিঠি আমার হাতে দাও নি। ইচ্ছে করেই লুকিয়ে ছিলে চিঠির কথা।

স্বাতি এ কথার প্রতিবাদ করল না।

বললুম : আমি এই চিঠির কথা জানতে পেরেছিলুম তোমার মার কাছে। তোমার বাবা মাকে আনবার জন্যে তুমি হাওড়া স্টেশনে যাও নি। বন্ধুর বিয়ের নামে নিজে না গিয়ে পাঠিয়েছিলে আমাকে। তোমার মা গাড়িতে আমাকে নিজের পাশে নিয়ে বসেছিলেন, জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার চিঠি পেয়েছ তো ? উত্তরে আমি বলেছিলুম,

আপনাদের টেলিগ্রাম পেয়েছি।

স্বাতি নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, আর আমি বললুম : তোমার মা আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, পাও নি আমার চিঠি ! তোমাকে দেবার জন্যে যে স্বাতির হাতে দিয়েছিলুম ! তোমার বাবা কী বলেছিলেন জানো ?

স্বাতি তার দৃষ্টি দিয়ে সে কথা জানতে চাইল।

আমি বললুম : তিনি বলেছিলেন, বলি নি তোমাকে ! ও চিঠি স্বাতি গোপালের হাতে দেবে না ! তার লজ্জা তো জানো ! আমি উদ্বিগ্ন হয়েছিলুম অপরিমিত। চিঠিতে তিনি এমন কী লিখেছিলেন যে তুমি সে চিঠি আমাকে দিতে পার নি ! তবু আমি বলেছিলুম, কাজের চাপে বোধহয় ভুলে গিয়েছে। এখন তো ওকেই সব দেখাশুনো করতে হচ্ছে। কিন্তু তোমার বাবা ঠিকই বুঝেছিলেন। তাই বলেছিলেন, তুমিও যেমন ! ও ইচ্ছে করেই চিঠি দেয় নি।

স্বাতি বলল : একটা সামান্য ঘটনাকে তুমি এমন গুরুত্ব দিচ্ছ কেন ?

বললুম : ঘটনা সামান্য হতে পারে, কিন্তু এই সব ছোটখাট ঘটনা থেকেই মনের খবর পাওয়া যায়।

বুঝেছি।

কী বুঝেছ ?

তুমি চাইছ যে আমিই সব কথা ফাঁস করে দিই।

আমি চাইলেই কি তুমি তা পারবে ?

স্বাতি বলল : দেখো পারি কিনা। কিন্তু একটা কথা তোমাকে এখুনি বলে রাখি। এরপর তোমাকে এই কাহিনী শেষ করতে হবে।

বললুম : সে তো আনন্দের কথা।

কিন্তু তোমার কাজ তো শেষ হবে না, শেষ হলে চলবে না। ভারত ভ্রমণ শেষ করে তোমাকে অন্য কিছু শুরু করতে হবে।

আদেশ কর।

স্বাতি বলল : ভারতের আত্মাকে আবিষ্কার করতে হবে তার সংস্কৃতির জগতে। এই দেশের যেমন একটা ইতিহাস আছে, তেমনি ইতিহাস আছে তার চিন্তাধারার বিবর্তনের। শুধু ঘুরে বেড়িয়ে কোন দেশকে চেনা যায় না, চিন্তার জগতে নেমে তার মর্মবাণীও উদ্ধার করতে হয়।

তার কথা শুনে আমি হাসলুম। আর স্বাতি রেগে গিয়ে বলল : হাসলে যে ?

বললুম : তেমার কথা শুনে হাসি পেল।

আমি উপহাস করছি ভেবে সে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

৩২

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার আগেই নিরাপদ এসে উপস্থিত হলেন। বললে : চলুন এইবারে।

কিন্তু স্বাতি বলল : যাব, কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

কী প্রশ্ন ?

গতকালের মতো খাবার আয়োজন করা হয় নি তো ?

নিরাপদ গম্ভীরভাবে বললেন : না।

তাহলে আমরা সময়মতো হোটেলে ফিরেই খাব তো ?

নিরাপদ এবারেও বললে : না।

স্বাতি এবারে আশ্চর্য হয়ে বলল : এ আবার কী রকমের উত্তর ? খাবার কোন আয়োজন নেই, অথচ হোটেলে ফিরেও খেতে পাব না, তবে কি আমরা রাতে উপোস করে থাকব।

নিরাপদ এবারেও বললেন : তাও না।

ব্যাপারটা তবে খুলেই বলুন, কোনটা ঠিক।

তিনটে উত্তরই ঠিক। মানে গতকালের মতো আয়োজন করা সম্ভব হয় নি , কারণ কোন বৌদিকে পাওয়া যায় নি। আপনারা হোটেলে ফিরেও খাবেন না। আবার রাতে যাতে উপোস করতে না হয়, তার জন্যে সামান্য আহারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব, ততটুকু খেতে পেয়েই আপনাদের সন্তুষ্ট হতে হবে।

আমি বললুম : আমি কোন সাহায্য করতে পারি ?

নিরাপদ তৎপর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন রুটি বেলতে বা সেঁকতে পারেন ? তাহলে পাঁউরুটি খেতে হবে না।

বললুম : ওটা কঠিন কাজ। ভাতটা ফুটিয়ে দিতে পারি। তবে সেদ্ধ হয়েছে কিনা, সেটা একজনকে দেখে নিতে হবে, আর ফেনটাও গেলে নিলে ভাল হবে।

স্বাতি বলল : কাউকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি আপনাদের বৌদি না হলেও স্বাতি দি বলেছেন তো। ঘরে কী আছে আর কী নেই জানতে পারলে দোকান থেকে কিনে নিয়ে যাব।

নিরাপদ বলে উঠলেন বাস, তাহলে আর আমাদের কোন ভাবনা নেই। তাপস উনুনে কয়লা দিয়ে ফুঁ দিচ্ছে। ও মাংস রাঁধতে জানে, ইন্দুবাবু মাংস কিনে দিয়ে গেছে। পাঁউরুটি কেনার ভার ছিল আমার ওপরে। এ ভারটা আমি গোপালদার হাতে দিয়ে স্বাতিদিকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। মাংসে নুন আর লঙ্কা মাপ মতো দিতে হবে। তাপস গোলমাল করে ফেলতে পারে।

তাহলে ইন্দুবাবুও আসছেন ?

শুধু আসছেন নয়, মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে আসছেন। ফুনছোলিঙ থেকে মিষ্টি আসছে

বাসে। সেটা নিয়ে আসবেন।

আর কেউ ?

দেবুদা আর বৌদি তো আছেনই। দু একজন রবাহুত এসে পড়তে পারেন।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম : তাহলে কতগুলো পাঁউরুটি কিনতে হবে ?

নিরাপদ বলে উঠলেন ছিঃ, এমন চট করে ভয় পেয়ে গেলেন ? খাবার না কুলোলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে ! কেউ রুটি পাবে, কেউ মাংস। আর এ দুটোর একটাও না পেলে ইন্দুবাবুর মিষ্টি তো রইলই।

স্বাতি বলল : চমৎকার ব্যবস্থা। তা ঘরে ময়দা বা আটা আছে ?

নিশ্চয়ই আছে।

ঘি মাখন বা বাদাম তেল ?

খোঁজাখুঁজি করলে তাও বেরোতে পারে। কোথায় কী আছে, উনুন ধরবার পর তাপস তা খুঁজে বার করবে।

স্বাতি বলল : তাহলে আর ভাবনা কী। চল বেরিয়ে পড়ি।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল : এখন তোমাকে কিছুই কিনতে হবে না। যাবার সময় দোকান পাট দেখে যাও, ঘরে খোঁজাখুঁজির পর কেনাকাটা। তোমাকে পথে ফেলে গেলে আমাদের আর খুঁজে পাবে না।

হাসতে হাসতে আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লুম। অগ্রসর হলুম গতকালের পথ ধরে। আজ আরও খানিকটা উজিয়ে যেতে হল। তারপর নীচে নামতে হল গতকালের মতোই। আজকের বাড়িগুলো দোতলা এবং নীচে ও ওপরে ফ্ল্যাট। আমরা নীচের এক ফ্ল্যাটে ঢুকে তাপসকে দেখতে পেলুম। সে একখানা চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে আমাদের অপেক্ষা করছিল। ঘরে ঢুকেই নিরাপদ বললেন: সব ঠিক ?

তাপস নিরুত্তরে থেকেই বুঝিয়ে দিল যে বেঠিক কিছু নেই। তবু স্বাতি বলল : দেখি, কী আয়োজন আছে ?

বলে তাপসকে নিয়ে রান্না ঘরে ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এসে বলল : এঁদের একটা কথাও ঠিক নয়।

আমি বললুম : কী রকম ?

মাংস রাঁধা আছে। আলুর দমও। আমের চাটনি দেখলে তোমার নোলায় জল এসে যাবে।

আর—

স্বাতি হেসে বলল : ভয় নেই, তোমাকে বেরোতে হবে না। ময়দা মেখে রেখেছে, রুটি বেলে সেঁকতেও এরা জানে।

বাস, তবে আর কী ! মিস্টির হাঁড়িটা এলেই আমরা—

বাধা দিয়ে নিরাপদ বললেন না গোপালদা এত তাড়াতাড়ি নয়। একটু গল্প গুজব হোক, তারপর—.

স্বাতি বলল : তাপস গরম জল চড়িয়ে দিয়েছে। চা কফি দুটোই আছে।

ঠিক এই সময়ে আমরা সবাই চমকে উঠলুম বাইরে একটা গর্জন শুনে।

হালদার মশাই না !

বলেই স্বাতি বাইরে বেরিয়ে গেল এবং পরক্ষনেই ফিরে এল হালদার মশায়ের সঙ্গে। আমি একখানা চেয়ার দখল করে বসতে যাচ্ছিলুম, পরম বিস্ময়ে বলে উঠলুম : আপনি এখানে !

হেঁ-হেঁ করে তিনি হাসলেন রসিয়ে রসিয়ে তারপর বললেন : রসভঙ্গ করবার জন্যে কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার সব জায়গাতেই আছে।

স্বাতি বলল : রসভঙ্গ করবার জন্যে, না রসের জোগান দিতে ?

হালদার মশাই তাঁর হাতের হাঁড়িটি ইন্দুবাবুর হাতে দিয়ে বললেন : মা জননী আমাকে প্রথম দিন থেকেই চিনেছেন। কিন্তু গোপালবাবু—

বলে আমার দিকে চেয়ে একটা ভেংচি কাটলেন।

আমি বললুম : আমার ওপর রাগ করছেন কেন ? আমি কি আপনাকে ভুল বুঝেছি ?

সত্যি কথা বলতে কালীকেষ্ট ভয় পায় না, গোপালবাবু। আপনি প্রথম থেকেই আমাকে—

বলে থেমে গেলেন।

আমি বললুম : আগে আপনার কথা বলুন, তারপর আমার কথা।

হালদার মশাই বললেন : এ একটা যোগাযোগ, বুঝলেন না ! লক্ষ্মী পুজো থেকে কালীপুজো পর্যন্ত তো ছুটি ! এক যজমানের সঙ্গে এসেছিলুম হাসিমারার চা বাগানে। ইচ্ছে ছিল হাতি আর গণ্ডার দেখব, জুটে গেল একখানা থিম্ফুর লরি। ইন্দুবাবুরই মাল আসছিল, তাঁর নাম করেই চেপে বসলুম।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : এঁকে আপনি চেনেন নাকি ?

চিনব না ! বেহালায় কিছু করতে না পেরে এ দিকে বেশ করে খাচ্ছেন দেখছি। এঁর বড় ভাইরা তো এঁকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছিলেন ! তাই না ?

কিন্তু ইন্দুবাবু তখন মিস্টির হাঁড়িটা নিরাপদর হাতে ধরিয়ে দিয়ে কেটে পড়বার মতলবে ছিলেন। চুপি চুপি বলছিলেন : আমার আবার মল্লিক সাহেবের কাছে একটু দরকার আছে।

কথাটা হালদার মশায়ের কানে গিয়েছিল। বললেন : মল্লিক সাহেব !

কিন্তু ইন্দুবাবু আর অপেক্ষা করলেন না। মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

হালদার মশাই বললেন : এ ছোঁড়ার এখনও কোন আক্কেল হল না। আরে বাবা, তোমার লরিতে চেপে এসেছি বলে কি তুমি আমার মাথা কিনে নিয়েছ ! নতুন জায়গায় এলে কারও সঙ্গে কি পরিচয়টাও করিয়ে দেবে না ?

বললুম : আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, তার আগে আপনি স্থির হয়ে বসুন।

বলে একখানা চেয়ার টেনে দিতেই তিনি বললেন : দূর, এ আবার একটা বসবার জায়গা নাকি !

বলে এদিক সেদিক চেয়ে দেওয়ালের ধারে একটা ছোট চৌকির ওপরে চেপে বসলেন। বললেন : বলুন এইবারে।

পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে দেখলুম যে ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। তাপস কখন সরে গিয়েছিল খেয়াল করি নি, নিরাপদ নিশ্চয়ই মিষ্টির হাঁড়ি রাখতে ভিতরে গেছেন। আর স্বাতিও বোধহয় রান্নার ব্যবস্থা দেখছে। দেবুদা এই সময়েই বৌদিকে নিয়ে এসে পড়লেন বলেই আমি পরিচয় করিয়ে দেবার লোক পেলুম। বললুম : আসুন দেবুদা। আর বৌদি, নমস্কার করুন আমাদের হালদার মশাইকে। নিরাপদর সভায় আজ ইনিই সভাপতির আসন নিয়েছেন।

তাঁরা দুজনেই হালদার মশাইকে নমস্কার করলেন। তিনি তাঁর দুখানা হাত বাড়িয়ে আশীর্বাদ করার ভঙ্গি করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : মল্লিক সাহেবটা কে ?

বললুম : কলকাতা থেকে এসেছেন।

পাথুরেঘাটার মল্লিক ?

দেবুদা বললেন : না। ইনি নিউ আলিপুরে থাকেন।

নাকের নীচে গোঁফ আছে প্রজাপতিব মতো ? আর বাঁ চোখটা—

ঠিক বলেছেন।

হালদার মশাই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন : বুঝেছি, চালতা বাগান থেকে উঠে গেছে নিউ আলিপুরে বাড়ি করে। তা এখানে কী মতলবে এসেছে ?

দেবুদা বললেন : স্ত্রীর সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছেন। নির্জন জায়গা তাঁদের ভাল লাগে।

হালদার মশাই যেন গর্জন করে উঠলেন : স্ত্রীর সঙ্গে !

আমরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু হালদার মশাই বললেন : আহা, অমন লক্ষ্মীমন্ত বউটাকে কিনা গলায় দড়ি দিয়ে সেদিন ঝুলতে হল !

স্বাতি এক গেলাস চা নিয়ে ঘরে এসেছিল, বলল : ও সব কথা থাক, হালদার মশাই। আপনি চা খান।

বলে চায়ের গেলাসটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল। গেলাসের নীচে একখানা চিনে মাটির প্লেট ছিল। সেটি হাতে নিয়ে হালদার মশাই বললেন : মায়ের আমার সব কথা মনে থাকে। কবে বলেছিলুম, কাপে চুমুক দিয়ে চায়ের স্বাদ পাই নে। তারপর থেকেই আমার জন্যে গেলাস বরাদ্দ হয়েছে।

স্বাতির পিছনেই তাপস এসেছিল কফির পেয়ালা নিয়ে। পেয়ালাগুলো আমরা ট্রে থেকে তুলে নিলুম।

স্বাতি বলল : এখানেও যে আপনার সঙ্গে এইভাবে দেখা হয়ে যাবে তা ভাবতে পারি কি।

হালদার মশাই বললেন : কোথায় ভাবতে পেরেছিলে মা ?

স্বাতি বলল : তীর্থস্থানে দেখা এক জিনিস, আর এখানে—

হ্যাঁ, তা বলতে পার। তবে কি জানো মা ! মন্দির আর ঠাকুর থাকলেই যদি তীর্থ হত, তাহলে কলকাতার মানুষ এমন পাহাড়ে পর্বতে ছুটে বেড়ায় কেন ! আমিই বা কেন কালীঘাটে শান্তি পাই না ?

তারপরেই প্রশ্ন করলেন : গোঁসাইজী এখন কেমন আছেন ?

স্বাতি সংক্ষেপে বলল : ভাল।

বুকের আর কষ্ট হয় নি তো ?

না।

হালদার মশাই বললেন : আমি আমার মায়ের বাবার কথা জিজ্ঞেস করছি। অঘোর গোস্বামী। যত বড় জমিদার, তত বড় ব্যবসা। দিল্লিতেও মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতেন। তাঁরই একমাত্র মেয়ে আমার এই মা।

স্বাতি তাড়াতাড়ি বলল : এতটা পথ লরিতে আসতে আপনার খুব কষ্ট হয়েছে, তাই না ?

কিন্তু হালদার মশাই সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে দেবুদার দিকে চেয়ে বললেন : রাজা হিমালয়ের কন্যা পার্বতীকে জানেন তো ! কোন রাজপুত্রের দিকে চোখ তুলেও দেখলেন না। ছাইমাখা এক ভিখিরি দু চোখ বুঁজে বসে আছেন তপস্যায়, রাজকন্যা তাঁরই ধ্যান ভাঙাবার জন্যে নিজেও তপস্যায় বসলেন।

দেবুবৌদি এগিয়ে এসে বললেন : কী রকম ?

হালদার মশাই উৎসাহ পেয়ে বললেন : ভাল করে বসুন তাহলে।

স্বাতি বলে উঠল : আজ একটু বিশ্রাম নেবেন না হালদার মশাই ? বিশ্রাম ! এই তো বিশ্রাম ! গোপালবাবুকে চেনেন না তো ? তিন কুলে এঁর কেউ নেই, চাল-চুলোও ছিল না। ছিল শুধু বিদ্যে আর চরিত্র বলের অহঙ্কার। আমার এই মায়ের দিকেও কি কোন দিন চোখ মেলে চেয়েছিল, না বোঝবার চেষ্টা করেছিল মায়ের মন ! পাতানো সম্পর্ক হলে হবে কি, মায়ের পেটের বোনের দিকেও এ কালের ছেলেরা এমন সন্ন্যিসীর চোখে তাকায় না।

আমি হাসছিলুম ভদ্রলোকের কথা শুনে। কিন্তু তিনি তা দেখতে পেয়ে এক ধমক দিয়ে বলে উঠলেন : হাসছেন কেন বেহায়ার মতন ! নিজেদের অতীতটা কি এরই মধ্যে ভুলে গেছেন !

তারপর গেলাসের চায়ে কয়েকটা চুমুক দিয়ে বললেন : এঁকে কিছু বলতে গেলে ইনি আমাকে মারতে উঠতেন।

এবারে নিরাপদ একটা মোড়া নিয়ে তাঁর সামনে বসে বললেন : জমিয়ে বলুন না এঁদের গল্প।

হালদার মশাই বললেন : ইনি নাকি আজকাল বড় লেখক হয়েছেন। বড় চাকরি ছেড়ে কলেজে ছাত্র পড়াচ্ছেন, আর আমাদের কথা সবাইকে শোনাচ্ছেন। কিন্তু নিজেদের কথা সব কুলুপ দিয়ে এঁটে রেখেছেন। আজ আমি হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙব।

স্বাতি আর্তনাদ করে উঠল : কী হচ্ছে হালদার মশাই !

নিরাপদ বলে উঠলেন ঘাবড়াবেন না হালদার মশাই, আমরা সবাই আপনার পক্ষে আছি। আপনার কোন ভয় নেই।

ভয় ! কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার যমকেও ভয় পায় না। আরে বাবা, সত্যি কথা বলব, তাতে ভয় কিসের ! তবে যারা ভয় পায়, তাদের ভয় দেখাতে জানে কালীকেষ্ট হালদার। বুড়ো বুড়ি, মানে আমার এই মায়ের বাপ-মা এই শর্মার ভয়ে একেবারে আম্‌সি হয়ে গিয়েছিল। আর এই বীরপুরুষও।

নিরাপদ বললেন : কেন ?

কেন ? তাহলে বলি সেই রামেশ্বরের গল্পটা ?

স্বাতি করুণ স্বরে বলল : ও সব পুরনো কথা থাক না হালদার মশাই।

হালদার মশাই বললেন : থাকবে কেন ? কোন পাপ তো কর নি, মনে কোন পাপ ছিল না। আর সেদিন যখন ভয় পাও নি, তখন আজ ভয় কিসের ! লজ্জাই বা কিসের !

বলে তিনি বাকি চাটুকু শেষ করে গেলাস নামিয়ে রাখলেন মাটিতে। তারপর বললেন : রাতে আরতি দেখতে রামেশ্বরের মন্দিরে পাণ্ডার সঙ্গে গেলেন এই দুজন।

দেশলাই চেয়ে একটি বিড়ি ধরিয়ে

ভিড়ের চাপে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল দুজনের। অনেক কষ্টে পথ চিনে মা আমার ধর্মশালায় ফিরলেন, কিন্তু এই বাবুর দেখা নেই। ইনি ফিরলেন ভোর বেলায় দিনের আলোয়। বাঘের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্যে আমি একে আড়ালে টেনে এনে জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় ছিলেন রাত্তিরে ? ওরে ব্বাবা, এঁর চোখের দৃষ্টি দেখে ঘাবড়ে গেলুম। চড়-ফড় মেরে বসবে নাকি ! একালের ছেলে তো, কিছুই বলা যায় না।

নিরাপদ বলে উঠলেন : তবে যে বললেন, আপনি যমকেও ভয় পান না ?

আরে সত্যিই কি আর ভয় পেয়েছিলুম ! আমি এঁকে একটা সৎ পরামর্শ দিতে চেয়েছিলুম। বলেছিলুম, ছেলেমানুষি করে নিজের ইহকালটা ঝরঝরে করবেন না। অমন পয়সাওয়ালা মামা, সুন্দর মুখ দেখে না ভুলে নিজের আখেরটা গুছিয়ে নিন।

আর কী বলেছিলেন ?

সঙ্গতি হলে মেয়ে অনেক জুটবে বাঙলা দেশে। কিন্তু তার পরেই বুঝতে পেরেছিলুম কী ভুল করেছি। সেই থেকেই আমি গোপালবাবুর দু চোখের বিষ হয়ে গেলুম। আজও—

বলে আমার দিকে তাকাতেই আমি হেসে ফেললুম। আর তিনি বললেন : এখন হাসছেন ! কিন্তু সত্যি বলুন তো, সেদিনের এই কথা ভুলতে পেরেছেন কিনা !

নিরাপদ বললেন : তার পরের কথা বলুন।

হালদার মশাই বললেন : মাকে যখন বললুম কাজটা ভাল কর নি মা, তখন আমার মা কী উত্তর দিলে জানেন ? বললে, যিনি আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হবে হালদার মশাই। আপনি কিছু ভাববেন না। এ যে কত বড় সত্য কথা, পরে তা বুঝতে পেরেছি।

কী করে ?

বুঝতে পারব না ! বুড়ি কত পাত্রের সঙ্গেই না মেয়ের বিয়ে পাকা করলেন, কিন্তু হল বিয়ে ? ইনি তো বিয়ের খবর পেলেই পালিয়ে যেতেন ! শেষ পর্যন্ত কী হল ?

নিরাপদ বললেন : বলুন কী হল !

দিল্লিতে বুড়োর বুকে ব্যথা উঠল। বুড়ির দাপট গেল ফুরিয়ে। এ দিকে গোপাল বাবু আর কলকাতার কেরানী নয়। নিজের চেষ্টায় বড় চাকরি করছে আসামে। দিল্লিতে খবর পৌঁছল, পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ইনি দার্জিলিঙের হাসপাতালে আছেন অজ্ঞান হয়ে।

তারপর ?

বুড়ো বুড়ি নিজেরাই মেয়েকে পাঠালেন এঁর কাছে। বললেন, কলকাতায় নিয়ে এসো, আমরাও আসছি। কলকাতায় একটা শুভ দিন দেখে তোমাদের বিয়ে দেব। কে এঁদের বিয়ে দিয়েছে জানেন ?

জানি নে তো !

কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার। না, বুড়ো বুড়ির কথায় আমি রাজী হই নি। আমি রাজী হয়েছি আমার মায়ের অনুরোধে। মায়ের বিয়ে দিয়ে দক্ষিণা নিই নি।

আর গোপালবাবু ? নিরাপদ বলে উঠলেন : বলুন।

ইনি বললেন, যৌতুক ! একটি কানাকড়িও না। আর মা আমার খালি হাতে এঁর ঘরে এসে ঢুকলেন। এখন চাকরি করছেন কলেজে।

দু চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল হালদার মশায়ের। অনেকক্ষণ তিনি কোন কথা কইতে পারলেন না।

৩৩

রাতে ইন্দুবাবুর গাড়িতে আমরা হোটেলে ফিরলুম। হালদাব মশাই আমাদের পাশে বসেছিলেন। তিনি ইন্দুবাবুর বাড়িতে থাকবেন। এক সময়ে তিনি আমাকে বললেন : আপনারা আজকাল ঈশ্বর মানেন না, কিন্তু মানলে ক্ষতি হত না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আপনারা অনেক কিছু জেনেছেন, কিন্তু যা পান নি তা পেতে পারতেন বিশ্বাসে। শুধু শান্তি নয়, শক্তিও পেতেন। বিশ্বাসই ঈশ্বর।

ইন্দুবাবু পিছন ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন : আজ এ সব কথা কেন বলছেন?

হালদার মশাই বললেন : এঁদের দেখেই আমার এই শিক্ষা হয়েছে। তাই কথাটা মনে পড়ে গেল।

ইন্দুবাবু আর কিছু বললেন না। কিন্তু হালদার মশাই আমাদের নামিয়ে দেবার আগে বললেন : আমার মায়ের মনের বিশ্বাস দেখে আমি নিজেও খুব আশ্চর্য হয়েছি।

আমি কোন প্রশ্ন করলুম না। কোন উত্তরও দিলুম না। গাড়ি থেকে নেমে নিঃশব্দে চলে এলুম হোটেলে। তারপর নীচের তলা থেকে ওপর তলায় নিজেদের ঘরে।

স্বাতি আজ কথা বলছিল না, আমিও বললুম না। বাতি নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু ঘুম এল না সহজে। আমার মনে হল যে হালদার মশাই বোধহয় ঠিকই বলেছেন, স্বাতি আমাকে গ্রহণ করেছিল অনেক আগেই—বিবাহের মন্ত্র পাঠ করে নয়, অন্তরের বিশ্বাস দিয়ে। উমাশঙ্করের সঙ্গে পপির বিবাহের কথা আমার মনে পড়ে গেল। সংস্কৃত মন্ত্রের অনুবাদ পাঠের ব্যবস্থা করেছিল উমাশঙ্কর। আমরা দুজনে পাশাপাশি বসে সেই মন্ত্রপাঠ শুনেছিলুম।

ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥

সমস্ত দেবতারা আমাদের উভয়ের হৃদয় মিলিত করুন। বরুণ পবন ও দেষ্ট্রী দেবতা আমাদের সম্পূর্ণ ভাবে মিলিত হতে দিন।

কন্যার পাণিগ্রহণের সময়ে বর মন্ত্র পাঠ করেছিল—তোমার সৌভাগ্য লাভের জন্যে আমি তোমার পাণি গ্রহণ করছি, তুমি আমার সঙ্গে শেষ বয়স পর্যন্ত একসঙ্গে থাকো। গৃহস্থ ধর্ম পালনের জন্য দেবতারা তোমাকে আমার হাতে অর্পণ করুন। তোমার ও আমার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য হোক। আমি সাম ও তুমি ঋক, আমি আকাশ ও তুমি পৃথিবী। এই রূপে আমরা দুজনে আজ বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হচ্ছি। আমরা যেন বহু পুত্র লাভ করি ও তারা যেন দীর্ঘজীবী হয়। আমরা যেন পরস্পরের প্রিয় রুচিসম্মত ও মনোরঞ্জনে সক্ষম হই। আমরা যেন শত শরৎ আনন্দে জীবিত থেকে শত শরতের বার্তা শুনতে পাই।

সপ্তপদী গমনের মন্ত্রগুলিও তাৎপর্য পূর্ণ। হোমের অগ্নির উত্তরে সাতটি মণ্ডল আঁকা ছিল। বর নিজের ডান পা দিয়ে বধূর ডান পা এক মণ্ডল থেকে অন্য মণ্ডলে

ঠেলে দিচ্ছিল আস্তে আস্তে এই মন্ত্র পাঠ করে—অন্নলাভের জন্য বিষ্ণু তোমাকে এক পা আমার সঙ্গে নিয়ে যান। তেমনি বল লাভের জন্য দু পা, ধন লাভের জন্য তিন পা, সুখ লাভের জন্য চার পা, পশু কল্যাণের জন্য পাঁচ পা, অনুকূল ধাতু লাভের জন্য ছয় পা। আর সপ্তপদী গমনে তুমি আমার সখী হও, আমার অনুবর্তী হও। এই উদ্দেশ্যে বিষ্ণু তোমাকে আমার সঙ্গে সপ্তপদ নিয়ে যান।

হৃদয় লাভ অনুষ্ঠানের মন্ত্রও আমার মনে আছে। —হে বধূ, আমার জীবনের ব্রতে তোমার হৃদয় স্থাপিত করছি। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামী হোক। আমার কথা তুমি এক মনে মেনে নাও। প্রজাপতি দেবতা তোমাকে আমার জন্য আদর্শ জীবন যাপনে নিযুক্ত করুন।

আমাদের আশপাশ থেকে কখন যে সবাই উঠে গিয়েছিল তা আমরা খেয়াল করি নি। হঠাৎ মনে হয়েছিল যে স্বাতির একখানি হাত আমি নিজের দুহাতের মধ্যে ধরে আছি। এ কথা বুঝতে পেরেই তার হাতখানি আমি ছেড়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু স্বাতি তার হাত সরিয়ে নেয় নি, কোন কথাও বলে নি। বাড়ি ফেরার পথে জিজ্ঞেস করেছিল, সেই মন্ত্রটাতো এরা পড়ল না?

আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, কোন্ মন্ত্র?

স্বাতি বলেছিল, ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব—

আমি বলেছিলুম, তদস্তু হৃদয়ং মম।

তারপর?

যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছে দেখে বলেছিলুম, সামবেদীয় বিয়ের শেষে এই মন্ত্রপাঠ করে খাবার নিয়ম। ব্রাহ্মরা এই মন্ত্রপাঠ করেন বিয়ের সময়। হিন্দু বিবাহের সবচেয়ে বড় কথাই হল এই—তোমার এই যে হৃদয় তা আমার হোক, আর আমার এই যে হৃদয় তা হোক তোমার।

স্বাতি বলেছিল, খুব সুন্দর কথা। তারপর অস্পষ্ট ভাবে আবৃত্তি করেছিল—

ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম।

যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব ॥

স্বাতি যে জেগে ছিল, তা বুঝতে পারলুম তার প্রশ্ন শুনে। আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল: কী ভাবছ?

আমি সত্যি কথাই বললুম: ভাবছি, তুমি আমাকে গ্রহণ করেছিলে কবে?

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: আজ তুমি এ কথা ভাবছ কেন?

আজ মনে হচ্ছে যে পপির বিয়েরও আগে—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: ঈশ্বরে তুমি বিশ্বাস কর?

হঠাৎ এ কথা জানতে চাইছ কেন?

স্বাতি বলল: আমি তাঁর নির্দেশ মানি। তুমি মানো না বলেই আমি কোন দিন তোমাকে বলি নি।

আজও বলবে না?

বলব। রামেশ্বরের আরতি দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছিল যে তাঁর নির্দেশ আমি পেয়েছি। তোমার জন্যেই আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

বিস্ময়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলুম। আর স্বাতি বলল: আমার এই বিশ্বাসেরই জয় হয়েছে। তুমি বুঝতে পার নি। কিন্তু বুঝেছিলেন হালদার মশাই। তাই তিনি

আমাকে সাহায্য করেছেন নানাভাবে। আমার মতো তিনিও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন।

অথর্ব বেদের একটি শ্লোক আমার মনে পড়ে গেল।—

মধুমন্মে নিক্রমণং মধুমন্মে পরায়ণম্।
বাচা বদামি মধুমদ্ ভূয়াসং মধু সংদৃশঃ ॥

অমৃতময় হোক আমার ইহজীবন,
পরজীবনও হোক অমৃতময়।
যেন অমৃতময় হয় আমার কথা,
আমি যেন নিজে হতে পারি অমতৃময়।

কিন্তু কার কাছে আমরা এই প্রার্থনা করছি?

রম্যানি বীক্ষ্য সমাপ্ত।

রম্যাণি বীক্ষ্য

মানুষের নূতন দেশ দেখার বাসনা কতকটা নেশার মতো। কেউ সে সুযোগ পান, কেউ পান না, কিন্তু শখ সবারই সমান। যাঁরা ভ্রমণ করেন তাঁদের একটা সঙ্গীর দরকার, যে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য ভ্রমণ-কাহিনীই সবচেয়ে ভাল সঙ্গী। আর যাঁরা বাড়িতে বসে ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁদের কাছেও ভ্রমণ-কাহিনী অপরিহার্য। এঁদের সবার জন্য লেখা হয়েছে রম্যাণি বীক্ষ্য। পর্বে পর্বে এই গ্রন্থ রচনা করে লেখক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী শুধু রবীন্দ্র-পুরস্কারেই সম্মানিত হন নি, গত কয়েক বৎসরে বাঙলার ভ্রমণ সাহিত্যকে অভাবনীয় রূপে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের একটা শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, নানা রম্যস্থান প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই অভিব্যক্তি এই রচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রষ্টব্যস্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবাহিক ভারত-দর্শনের কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, বর্তমানে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্যের পৌরাণিক বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্য ও তার কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ পাঠকের দৃষ্টির সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে একটি জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনীও বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। ভ্রমণে যাঁরা উৎসাহী নন, জীবনে যাঁরা শুধু প্রাণরসেরই সন্ধানী, উপন্যাসের রসের আকর্ষণে তাঁরাও এই গ্রন্থের প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন। ভ্রমণ-রসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী তাঁর স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে এসেছেন। এই সময় প্ল্যাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতান ভাগ্নে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। মার্জিত রুচি ও শিক্ষায় তার আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত। মামা-মামী তাকে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানালেন, আর স্বাতির দৃষ্টিতে গোপাল আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। চলতি ট্রেনে তাকে উঠে পড়তে হল।

প্রথম গ্রন্থ **অন্ধ্র পর্বে** ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। ওয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, বিজয়ওয়াড়া ও মঙ্গলগিরিতে, অমরাবতী নাগার্জুন সাগর ও তিরুপতিতে আমরা দুজনকে দেখি পাশাপাশি।

তামিল পর্বেও তারা একত্র আছে—মাদ্রাজ মহাবলীপুরম ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ও তানজোড়ে, ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি রামেশ্বর ও তিরুচেন্দুরে। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি

বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর **কেরল পর্বে** তাদের ঘরে ফেরার পালা। কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবেন্দ্রাম বর্কলা পেরিয়ার অভয়ারণ্য। যমজ শহর এর্নকুলম-কোচিন থেকে ত্রিচুর গুরুভায়ুর। সেখানে থেকে কালিকটে সমুদ্র দেখে নীলগিরি পাহাড়।

কর্ণাট পর্ব শুরু হয়েছে উটাকামণ্ডে। সেখান থেকে কর্ণাটক রাজ্য। হালেবিড বেলুর ও শ্রবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেকে তারা এল হায়দ্রাবাদে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই পর্বের পরিসমাপ্তি।

তারপর গোপালকে দেখা গেল দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রায় ভ্রমণরত। এই বিবরণ সঙ্কলিত হয়েছে **কালিন্দী পর্বে**। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত-পরিহাস-প্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদা বোধের আন্তরিক পরিচয়।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জির সঙ্গে মামী মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি রাজস্থান পর্বে। দিল্লী থেকে জয়পুর আজমের পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল। তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের কথা আছে **সৌরাষ্ট্র পর্বে**। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্য স্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সোমনাথের পথে তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি। পরবর্তী গ্রন্থ **কোঙ্কণ পর্বেও** তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক, সে তখন গোপালের সঙ্গে পুনা ও গোয়া ভ্রমণে ব্যস্ত। গুজরাতের আমেদাবাদ-থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কোঙ্কণ উপকূলের কথা এই পর্বে বিবৃত হয়েছে।

তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা মাণ্ডু ইন্দোর ও উজ্জয়িনী, সাঁচী ভোপাল বিদিশা ও খাজুরাহো। এই কাহিনী পাওয়া যাবে **অবন্তী পর্বে**।

পরবর্তী তিনটি পর্বে মামা মামী ও স্বাতিরকথা স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে এসেছে মুহুর্মুহু। **উৎকল পর্বে** পুরীর সমুদ্রবেলায় ভুবনেশ্বর ও কোনারকে গোপাল ঋতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। **মগধ পর্বে** শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা। এবং সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে এক সঙ্গে, তারপর আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে। আর **কোশল পর্বে** বর্ণিত হয়েছে কাশী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের প্রসঙ্গ। বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মুসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোপালকে তারা দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা।

হিমাচল পর্বে গোপাল আবার মামা মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীরে গেছেন, যে কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ।

শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউস বোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে—সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। এক দিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্য দিকে ক্ষীরভবানী ও অমরনাথে তীর্থযাত্রীর সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীর সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। **কাশ্মীর পর্বে** এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

কামরূপ পর্বে সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও আহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর পাওয়া যাবে কিছু স্বল্প-পরিচিত অঞ্চলের বিচিত্র অধিবাসীদের আশ্চর্য পরিচয়।

এর পরে **গৌড় পর্বের** যবনিকা উঠেছে নাটকীয় পরিবেশে। মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গোপাল দার্জিলিঙের হাঁসপাতালে। দিল্লী থেকে স্বাতি এসছে উড়ো জাহাজে। তারপর দুজনে দেখেছে দার্জিলিঙ কালিম্পঙ ও গ্যাংটক। হিমালয়ের প্রসঙ্গ অপরূপ বর্ণনায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে এসেছে বাঙলাদেশের বিবরণ। প্রাচীন ও আধুনিক গৌড়ের কথা সম্পূর্ণ হয়েছে মালদহে এসে।

ভাগীরথী পর্বে পশ্চিম বাঙলার কথা। রাজধানী কলকাতা যে কত বিচিত্র নিজের চোখে দুবেলা দেখেও তা জানা যায় না। আর কলকাতাই পশ্চিম বাঙলার সব নয়। বিস্মৃত-প্রায় তাম্রলিপ্ত সপ্তগ্রাম ও কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুর, রাঢ় দেশ ও শান্তিনিকেতন, দীঘা গঙ্গাসাগর ও সুন্দরবন—সব দেখা হতে না হতেই মামা মামী এলেন দিল্লী থেকে। স্বাতি ও গোপাল তখন মন্ত্রোচ্চারণ শুনছে : ও যদেতৎ হৃদয়ং তব…

এর পরে **হিমালয় পর্ব**। কাশ্মীর ও হিমাচলেই তো হিমালয়ের শেষ নয়, উত্তরাখণ্ড নেপাল সিকিম ও ভুটান ছাড়িযে অরুণাচলের শেষ প্রান্তে পরশুরাম কুণ্ড পর্যন্ত এই হিমালয় তার বিশাল মহিমায় সুবিস্তৃত। উত্তরাখণ্ড হল হিমালয়ের হৃৎপিণ্ড। শত সহস্র যাত্রীর প্রণামে নন্দিত কেদার-বদরীর পথে এসেছে স্বাতি ও গোপাল।

মরুভারত পর্বে ভারতের বিখ্যাত থর মরুভূমি দেখছে স্বাতি ও গোপাল—বিকানের থেকে যোধপুর জয়সলমের, তারপরে আরব সাগরের তীরে মরুরাজ্য কচ্ছ। উদ্বাস্তু সিন্ধীরা সেখানে নূতন উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। এই পর্বে শুধু মরুবাসী রাজস্থানীর কথা নয়, কচ্ছী ও সিন্ধীদের কথাও জানা যাবে।

ভারতের পূর্ব প্রান্তের পরিচয় পাওয়া যাবে **প্রাচী পর্বে**। এক সময়ের অনাদৃত ও স্বল্প-পরিচিত রাজ্যগুলি দেখবার জন্য স্বাতি ও গোপাল এল আসামের গৌহাটি শহরে। অরুণাচল রাজ্যের সংবাদ আহরণ করে এগিয়ে গেল নাগাল্যাণ্ডে—ডিমাপুর থেকে কোহিমায়। সেখান থেকে মণিপুর রাজ্যের ইম্ফল ও মৈরাঙে, কাছাড়ের শিলচর থেকে মিজোরাম রাজ্যের আইজলে। তারপর ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগর আগরতলা ও উদয়পুরে ত্রিপুরা সুন্দরীর দর্শন করে ঘরে ফেরা। এই সব রমণীয় রাজ্যের শুধু বর্ণনা নয়, রাজ্যবাসীদেরও শিল্প-সংস্কৃতি ইতিহাস ও রাজনৈতিক চেতনার কথা পাওয়া যাবে এই পর্বে।

তারপর **কিষ্কিন্ধ্যা পর্বে** রামায়ণের যুগ শুরু করে বিস্মৃত হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগর ও তুঙ্গভদ্রা বাঁধের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রসঙ্গত হায়দ্রাবাদের গোলকণ্ডা দুর্গ থেকে

বিদর, বিজাপুর ও গুলবর্গার ইতিহাস, বাদামী পট্টডকল ও আইহোলের গুহামন্দিরের পরিচয় এবং প্রাচীন বিদর্ভের পৌরাণিক কথাও আলোচিত হয়েছে।

অরণ্য পর্বে সমগ্র ভারতের অরণ্য অঞ্চলের কথা আলোচিত হয়েছে দক্ষিণ ভারতের অরণ্য ভ্রমণের পথে। নীলগিরি পাহাড়ের টোডা ও কুর্গের অধিবাসী কোডাভাদের জীবন চিত্র এই পর্বের বিশেষ আকর্ষণ।

তারপর নেপাল পর্ব নয়, নেপাল পর্ব তার আগের ঘটনা। মগধ পর্বের পর যে কেন লেখা হয় নি, সেই কথা বলা হয়েছে নেপাল পর্বেই। ব্যক্তিগত কারণে লেখক এই ভ্রমণের কথা গোপন রেখেছিলেন। এতে আছে আদি কবি বাল্মীকির নায়িকা সীতার জন্মস্থান জনকপুর ও গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী, আছে শৈবতীর্থ পশুপতি নাথ ও বৈষ্ণবতীর্থ মুক্তিনাথ এবং কাঠমাণ্ডু ও পোখরা উপত্যকার দর্শনীয় স্থানের সঙ্গে অপার মহিমান্বিত হিমালয়ের কথা।

এই গ্রন্থমালার সমাপ্তি **ভুটান পর্বে**। কলকাতা থেকে যাত্রা করে ভুটানের সীমান্ত শহর ফুন্‌ছোলিঙে পৌঁছবার আগে হিমালয়ের কোলে নেপাল ও ভুটানের মাঝে ভারতের রাজ্য সিকিমের যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারপর ভুটানের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সমস্ত শহর ও জং-এর কথা বলা হয়েছে। শুধু রাজধানী থিম্ফুর কথা নয়, পারো পুনাখা ওয়াংদিফোদ্রং তংসা ও তাশিগঙের কথাও আছে সবিস্তারে। এরই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে ভ্রমণরত স্বাতি ও গোপালের মধুর সম্পর্কের কাহিনী।